ঠিকানা বদল

অমরেন্দ্র ঘোষ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। বৈশাখ, ১৮৭৯ শকাব্দ।

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

মুদ্রাকর—জিতেন্দ্রনাথ বসু,
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া,
৩১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪।

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
খালেদ চৌধুরী

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কো.

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

পাঁচ টাকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

চর কাশেম

পদ্মদিঘীর বেদেনী

দক্ষিণের বিল ১ম, ২য় খণ্ড

কনকপুরের কবি

জোটের মহল

একটি সংগীতের জন্মকাহিনী

ভাঙছে শুধু ভাঙছে

বেআইনি জনতা

মন্থন

রোদনভরা এ বসন্ত

একটি স্মরণীয় রাত্রি

অহল্যা কন্যা

কুসুমের স্মৃতি

মুখোমুখি

স্ব-নির্বাচিত গল্প (ছোটদের)

ঠিকানা না-ই বা বললাম। তুমি একটু এগিয়ে এলেই চিনবে। এ রাস্তার এবাড়িটাকে কেউ বা বলে ব্যারাক—কেউ বা পাঁচ ইঞ্চি।

একটা চৌকোনা প্লটের ওপর খোপ-খোপ ঘর। গুনলে কুড়ি বাইশখানা হবে। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথুনি। ছাউনি অ্যাসবেস্টো এবং টালির। দূর থেকে ভয় হয়—কপাল সিরসির করে ওঠে। একটু এগুলে আর বুঝি রক্ষা নেই। পূর্ব-পশ্চিমের ঘরগুলো যেমন মুখোমুখি, তেমনি উত্তর দক্ষিণের। প্রত্যেক ঘরের সুমুখে হাত তিনেক চওড়া বারান্দা। ওরই একপাশে রান্না—অন্য পাশে ড্রইং রুম। কখনো বাথরুম কখনো বা ছেলেমেয়ের পড়ার ঘর। সময়মতো ছোট-খাটো গানের আসর নয়তো তাসের আড্ডা বসে। রাজনীতি সমাজনীতি দর্শনও বাদ যায় না। শরৎ রবীন্দ্র পরিক্রমাও হয় মাঝে মাঝে।

সেদিন এক বারান্দায় হৃদল ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে [illegible]তো স্ট্যালিনগ্রাদের ফাইট হয়ে গেল এক সিনেমা অভিনেত্রীকে নিয়ে। বিষয়টা জটিল। তার গালের তিলটি আসল না মেকি? [illegible] রাত্রে বাড়ির বুড়োদের মণ্ডল কংগ্রেস বসেছিল। তাঁরা একজন অভিজ্ঞকে আমন্ত্রণ করলেন প্রায় সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে—অর্থাৎ ইন্দ্রাণী পার্কের মিস্টার ডাস্‌কে। হ্যাঙলা গড়ন, ব্যাক ব্রাশ চুল—এককালে মিস্টার ডাস্ ছিলেন একজন খ্যাতনামা ক্যামেরা-ম্যান। তখন ছিল সায়লেণ্ট যুগ। এল টকি। তিনি আর নাকি খাপ-খাওয়াতে পারলেন না নিজেকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দেন, এ তো টকির যুগ নয়, খোশামোদির যুগ। এখন কি কেউ চাকরি করতে পারে!

ওয়ারিশ সূত্রে ল্যাণ্ডলর্ড ছিলেন মিস্টার ডাস্। বাড়িভাড়া পেতেন শখানেক টাকা। বাকিটা চালাতেন স্বাধীন সাংবাদিকতা করে। কোনো সময় তিলের, কখনো বা ছিলের সব সারপ্রাইজিং নিউজ। সিনেমাগন্ধী কাগজগুলো তা লুফে নিত, আর পাকা সমজদার ছিল এই উদ্বাস্তুরা। ঢপ-কীর্তন-যাত্রা-কবির পাল্লা-রামায়ণ-জারী এদের কাছে এখন পুরান দলিল হয়ে উঠেছে। কতকটা যেন পড়া যায়, বাকিটা স্মরণ করতে চোখ করকর করে।

ওদের মূল্যবান অংশগুলো পোকায় কেটেছে!

ওরা যখন কোনো শহরে গানের আসরে রেডিও অথবা মাইকে জারীগান কি ভাটিয়ালী শোনে ওদের মনে হয় যেন ছিনালি করছে কেউ। কোথায়ই বা সেই নদী বিল ঝিলের উদার পরিবেশ, কোথায়ই বা সেই গলা। এ শুধু সং সেজে রঙবাজি করা।

তাই তো বাধ্য হয়ে ওদের তিলে ও ছিলে মশগুল থাকা। এবং তাই মিস্টার ডাসের আজ স্মরণ নেওয়া। তিনি এসে রহস্য ভেদ করে দিলেন। তিলটি মেকিও নয়, আসলও নয়।

মণ্ডল কংগ্রেস একেবারে লাফিয়ে উঠলেন।—তবে কি মিস্টার ডাস্?

উনিশ শো পঞ্চাশে যখন ওঁকে কেউ চিনত না, তখন শ্যামা ফিলিম এক বিজ্ঞাপন দিলে যে এক চারুদর্শনা তিলওয়ালা অভিনেত্রীর প্রয়োজন। ওঁর গালে ছিল একটি সূক্ষ্ম আঁচিল। সেইটা অপারেশন করতেই দাগটি হল তিল। খরচ পড়েছিল—দাঁড়ান নোট-বইটা দেখে বলছি—দু'গিনি।

ধন্য! ধন্য! এই জন্যেই আপনাকে ডাকা।

ফি বাবদ মিস্টার ডাস্ পেলেন চা ও প্রচুর জলখাবার। ঘর ঘর থেকে চাঁদা তোলা হল দুআনা করে। মেয়ে এবং পুরুষ সভ্যরা আলাপ আলোচনা করলেন, চা খেলেন হৈহুল্লোড় করে। আঙুর দানার মতো কথা চিবুলেন সবাই। ফুলদি এবং কনকদির গাল দিয়ে তো রস গড়িয়ে পড়ার যোগাড়!

এরপর ছেলেদের ডেকে শাসিয়ে দেওয়া হল। ফুলদিই ভার নিলেন। তোমাদের এ সব ভারি অন্যায়। কারণ এখনো তোমাদের ঘাড়ের রোঁয়া গজাতে ঢের দেরি।

ছেলেরা রেগে বেগুনী হয়ে রইল।

আর রেগে রইল বাড়ির বেশির ভাগ বাসিন্দা—যারা মণ্ডলের সভ্য-সভ্যা নয়। চাঁদা দিয়ে মরল অথচ রহস্য জানতে পারল না তিলেক।

তবু দু-এক জন অল্পবয়সী বৌ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ফুলদি? সত্যি কথাটা বলুন না? আমরা তো ঘরকরণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

তাই থাকো। সময়মতো শুনবে না, এখন হাঁই-পাই।

দিন কতক বেশ মন কষাকষি চলল। দু একটা হাড্রোজেন বোমার কচি-কুঁচো সংস্করণও পড়ল। আঁচ দিয়ে এখানে তোলা উনুনটা রেখেছেন কেন? আর রাখলে ভাল হবে না ফুলদি।

কেউ বলল, আমরা মানি বলেই ওঁর মান—না মানলে উনি করবেন কি? আর বরদাস্ত করব না সব্বাইর ওপর ছড়ি বুলান।

আর একটি ছিপছিপে তরুণী গায়ে সাবান মাখতে মাখতে কলতলার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বলল, আজ আমি কনকদিকে বারণ করে দিয়েছি, আমার ঘরের সুমুখে আদুল গায়ে বসে সকাল বেলা কয়লা ভাঙতে। কারণ দু-তিন দিন দাঁড়ি কামাতে কামাতে ওঁর গাল কেটে-কুটে গেছে। সত্যি সত্যি একদিন যদি খুনখারাপি হয়!

কথা শেষ হওয়া মাত্র কলতলা ঝমঝম করে উঠেছিল হাসিতে। কালো বৌ চেয়েছিল সপ্রতিভ হয়ে।

বাঙলা দেশের নানা জেলার উদ্বাস্তু এসে এবাড়িটায় ভিড় জমিয়েছে। এক শ থেকে তিন চার শ পর্যন্ত এক এক জনার আয়। উপায় নেই বলেই এখানে মাথা গোঁজা। বাড়িওয়ালা একজন ভদ্র মাড়োয়ারী। কল পাইখানা কিম্বা নর্দমা সম্বন্ধে কোন অভাব অভিযোগের কথা তিনি শুনলে বিনীতভাবে বলেন, এ তো কুলীদের ব্যারাক, আপনারা এখানে কেন থাকেন বাবুজী? মিনিস্টারের কাছে লিখুন, তিনি আপনাদের ইজ্জত বুঝবেন। একটা ভালা বন্দোবস্ত কোরে দিবেন কলোনিতে। মিলের কুলীদের জন্যে হামি এ ব্যারাক করেছিলাম, আপনারা কেন বে-ফায়দা এখানে এসে উঠলেন! হামি আর পয়সা খরচা করতে পারব না, মাপ করবেন।—রাম, রাম।

অনেক অসুবিধার মধ্যে একটা সুবিধা—এ বাড়ির উঠানখানা। প্রায় বিঘা দেড়েক জমি। ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে, বৌরা আঁচ দেয় তোলা উনানে। কেউ দেয় কাপড়জামা শুকাতে।

শৌখিন ইলা বৌদি ও শান্তিপ্রিয় মিত্র দু পাশে দু ফালি বাগান করেছেন

ফুলের। যখন বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে প্রায় পশ্চিমো লু চলে, তখনো এদের বাগানে দু একটি ডালিয়া উজ্জ্বল হয়ে ফোটে—এক আধটি বেল ফুল। তুমি আর একটু নজরে করে দেখলে হয়তো দেখতে পাবে দু চার সার সিজন ফ্লাওয়ার। রঙিন প্রজাপতি যেন জ্বলজ্বল করছে।

সেই তিল নিয়ে তখনো মন কষাকষি চলছে।

উৎপলা টেলিফোনে কাজ করে। আজ আফিস যায় নি। সেই কলতলার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই সে বলে, ফুলদির যে বয়সে যে রূপ তাতে সে ছাড়া কে লিড্ করবে? নজির আমাদের বিজয়লক্ষ্মী ঠান্‌দি।

মিতা কাজ করে জি, পি, ও-তে। সে চোখ কপালে তোলে।—ও কথা বলিস নি, বলিস নি। তেমন কেউ শুনলে তোর চাকরি থাকবে না।

কেন?

নেকি! যেন কিছু জানে না। সিডিসাস্!

ফুলদি সত্যই সুন্দরী। আয়ত চোখ, মুখের সঙ্গে মানানসই একটি নাক, গভীর বাঁকা ভুরু—দেখলে চোখ ফেরানো দায়। একরাশ কোঁকড়ান কালো চুল তিনি অনেক সময়ই সামলাতে পারেন না। বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশের কোঠা ছাড়িয়েছে। কিন্তু কে যেন মদ ঢেলে দিয়েছে রূপের এই অসময়। ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে দেখে, প্রৌঢ়রা বিবশ হয়—ফুলদি এলে খুড়োরা জপের মন্ত্র ভুলে যান।

তবু এতদিন এমন করে অল্পবয়সী বৌদের যেন নজরে পড়েন নি ফুলদি। আজ উৎপলা ও মিতার কথায় যেন ওদের বুক টনটন করে ওঠে।

কালো বৌ বলে, অমন ঘুরে ঘুরে বেড়ালে, কাজের আঁচটি পর্যন্ত গায়ে না লাগালে কার না স্বাস্থ্য ফেরে!

মিনতি মুখে ঘন সাবান মেখে বলে, যদি আমাদের মত কোহল কাঁখে দিতেন বিধাতা, দেখতাম কেমন করে অমন গড়নটি থাকে? যা-ই তোমরা বল না কেন, ও বয়সে অমন জৌলুস মানুষ না।

আর একটি বৌ পা দুখানা ঘসতে ঘসতে বলে, খান কি জানো? শুধু ক্ষীর। চতুর্থ পক্ষের বৌ, বুড়ো স্বোয়ামী হাঁটতে পারেন না, তবু নিত্য রাবড়ি এনে খাওয়ান। অমন খাওয়া পেলে—সে মুখ কুঁচকে কথা বন্ধ করে জোর জোর পা চালায়। আজ তার পায়ের ফাটাগুলো মোলায়েম করতেই হবে।

অন্য একটি রোগা লিকলিকে বৌ কয়লামাখা হাত ধুয়ে বলে, দেখা যাবে বুড়ো ম'লে কতটা জৌলুস থাকে! বিয়ের আগে অনেকেরই অনেক কিছু ছিল রে।

এতক্ষণ বাদে উৎপলা সায়াটা পরে মন্তব্য করে, আমরা যে-ই যা বলি না কেন, তাতে কিন্তু সোনার দর কমে না। রূপ সকলে পায় না, আবার পেলেও তা অত বয়স পর্যন্ত সকলের ভাগ্যে টেঁকে না।

কালো বৌ রেগে ওঠে, অত রূপসী হওয়াও আবার ভাল না। সংসার জ্বালায়। ফুলদির ভাগ্য যে চার কুলে কেউ নেই।

ত্রিল ক্রমে তাল হয়ে ওঠে। আবার বচসা আরম্ভ হয়। পুরুষদের বৈঠক হলে এতক্ষণে দু-এক রাউণ্ড হয়ে যেত। সময় বুঝে উৎপলা ও মিতা সরে দাঁড়ায়। কালো বৌ যখন কলতলা ছাড়ে তখন তার মুখের দিকে চাওয়া যায় না।

আজ যে যার ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় নামায়। নিজের কৌটায় না থাকলেও ধার করে একটু পাউডার আনে। আলতা খোঁজে। সংসারী কাজকর্ম সেরে একটু প্রসাধন করে। সাজে-গোজে ইচ্ছামতো। তারপর আয়না খুলে মুখ দেখে বারবার। দু-একজনার এ পর্বটা প্রায় উঠে গেছে ট্যাব্ ট্যাব্ কোলে আসার দরুন।

উৎপলা ও মিতা নিত্য সাজে। আজ যেন সীমা ছাড়ায়।

কালো বৌ ঠিক করে, আজ তার স্বামী ঘরে ঢুকলেই প্রশ্ন করবে, এ বাড়িতে সব চেয়ে কে সুন্দরী? অথচ ফুলদি এ সব কিছুই জানেন না।

সবে বিকাল পড়েছে। বোধ হয় তিনটা। এমন সময় একদল ভিখারী ঢোকে ব্যারাক বাড়িতে। হৈ-চৈতে সব ঘরের মেয়ে-বৌ বেরিয়ে আসে। ভিখারীর এত গোলমাল তারা এ বাড়িতে আর শোনে নি কখনো।

তখনো পড়ন্ত রোদের জ্বালা কমে নি! স্নানে পা রাখা যায় না। উঠানটা মনে হচ্ছে যেন তামার তপ্তান টাট।

মা ভিক্ষে দাও লক্ষ্মী মাগো···

সকলে বিরক্ত হয়ে চেয়ে থাকে। এমন অসময়েও এ উৎপাত!

ফুলদি তার থেকে ওঁর সমস্ত কাপড়-চোপড় ঠেলে সরিয়ে রাখেন। আজকাল কাউকে আর বিশ্বাস নেই।

বৌ ও মেয়েরা চেয়ে দেখে ফুলদি কোনো সজ্জা করেন নি, না গায়ে দিয়েছেন একটা ব্লাউজ। শুধু ফর্সা আঁচলখানা কোনো রকমে বুকে পিঠে লেপটানো। উজ্জ্বল রৌদ্রে শরীরের রং যেন জ্বলছে। পাতলা শাড়ির ফাঁক

দিয়ে ঈষৎ বিনম্র স্তব্ধতার দুলছে। কি তার ডৌল! কি তার শোভা! ওরা ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। ওদের দুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন বিবশ হয়ে যায়।

ফুলদি এ সব ঠিক বুঝতে না পারলেও অনুমানে সহজাত বুদ্ধির প্রভায় কি যেন কি বোঝেন। তাঁর যেটুকু আঁচল ইতিমধ্যে অসম্বৃত হয়েছিল, তা সম্বৃত করে নেন। সমস্ত ঘরগুলোর দিকে তাকান সগৌরবে।

একটি ভিখারী মেয়ে সুমুখে এসে বলে, মা চারটি ভিক্ষে দিন!

তার পিছন পিছন আরো কটি ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়ায়। রোদে বিবর্ণ হয়ে ঝলসে গেছে যেন এতগুলো রক্তমাংসের মানুষ।

ওরা আবার ভিক্ষে চায়।

কিন্তু ফুলদি কিছু বলেন না। তিনি দাঁত খিঁচালেও ওরা আশ্চর্য হত না— আশ্চর্য হয় ওঁরা চাউনি দেখে।

দলের মধ্যে একটি মেয়েই শুধু নীরব। তার দিকেই ফুলদির দৃষ্টি ফেরানো। সে মেয়েটি রয়েছে প্রায় মাঝ উঠানে দাঁড়িয়ে।

দলসমেত ভিখারীরা এবার অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কেবল এই মহিলা নয়, বাড়িসমেত দৃষ্টি ওর দিকে নিবদ্ধ।

একটা ফোটন্ত ডালিয়ার কাছে সমান গৌরবে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে যেন জ্বলছে। একটু লক্ষ্য করলেই চোখ ধাঁধাঁয়।

অর্ধ শিক্ষিতা বৌরা ভাবে, এই রূপই বুঝি ছিল পদ্মিনীর।

মিতা এবং উৎপলা ভাবে, এই রূপেই বুঝি ধ্বংস হয়েছিল ট্রয় নগরী।

কিন্তু মেয়েটি ঠিক রূপসী কিনা সন্দেহ। কারণ তার সর্ব অঙ্গ কবি কল্পনার নয়। বেশবাস একান্ত শ্রীহীন। তবে সে গনগন করছে প্রথম আঁচের মতন। অঙ্গার হয় নি, কিন্তু ভস্মে তে যেন বসেছে। মেয়েটির সুমুখের উঁচু দাঁত দুটিতে যেন হীরার জেল্লা।

একে দেখে বাড়ির সবাইর আর একটি লোকের কথা মনে পড়ে—সে হচ্ছে ফুলদির এক ভাইপো। কিছুদিন এখানে এসেছিল। যেন তুলের তুল সাদৃশ্য।

ফুলদি মেয়েটিকে ইশারায় কাছে ডাকেন।

এ বাড়ির সব বৌরা ঝগড়া-তর্ক ভুলে এগিয়ে আসে। আশ্চর্য—ওকে কেউ আর যেন হিংসা করে না।

কাছে এলে সবাই দেখে প্রথম আঁচের ওপর যেন একখানা পাতলা মেঘ-থমথম ধোঁয়ার কুয়াশা—তাই কারুর জলুনি বাড়ায় না।

কিন্তু জেল্লা হারায় সবাই। এমন যে ফুলদি তিনিও। যেন হঠাৎ রাত্রে সূর্য উঠেছে। নিষ্প্রভ হয়ে গেছে জোনাকির ঝাঁক, রানী জোনাকি সমেত। হক না কুয়াশা ঢাকা সূর্য।

মেয়েটি কাছে এলে ফুলদি আপ্যায়ন করেন, বস বস এই পিঁড়িখানায়।

মেয়েটি সেই কাপড় জামাগুলোর দিকে একটিবার তাকিয়ে চুপ করে থাকে, যেন বসতে সাহস হচ্ছে না! অথচ টনটন করছে ওর উরু জোড়া, অপূর্ব ভঙ্গিমার কোমরটা।

একটি তের-চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে, নাম পুস্পি—যাকে এ বাড়ির সবাই ফাজিল বলেই জানে, সে বলে, দেখ দেখ ওর চোখের পালকগুলো গনা যায়। ওমা এ তো দেখি নি কখনো!

সবাই আবার ওর মুখের দিকে তাকায়।

ওর চোখে জল।

ওমা কাঁদছ কেন?—ফুলদি বলেন, বস বস।

তবু কাপড়গুলোর দিকে চেয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে মেয়েটি।

ফুলদি ইতস্ততের কারণটা বোঝেন।—তুমি কিছু মনে করো না—বস, বস এই পিঁড়িখানায়।

ধরা গলায় মেয়েটি বলে, যদি ছোঁয়া লাগে?

এই জন্য বুঝি চোখে জল? লাগবে না ছোঁয়া। আর লাগলেও কিছু হবে না। আমি ঠিক তোমাকে ভেবে কিছু করি নি।—ফুলদি পরিস্থিতিটা হালকা করতে চেষ্টা করেন।

সে জন্য নয়—আমার কাপড়চোপড়ই—আবার নির্বাক হয়ে যায় মেয়েটি।

ছেঁড়া? তাতে কি হয়েছে? উঠে বস।

পুস্পি চোখ পিটপিট করে হাসে। সে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলে।

মেয়েটির কাপড়ে একটা দাগ। ফুলদি পুস্পিকে একটা ধমক দেন, কিরে টক পালং? এখান থেকে দূর হ—তিনি মেয়েটিকে হাত ধরে বারান্দায় তোলেন। আবডালে নিয়ে যান দেওয়ালের। বিষয়টা বুঝে বৌরা একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়।

ফুলদি ঘরে ঢুকে একখানা কাপড় এনে ওকে নিজেই কলতলায় নিয়ে যান। একটু পরে মেয়েটি যখন বেরিয়ে আসে, তখন সবাই দেখে যে দশআনা কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। ওর সৌন্দর্য শুধু রূপে নয়—স্বাস্থ্যে।

সঙ্গীরা এবার জিজ্ঞাসা করে, তুই কি এখানে থাকবি নাকি লো? এখন বসে থাকলে কে পেট চালাবে? মাগো, আমাদের কিছু দাও।

তখন প্রত্যেক ঘর থেকে কিছু কিছু চাল বার হয়। ওরা মামুলী শুভকামনা করে সকল বাসিন্দাদের। কিন্তু বুক জ্বলে যায় ছেলেবুড়ো সব্বাইর।

কি হলো যাবি নি?

হ্যাঁ যাব—দাঁড়াও একটু। মা আমি চলি।

ফুলদি বাধা দেন, না তুমি একটু পরে যাবে।

আমি যে পথ চিনিনে।—সে অসহায় ভাবে তাকায়।

কোথায় থাকো?

কালিঘাটে।

তা হলে এক ব্যবস্থা হবে। অনেক কথা আছে।

এমন সময় চোখে নীল গগলস্-আঁটা মিস্টার-ডাস্ এসে উপস্থিত হন।—এ যে ফিলিম ফিগার। কোথায় পেলেন এঁকে ফুলদি?

মেয়েটি কিছু বোঝে না।

ডাস্ জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম?

মেয়েটি চুপ করে থাকে।

ফুলদি বলেন, বল না, আমরাও শুনি।

অহল্যা।

চমৎকার। ভেরি সাজেস্টিভ্—এখন উদ্ধার করলেই হয়।

এ সময় কোত্থেকে এলেন আপনি?—ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন।

এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম আপনার হাতের চা-টাই খেয়ে যাই। প্রায় চারটা বাজে।—একটা সায়লেণ্ট যুগের অতি পুরনো মেকের হাতঘড়ির দিকে তাকান মিস্টার ডাস্।

বসুন বসুন উঠে। আমার হাতের চা কি খুব মিষ্টি?

চিনির টেস্ট চিনি টের পায় না—জানে অন্য সবাই।

তাই নাকি?

ফুলদি দুজনাকে প্রায় মুখোমুখি বসিয়ে রেখে ঘরের ভিতর চলে যান।—

বস অহল্যা আমি আসছি।

মিস্টার ভাসের চোখে একজোড়া নীল চশমা। রোগা হাড়্‌গিলে চেহারা। অহল্যাকে গিলে খাবে নাকি? ও মোড় ঘুরে বসে। কিন্তু তবু মনে হয়, ওর পিঠে এসে নীল ধারালো দৃষ্টি দুটো যেন বিঁধছে।

সঙ্গীরা কেউ নেই। ওর মুহূর্তে মনটা যেন কেমন করে ওঠে। ও কি যেন ভেবে উঠানে নেমে দাঁড়ায়। তারপর গেট দিয়ে বেরিয়ে মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে।

বাড়িশুদ্ধ বৌ-ঝিরা অবাক হয়ে যায়। তারা ছুটে গেট পর্যন্ত আসে। কিন্তু অহল্যা পিছন ফিরেও তাকায় না।

ফুলদি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন, কি হল মিস্টার ডাস্?

মেয়েটা পাগল্।

কিন্তু একথা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

এ বাড়ির যে কেউ নয়, সেই চলে গেছে—তবু অনেকক্ষণ ধরে একটা শূন্যতা যেন বোবা কান্না কেঁদে ফেরে।

দুই

ছুটতে ছুটতে অহল্যা যেন তার বাল্যজীবনে চলে যায়। এই ইটকাঠের অট্টালিকা বাড়ি ঘর পেরিয়ে, পিচগলা রাস্তার জ্বালা ছাড়িয়ে—অনেক দূরে গ্রাম্যপথে। ফাগের মত মাটি মোলায়েম ঠেকে পায়। সারা গায় স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে বাঁশ বাবলার, কখনো বা হরিতকী আম জাম আমরুলের।

অহল্যা ছুটে চলে তার কৈশোরে।

লোহার সেতু পেরিয়ে এসেছে, এবার বাঁশের সাঁকো পার হয়। অগভীর খালের জলে, জলো উদ্ভিদে ওর যেন মন কেড়ে নিতে চায়। ও খালে নেমে শ্রান্ত পা দুখানা ধুয়ে ওঠে। একটা অশথ গাছের ছায়ায় বসে। কান পেতে হরিয়ালের শিস শোনে। ফল খেতে এসেছে ওরা বিকাল বেলায়।

ও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে ঘাসে।

পাখিগুলো শুধু খায় না—খেয়ে-দেয়ে খেলা করে। জোড়া বেঁধে নাচে মগডালে। সন্ধ্যা বেলা ওদের শেষ হয় খেলা। কি যেন কি ভাষায় কথা বলে সঙ্গীদের সঙ্গে। তারপর ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়।

কোথায় যায় ওরা? অনেকক্ষণ ধরে অহল্যা ভাবে। ওদের কি বাড়িঘর আছে মানুষের মতো? নিশ্চয় আছে। কিন্তু কত দূরে? ও ভাবতে ভাবতে গহন কান্তার পেরিয়ে যায় কিশোরী মনের ডানা মেলে। তবু খুঁজে পায় না। আরো খোঁজা উচিত ছিল—কিন্তু সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে যে। ও ভারী মন নিয়ে বাড়ির দিকে ফেরে।

প্রতিবেশী এক দিদিমা গল্প বলছে নাতনীদের নিয়ে। পাশে একটা ছাগল বাঁধা। একটা বিড়াল ঘুরছে মেঁউ মেঁউ করে। প্রদীপ নেই। চাঁদের

আলোতেই আসর জমেছে? লেবু বনে জোনাকি জ্বলছে থোকায় থোকায়। ও জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ দিদিমা, সন্ধ্যে বেলা পাখিরা সব যায় কোথা?

কেন ওদের বাসায়।

আমাদের মতন সব ঘরবাড়ি নাকি?

নারে। পাখির বাসা দেখিস নি কক্ষনো?

এ তো শালিখ বাবুই নয়—হরিয়ালের কথা শুধাচ্ছি।

হরিয়াল কি ভাবে কোথায় বাসা বাঁধে দিদিমার জানা নেই। বুড়ী একটু মুশকিলে পড়ে। তবু বলে, সব পাখিদের মত ওরাও ঠোঁটে করে দাঁড়া কুটো নিয়ে বাসা বাঁধে খুব উঁচু গাছে।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, কত উঁচু? ঐ আমাদের পুকুরপারের পাঁকুড় গাছটার মতো?

না তার চেয়েও উঁচু।—বুড়ী ভাবে যত বেশি উঁচু হবে, ততই হবে বিস্ময়ের বিষয়।

তবে কি আকাশের সমান?—অহল্যা হাসে।

না লো, অনেকগুলো তাল গাছের সমান।

ওরা ওখানে কি করে?

ঘর সোংসার।

ওদের কি বর বৌ আছে?

থাকবে নি কেন—নইলে কি সোংসার হয় বোকা? তোদেরও হবে, তখন বুঝবি।

অহল্যাকে একটি ছোট্ট মেয়ে বাধা দেয়?—তুই থাম না অহল্যা দিদি, গল্পটা শুনতি দে? তারপর রাজপুত্তুর কি করলে গো দিদিমা?

অহল্যা থামে।

কিন্তু আবার ছুটে চলে কৈশোরের আর এক প্রান্তে। মরিয়া হয়েই ছোটে। মুক্তার মতো এক একটি রহস্য যেন উঠে আসছে তার জীবনসমুদ্র থেকে। উদ্ঘাটিত হচ্ছে বিস্ময়।

সকাল হয়েছে। গোমুখী নদীর তীরে গোরু-ছাগল চরছে। কচি কচি ঘাসে এখনো রয়েছে শিশির ফোঁটা জড়িয়ে। নদীর জলধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু দেখাচ্ছে একখানা সুদীর্ঘ রূপালি পাড়ের মতো। পশ্চিমের ঐ ধূ ধূ পর্বত বেঁকে বেঁকে গেছে।

নদীর পারেই একখানা বাড়ি। কাঠাল ও পেঁপে গাছের ঘোমটা ঢাকা। উঠানের এক পাশে রয়েছে একটা পাণ্ডুজবার গাছ। চন্দনবর্ণা ফুলে ফুলে ছেয়ে রয়েছে গাছটা।

অহল্যা ডাকে, পদ্ম, ঘর বাঁধবি—বাঁসা ? তবে চুপটি করে চলে আয়।

পদ্ম ধান ঝাড়ছিল। সে পালিয়ে আসে কুলা ফেলে। ওরা হাত ধরাধরি করে নদীর পারের দিকে আর একটু এগিয়ে যায়। একটা গাছের তলে দাঁড়ায় থমকে।

পদ্মর বাবা আসছে নাকি চোখ রাঙিয়ে ? না!

ঘর বাঁধতে চাইরে পদ্ম পাখিদের মতো ? তুই হবি বর—আমি বৌ। তুই হাটবাজার যাবি, আমি রান্নাবান্না করব ঘরে বসে।

তা হলে খেলব না ভাই। তুই ভাল ভাল শাড়ি পরবি, আর আমি গামছা ? উহুঁ আমি ধান ঝাড়তে যাই। মা বকবে। বাবা হয়তো তেইড়ে আসবে।

কেন তুই ট্যাকাপয়সা নাড়বি-চাড়বি, শহর বন্দরে যাবি, রেল বাসে চড়বি—কত মজা। ঝিক্ ঝিক্ পোঁ পোঁ। ··

আর তুই বুঝি ঘরে বইসে গয়না পরবি—? সে হবে না। আমি চললাম ভাই।—পদ্ম ঠোঁট উলটে ফিরে দাঁড়ায়।

তবে কি করতে চাস তুই ?

আমি বৌ হব।

তাই তবে হ—অগত্যা রাজী হয় অহল্যা।

কিন্তু যখন শাড়ি গয়না আলতার কথা মনে পড়ে, ওর মনটা যেন কেমন করে ওঠে। এত মন-লোভা সজ্জা ও কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অথচ পালটা প্রস্তাব করার উপায় নেই, পদ্ম অমনি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে। কি মুশকিল যে বাঁধালে এই এক কুচি ধানিলঙ্কা!

আচ্ছা আয় আমরা দুজনেই বৌ সাজি ?

সতীনের সাথে ঘর ? সে আমি করব নি, মরে গেলেও। আবার তুই হবি বড় সতীন, সে হবে নি! এমনিতেই তোর যে কথার হুল!

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। খেলা জমছে না মোটে। অগত্যা অহল্যা বর হতেই স্বীকার করে। সে পাছাপেড়ে শাড়িখানা পুরুষালি ঢঙে পরে। ঝুটি করে বাঁধে চুল। পায়ে খাড়ু আছে—মন্দ দেখায় না।

পদ্ম আদর করে বলে, আমার নাড়ুগোপালটি।

অহল্যার ভাল লাগে না।—আমি কি তোর ছেলে? বলবি তুমি। এসো তোমার পা ধুইয়ে দি।

আমি কি ঝুমুরপিসী যে পা ধোয়াব বরের? আমি নেতাইর মা। কানে ধরে ওঠ-বস করাব একটু পান থেকে চুন খসলে।

তা তুই পারবি? তুই তো মেয়ে নয় মন্দ।

কাজ আদায় করতে হলে একটু কড়া হতে হয়। না ঠ্যাঙালে কি গোরু চলে।

পদ্মর চোখের ভঙ্গী দেখে গা জ্বলে যায় অহল্যার।—কি বললি বরকে? সে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে ছুটে পালায়।

পদ্ম কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফেরে। এবং বাড়ি ফিরে মার হাতে আরো কয়েকখানা ঠোনা খায়।—সেদিন আর কিছু হয় না।

কিন্তু বাসা বাঁধার নেশা কাটে না অহল্যার। এ পাড়ায় আর ওর সমবয়সী নেই। ও খেয়ে দেয়ে একা একা বনে বনে ঘোরে। পদ্মর কাছে যাওয়ার মতো ওর আর মুখ নেই। অহল্যা অতটা রেগে না গেলেই পারত। কিন্তু পদ্মটার কি মুখ! বরকে বলে কিনা গোরু। শুনলে কার না গা জ্বলে ওঠে!

পদ্ম বলে কিনা অহল্যার কথায় হুল। থাকতে পারে। কিন্তু পদ্মর যে ঠোঁটে ছোবল। কোনটার বিষ বেশি? বেশ করেছে অহল্যা ওকে মেরে। শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে বৌ-সাজুনিকে। কত করে বলল অহল্যা, তবুও গোঁ ছাড়ল না। আর কি পায় ধরচে পুঁই বীচির?

অহল্যা নিজের স্বপক্ষে যত যুক্তিই খাড়া করে ততই মন পোড়ে ধানি-লঙ্কার জন্য। বন্ধুত্ব আছে নানা রকম। তবে ঝাল ঝাল চাটনির আস্বাদ আলাদা। সকলের কাছে সব সময় তাল-পাটালি আর ভাল লাগে না।

ভাল মন্দ খেয়ে অহল্যার অরুচি ধরে গেছে। ওর বাবার যেমন অভাব নেই, তেমনি কার্পণ্য নেই খাওয়া-পবায়। গোয়ালে গোরু আছে, মোড়াই বোঝাই ধান। ক্ষেত খামারে নানা ফসল হয় বারমাস। হাঁসও আছে প্রায় কুড়ি দেড়েক। ডিম পাড়ে ডালা বোঝাই। তাই ওর ধানিলঙ্কা ভাল লাগে। যা সাধারণত জন্মে গরিব গৃহস্থের ডোয়ার পাশে।

পদ্মের বাবার বড্ড অভাব। সে কৃষাণ খাটে অহল্যাদের বাড়িতে।

ওর বাবা নিজের সংসারের বেলা কৃপণ না হলেও মজুরির দর নিয়ে যথেষ্ট কষাকষি করে পদ্মর বাবার সঙ্গে। দু-একদিন প্রায় রাগারাগি হয়ে যায়।

এমন করলে তুমি আর এসোনি জন খাটতে। অমন করলে আমার পোষায় না। এ আমার গায়ের রক্ত-জল-করা পয়সা। বড় কষ্টে এ সব জমি ক্ষেত করতে হয়েছে। আজকাল ফসল বেচে লাভ হচ্ছে না। তাতে সরকারের জুলুম—এটা খাস করছে, ওটায় ট্যাক্সো বসাচ্ছে। কেন ব্যাঙ্কের টাকাগুলো কি চোখে পড়ে না? সেগুলো খাস করো না!—একটা বড় হুঁকোয় কষে কষে টান দেয় অহল্যার বাবা।

একখানা ছেঁড়া গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, পদ্মর বাবা জবাব দেয়, আমাদের বুঝি সুখের পয়সা যে বেহিসেবে ছেড়ে যাব? সেদিন এক গাড়ি উচ্চে বেচে কি লাভ হয় নি তোমার? তবে বলতে পার যে তেমন হয় নি। জল হয় নি তেমন, তাই ফলন কম হয়েছে এবার। কিন্তু আমরা কি খেইটেছি কম? দাও দাও পয়সা না থাকে সের পাঁচেক ধান দাও।

বল কি? ধান! ধানের দাম জানো?

আমি জানি, কিন্তু আমার ছেলে-পুলের পেট তা মানতে চায় নি। আমাদের ঠকালে এবার জল হয়েছে, সামনের বার কোন্ না বাজ পড়ল মাঠে।

তাই পড়ুক। এবার নয় সামনের বার সেই ছাই নিও।—বলে অহল্যার বাবা উঠে বাড়ির দিকে চলে যায়।

ওকি মহাজন?

অহল্যার বাবা হাতে কলমে না মারলেও পদ্মর বাবার গলায় রাম টিপুনি দিয়ে যায়।

পরদিন সকাল বেলা অহল্যার বাবাই আবার এসে ডেকে ভাব করে।—রামকানাই বাড়ি আছ?

এক রাত্তির না খেয়ে মরি নি—ভিতরে এসো। ঐ মোড়াটায় বস। হুঁশিয়ার, ভাঙা কিন্তু।

এই চাল সের জাল দিয়ে খেয়ে শীগগির এসো আমার বাড়ি।

কেন?

পশ্চিমের খেতটা নিড়াতে হবে। আমিও সাথে থাকব। ধানের বদলে চাল কি মন্দ হল? এর বেশি আমাদের দেওয়ার উপায় নেই। এখনো

কি রেগে আছ নাকি? ভারতপুরাণে লেখা আছে এ ধর্মের রাজত্বে ছোটবড় ভেদ নেই। রাধামৃত তো প্রেমের সমুদ্দুর। আমার কাছে এসো গল্প বলে শোনাব। কৃষ্ণ কত অবিচার করেছে, তবু রাই উন্মাদিনী।

রাইকে তো মজুরি খেটে সংসার চালাতে হয় নি। আচ্ছা চলো, আমি যাচ্ছি। পাঁচ সের ধান দিলে, আড়াই সের চাল হত—যা এনে দিয়েছ তাতে কি রাধামৃত শোনার মেজাজ থাকে?

দুই বংশের দুটি মেয়েও প্রায় একই সুরে বাঁধা। তবে পাকা ফলে যে আস্বাদের তার থাকে, এদের মধ্যে এখনো তা জন্মে নি।

অহল্যা বেড়া লতার ফাঁক দিয়ে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে ডাকে, পদ্ম! ও পদ্ম! বাড়ি আছিস?

আজ আর কোনো জবাব দেয় না পদ্ম। ভিতরে ঢুকতে সাহস হয় না অহল্যার। ও যে কাল মেরেছে, নিশ্চয় পদ্ম বলে দিয়েছে বাপ মার কাছে। ও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বৃথাই বেলা গড়িয়ে যায়। বৃথাই কেটে যায় অমন মধুর ঘর-করণের মরসুম।

একটি লম্বা ছিপছিপে ছেলে বেরিয়ে আসে। কুচকুচে কালো হলেও মুখে তার একটা আলগা কমনীয়তা। পদ্মর থেকে বয়সে কিছু বড়—ওর আপন ভাই। মাঝে মাঝে ওদের দেখতে আসে। কারণ স্থায়ী ভাবে থাকে মামা বাড়ি।

লোকে জানে পড়তে দিয়েছে, কিন্তু আসল কথা অভাব। মরে গেলেও রামকানাই সত্যি কথাটা কখনো স্বীকার করে না।

সারা জীবন তো জন খেটে দেখলাম, কি হল? চোখ বুজলেও দেখি অভাব আর তোমার দাঁত খিঁচুনি। তার চেয়ে ছেলেটা লেখাপড়া শিখুক।

অহল্যার বাবা বলে, হ্যাঁ, বি-এ পাশ দেবে!

ঠাট্টা করছ? দিতেও পারে। তখন তুমিই কোন্ না পায় ধরে সাধলে। ভাগ্যের পাশা ওলটাতে লাগে কি?

অবস্থা ভাল হলেও অহল্যার বাবার ছেলে নেই। একটিমাত্র মেয়ে। তার বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। তারপর তার মুখখানা রাগে লাল হয়ে যায়। সে মনে মনে বলে, হায়রে কুঁজো, তোর চিত হয়ে শোয়ার ইচ্ছে! মুখে বলে, ঝড়ে কাগ মরতি পারে, আমাদের এই শুকনো গোমুখীতে বন্যা হতে পারে—ভাগ্যের খেলা কিছু বলা যায় না রামকানাই। তবে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না মাখাই ভাল।

কেন, আমাদের কি সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই? তা-ও কি তোমার একচেটে?

কথা না বাড়িয়ে কাজ করো—পাশ দিলে দেখা যাবে।—ছাতাটা মাথায় দিয়ে অহল্যার বাবা বাড়ির দিকে ফেরে।

ক্ষেতে কাজ করতে করতে রামকানাইর আজ নিড়ানি মাঝে মাঝেই বন্ধ হয়ে আসে। সে ধূ ধূ তপ্ত মাঠে স্বপ্ন দেখে—এক ঘোড়সওয়ার যেন ছুটে আসছে। গায় সার্ট, পরনে প্যাণ্ট, হাতে লাগাম। ঘোড়াকে বাগে রাখতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

কে এ ঘোড়সওয়ার?

ও যে তার ছেলে শিবু!

পাশের সংবাদ নিয়ে এসেছে নাকি মামার ঘোড়ায় চড়ে?

চিরদরিদ্র চিরবঞ্চিত পিতার হৃদয় মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে ওঠে।

রামকানাই নিড়ানির ঘায় চমকে ফিরে তাকায়। খানিকটা তার হাত কেটে গেছে। ক্ষতস্থানে একটু ধুলো লাগিয়ে, সে কপালের ঘাম মোছে।

অহল্যার বাবা বাড়ি ঢুকে স্ত্রীকে বলে, অহল্যাকে আর রামকানাইর বাড়ি-মুখো হতে দিস নি।

কেন গো?

রামকানাই দুঃখ করছিল যে ওর ছেলেটা নাকি ইচড়ে পেকে গেছে। দিয়েছিল মামাবাড়ি লেখা পড়া শিখতে, হয়েছে চোর। তামাকে পোষায় না, বড় বড় সিগ্রেট খায়। মামার দোকান থেকে চুরি না করলে এত পয়সা পায় কোথায়? সিগ্রেট বড্ড খারাপ জিনিস রে, খেতে খেতে বুক শুকিয়ে যাবে বিষে।

তারপর—।

খুব নিচু গলায় অহল্যার বাবা বলে, যক্ষে!

হাজার হলেও ছেলে-পুলের মা বিনোদিনী। তার কানে কথাটা মোটে ভাল ঠেকে না। সে বলে, তুমি কিছু বললে না কেন?

আমি তো আগেই বলেছিলাম, বাপের হাতে হাতে পান্তা তামাক জোগাতে। তা কেউ আমার কথা শুনলে নি। তুই অহল্যাকে বারণ করে দিস চোরের সাথে মিশতে। তা হলে কিন্তু চুলের ঝুঁটি থাকবে নি।

শিবু তো মামা বাড়ি থাকে।

মাঝে মধ্যে তো ঠ্যাঙাড়ির ভয়ে এখানে আসে।

সেই চোরের সঙ্গেই অহল্যার মুখোমুখি হয়ে যায়। সে বাগানের কর্তা নিয়ে সম্বন্ধে সচেতন তাই ইতস্তত করতে থাকে, কি বলবে?

চোর!—ফিক করে হেসে অহল্যা ছুটে পালায়।

কিছু বুঝতে না পেরে শিবু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

অহল্যা আবার খানিক বনে বাগানে ঘোরে। দু-একটা পাখি-পাঁখালির বাসা বাঁধা দেখে। কি আশ্চর্য! ওরা অতটুকু ঠোঁটে করে অত বড় শুকনা লতাটাকে নিয়ে এল কি করে? একা একটিতে যখন পারল না, টেনে আনল দুটিতে একত্র হয়ে।

পাকা ঘরামিও ওদের সঙ্গে নিপুণতায় এঁটে উঠতে পারে না। কত মুন্সিয়ানা ওদের ঠোঁটের বাটালিতে, নখের সাঁড়াসিতে!

এবার ডিম পাড়বে পক্ষিণী। একটু সলজ্জ চোখে অহল্যা সরে আসে। তারপর অনেকগুলি বাচ্চা। সদ্য ফোটা ফুলের মতো পালক। কি কচি, কি নরম! এবার পাকা পোক্ত ঘর সংসার। সময় নেই পক্ষিণীর।

কিন্তু অহল্যার যে সময় কাটে না। সে গিয়ে আবারও ডাকে, পদ্ম!

উত্তর দেয় শিবু। পদ্ম তোর সাথে খেলবে নি—আড়ি দিয়েছে।

হঠাৎ অহল্যার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তুই খেলবি?

কি খেলা?

আমরা বাসা বাধব নদীর পাড়ে।

সত্যি! চল চল।

ওরা দুজনে এসে পূর্বপরিকল্পিত স্থানে সেই গাছের তলায় দাঁড়ায়। অদম্য উৎসাহে পিতার শাসনির কথা ভুলে যায় অহল্যা। শিবু তো চোর নয়—বড় ভাল ছেলে। অহল্যা যেমনটি হুকুম করে, তেমনি ভাবেই ও মন জুগিয়ে খাটে। পদ্মর মতো কথায় কথায় ফণা তোলে না, বিষও ঢালে না।

ওরা দুটিতে একত্র হয়ে কাঠ বাঁশ ও বেলে মাটি দিয়ে মনের মতো ঘর বাঁধে। কিছু ত্রুটি রাখে না। ঘরের তোষক বালিশ হয়, নরম নরম দূর্বা ঘাস। কচি কলা পাতার শীতলপাটি। আর্শী নদীর জল। এক রকম চ্যাপটা ফল কাঁকই—কাঁটা কাঁটা, যা দিয়ে মাথা আঁচড়ান চলে খেলা ঘরের।

পুরুষ বর—নারী ঘরনী, এমন আশা কখনো কল্পনা করে নি অহল্যা। ও ইচ্ছা মতো শিবুকে দিয়ে ফুল আনায়, মালা গাঁথে। অনন্ত বাজু পৈছি

পরে। সাজ করে কাল্পনিক বধূজীবনের। ভান করে গমক ঠমক চাপল্যের!

শিবু অবাক হয়ে দেখে।

অহল্যা ভাবে, বিয়েটা হয়ে যাক আগে। তারপর ভালমানুষের পোর নাকে নথ দিয়ে ঘোরাবে। পদ্মর ওপর যে ঝাল তুলতে পারে নি, শিবুর ওপর তা তুলবে। ওকে দিয়ে পা ধুইয়ে ছাড়বে। ওর সঙ্গে পদ্ম দিয়েছে কিনা আড়ি! কৃষাণের ঝির এত বড় সাহস!

কিন্তু শিবুটা যে বড্ড গোবেচারি! অহল্যা সমস্যায় পড়ে। যাক, মিছি-মিছি মান করে ওকে দিয়ে একটু শুধু পা ধরিয়ে ছাড়বে। অহল্যার নারী প্রকৃতি ছলছল করে হাসে।

বিয়ের যোগাড়-যন্ত্র করতে করতে অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, তুই মামা-বাড়ি কি করিস?

চুরি করে একটু আধটুক পড়ি, আর বাকি সময়টা—

কি পড়িস?—অহল্যা বাধা দেয়।

শিবু জবাব দেয়, লেখা পড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

তাই তুই চড়িস নাকি?

ছাই চড়ি! ও লেখা আমাদের জন্য নয়।—শিবুর কচি মুখ দিয়ে একটা মর্মান্তিক সত্য কথা বেরিয়ে আসে। ক্ষণিকের জন্য অহল্যা হাতের কাজ থামায়।

চুরি করে পড়িস কেন?

নইলে মামা রাগ করে। তাঁর কাজের ক্ষেতি হয়। দিন রাত্তির আমাকে দোকান সামলাতে হয় কিনা!

অহল্যার মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ওর পিতার ঐশ্বর্য যদি ওর আয়ত্তে থাকত, তবে এই চোরকে মহৎ করা যেত। একবার বুঝিয়ে বলবে নাকি তার বাবাকে? অহল্যার বাবা যা শুনেছে সবই তো মিথ্যা।

অহল্যা, তোর বাবা আসছে এদিক পানে। হাতে ছপ্‌টি (ছড়ি)।

শিবু ছুটে পালায়। অহল্যাও উধাও হয় নিকটের এক বাগানে।

সন্ধ্যা বেলা এসে দেখে তার এত সাধের বাসা ভাঙা। দুটি কচি কচি পায়ের চিহ্ন—নিয়তির মত ক্রূর।

তিন

অহল্যা পাঁচ ইঞ্চি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোন দিকে যে যাবে তাই ঠিক করতে পারে না। সব বাড়ি, সব গলি মনে হয় এক রকম। তবু সে সুমুখ বরাবর ছুটে চলে। খানিকটা গিয়ে রাস্তাটা বাঁক ঘুরেছে। অহল্যাও বাঁক ঘোরে। দুদিকে দুটো ডাল। কোনটা ধরে এগুবে? চিন্তা করার দরকার। কিন্তু তার সময় কোথায়? কিছু ছাই মনে নেই। তবু সে মগজ খাটাতে চেষ্টা করে।

এই গলিটার ঐ হলদে বাড়ির পাশ দিয়েই তো এসেছিল। নতুর ছেলেটা জল খেতে চেয়েছিল ঐ ওখানে দাঁড়িয়ে।

আবার বাঁ দিকের গলিটাও প্রায় একই রকম চওড়া, একই রকম দেখতে। হলদে বাড়ি ওখানেও আছে একখানা। এ যেন গোলক ধাঁধা।

পিছন থেকে কারা যেন ওকে লক্ষ্য করছে। অহল্যা একবার চকিতে চোখ ফিরিয়েই যে কোনো একটা গলিতে ঢুকে পড়ে। সেই নীল চোখো রাক্ষস ওকে না আবার দেখতে পায়। ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই সে আছে। কেমন করে চেয়েছিল বাপ রে! ও পিঠের আঁচলটা ভাল করে জড়িয়ে নেয়।

পথটা যদি ঠিকই হবে ওর সাথী সঙ্গীরা গেল কোথায়? বিকালের রোদে চারদিক থেকে কেমন যেন তপ্ত হাওয়া ছাড়ছে। মনে হচ্ছে বাড়ি ঘর রাস্তা যেন শ্মশানে চড়িয়ে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। এতটুকু রস কস নেই, শুধু আগুন।

এমনি শুকনা ওর সঙ্গী সাথীর মন। নইলে ওকে একা ফেলে যেতে পারে?

অহল্যা থামে না, দম নেয় না—এগিয়ে চলে আন্দাজে।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে অহল্যা একটু দাঁড়ায়। সুমুখে আর যাওয়া

যাবে না। কাঁটা তারের ঘন বেড়া। তারপর একটা জনশূন্য মাঠ। মনে হয় কোনো গোরস্থান।

অহল্যা লক্ষ্য করে দেখে কাঁটার তারের ভিতর দিয়ে কোনো পথ আছে কিনা? আছে। কিন্তু সে পথ গলে যেখানে গিয়ে উঠবে, সে তো ওর গন্তব্য পথ নয়। ওকে ধরে জীয়ন্ত কবর দিলেও কেউ টের পাবে না।

অহল্যা ফিরে দাঁড়ায়। যে বাড়ি থেকে সে ছুটে পালিয়ে এসেছে, চেষ্টা করলে সে বাড়ির পথটা হয়তো সে চিনতে পারে। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। যেমন নীল চোখের ভয়াল দৃষ্টি, তেমনি ফুলদির ব্যবহারও বিস্ময়কর। সব দিলেন, সব করলেন, কিন্তু ঐ লোকটার কথায় কেন যেন গলে গেলেন। নিঃসন্দেহে ওঁরা পরম আত্মীয় নন পরস্পরের। আত্মীয়তার আলাপই আলাদা।

অহল্যাকে উদ্ধার করতে চাইছিল। ইংরেজীতে আরো কত কি ইঙ্গিত করেছিল কে জানে!

ফুলদি তো কোনো আপত্তি করলেন না। ফুলদি তবে নিছক সেই ফুলটিই নন, যেটি শুধু দেবতার পায়েই দেওয়া চলে। উনি হয়তো মধু বিলিয়ে বেড়ান মৌমাছি দেখলেই। নীল চশমা সেই মধুমক্ষিকা। নিশ্চয় এসেছিল আগোছাল বেশ বাস দেখে।

কদিন বা অহল্যা শহরে এসেছে। এর মধ্যেই তার অভিজ্ঞতা হয়েছে অল্প বিস্তর। ছেঁড়া কাপড় সামলাতে সামলাতে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমাজ নেই, বন্ধন নেই, লজ্জা নেই, শুধু ঘৃণিত হল। ওর টন টন করে ওঠে সারা বুকটা।

ও কাপড় সামলায়। মুখের ওপর টেনে দেয় খানিকটা ঘোমটা।

ফিরে চেয়ে দেখে সুমুখে সাইকেল। সাইকেলে নীল চশমা। গিলে খাবে ওকে যেন আস্ত।

অহল্যা আর্তনাদ করে উঠতে চায়। কিন্তু সে খুব জোর সামলে নেয় নিজেকে।

সাইকেলের পিছনেও এক জোড়া কুতকুতে চোখ। সুমুখের মানুষটা থেকে পিছনেরটা যেন বেশি গুণ্ডা। এ নীল চশমা ও কুতকুতে চাহনি ব্যারাকের নয়। যেন গোরস্থানের কুটুম্ব।

হাবুল হচ্ছে এ পাড়ার দেহশ্রী। সমস্ত দেহখানা ফিনফিনে সাটিংয়ে ঢাকা।

চোখেও গগলস্। এর পর বক্সশ্রী, বিশ্বশ্রী তার আদর্শ। তার বাপ এককালে ট্যুইসিনি করে সংসার চালাতেন। দিন কাটত বড় কষ্ট ক্লেশে। একপো দুধও রোজ করে দিতে পারেন নি হাবুলকে। পঞ্চাশ টাকা চালের বাজারে তো প্রাণ যায় যায়।

একদিন স্ত্রী বললেন, মা-কালী বাড়ি চলো। তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা নেই বলে কিছু হচ্ছে না।

কেন, ছেলে তো হয়েছে হাবুল। দেখা মাত্র পাড়ার লোকের চোখ খাড়া।

তুমি কোনো দিন ওকে দেখতে পার না, তাই একথা। বেঁচে থাকলে দেখবে ও-ই তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে—হিংসুকদের মুখে পড়বে ছাই।

আমি কিছু দেখতে চাইনে। তোমার কাছে করজোড়ে বলছি আমার মুখ আর উজ্জ্বল করার দরকার নেই।

একটা কুরুক্ষেত্র হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ, কিন্তু অনেক কথা আছে বলে স্ত্রী আপাতত লোভ দমন করেন। বলেন, এ বাজারে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে, তুমি কেবল ধরতে পারছ না। হাবুলের পিসে কি কোনো পাশ দিয়েছে? কিন্তু সে সোডাওয়াটার বেচে লাখোপতি হয়ে গেল। আমি অনেক ভেবে দেখলাম, তার একমাত্র বল রক্ষে কালী। ভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই। তাই তোমাকে যেতে বলছি।

দিশেহারা হাবুলের পিতা বলে, এক রবিবার চলো।

এক রবিবার নয়, আজ সন্ধ্যের পরই যেতে হবে। দেখবে কত সব বড় লোক এসে ওখানে ধর্না দিচ্ছেন। তাঁরা কি সবাই রুই কাতলা হয়ে জন্মেছেন? সবই মায়ের অনুগ্রহ।

সেটা তো ভাল জিনিস নয়। হলে সামলাবে কে? এক চাল কিনেই নাজেহাল—

তুমি ভগবান কি ভক্তির কথা শুনলেই অমন কর বলেই তো কিছু হয় না। আমার সারাটা জীবন খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়ে গেল।—অঞ্চলে মুখ ঢাকেন হাবুলের মা।

অমনি রাজী হয়ে যান হাবুলের বাবা ঐতিহাসিক যাত্রায়। দেশের বড় বড় নেতা, জজ, ব্যারেষ্টার যাঁরা ইংরেজি ছাড়া লেখেন না, ইংরেজি ছাড়া ভাবেন না, তাঁরা যখন কুম্ভ মেলায় স্নান করছেন, মাথা মুড়াচ্ছেন গয়ায় তখন আর হাবুলের বাবার এ গোঁয়ারতুমি কেন? তিনি আর কতটুকুই বা ইংরেজি পড়েছেন?

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ভাবেন, এ জগতটাকে শেখাবার ভার নিয়েছেন যাঁরা তাঁদেরই একজন তিনি এবং তাঁর গৃহিণী ঐ বসে। ক্ষুধায় পরিমিত অন্ন নেই, যৌবনে স্বাস্থ্য নেই, প্রয়োজন মতো বস্ত্র নেই লজ্জা ঢাকার। এমন স্ত্রী যদি আশ্রয় নিতে চান ঈশ্বরের, তিনি কেন বাধা হবেন।—আজই তবে চলো, ছাত্রের বাড়ি না হয় মিথ্যা কিছু বলা যাবে, নইলে বেতন কাটবে।

অহল্যা খুবই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সুমুখে সাইকেল, পিছনে কবরখানা। সে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

হাবুল বলে, থামো।

অহল্যার বুক শুকিয়ে যায়।

কুতকুতে চোখ খুশ্ খুশিয়ে হাসে।

সময় মত হাবুলের বাবা মা-র বাড়ি গিয়ে হাজির। গাইড্ হাবুলের মা—ওরফে পিঙ্গলা দেবী।

আজ যেন কি একটা বৃহৎ যোগ। রানী এসেছেন কাঞ্চনপুরের। সঙ্গে তাঁর দশ বার খানা মোটর এবং সেই অনুপাতে লোক লস্কর। রানী কনট্রাক্ট করেছেন পূজা করবেন আড়াই ঘণ্টা। প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে যায়, তবু রানীর বেরুবার নাম নেই। কাঁসর ঘণ্টা ধূপের ধোঁয়ায় হাবুলের মার দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড়। এক হাতে স্বামীকে ধরে রাখতে হচ্ছে, অন্য হাতে সামলাতে হচ্ছে রানীর দাসদাসী ও উৎকণ্ঠিত যাত্রীদের ধাক্কা। হাবুলের মা মনে মনে জিজ্ঞাসা করেন, মা গো এখানেও কি ভেদ বিচার?

মা কোনো জবাব দেন না। আর দেবেন কি! তিনি তো লজ্জায় সোয়া হাত জিভ বের করেই আছেন!

রানীর আরো নাকি এক ঘণ্টা দেরি আছে।

হাবুলের মা রাগ করে বলেন, এ পূজো নয়—পিরীত।

রাস্তায় ওঁদের স্বামী স্ত্রীকে এক গণক ধরে ফেলেন।—দেখা বুঝি হল না?

হাবুলের মা বলেন, না। পয়সা ছাড়া জগতে কিছু হয় না ঠাকুর।

বিধাতা আপনাকে সেই পয়সাই দেবেন, তাই আজ আমার কাছে পাঠিয়েছেন। দেখি আপনার বাঁ হাতখানা।

হাবুলের মা বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ডান হাতখানা এগিয়ে দেন।

ওখানা নয়।

ওঃ! ভুল হয়ে গেছে আমার।

ভুল করেই তো এত লোক কষ্ট পায়। নইলে পরিষ্কার একখানা ঠিকুজী করিয়ে নিলে ভূত-ভবিষ্যত কিনা জানতে পায় বলুন তো? অভাবে হস্তরেখা বিচার, সে তো আমি নামমাত্র দক্ষিণায় করছি। শাস্ত্রে ঈশ্বরে মানুষের বিশ্বাস নেই হবে কি?

হাবুলের মা চেয়ে দেখেন, লোকটি বৃদ্ধ। কপালে রক্ত-তিলক। সুমুখে রাশি গণনার ছক। মুখে দিব্য হাসি। শুধু হ্যারিকেনটা উজ্জ্বল করে বাড়ান অর্থাৎ বর্তমানটাই অস্পষ্ট—এই যা একটু সন্দেহ।

আপনার হাতখানাও দেখি। আপনাদের বরাত ফিরতে আর দেরি নেই। রাহু কেটে গেছে, এখন বৃহস্পতির সঞ্চার হতে যা একটু বাকি।

ভাল করে হাত দুখানা একত্র করে দেখে গণকঠাকুর বলেন, যা বলেছি তা ঠিক। আপনি আপনার ছেলের নামে শুধু একখানা লটারীর টিকিট কিনুন।

হাবুলের মা প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, বলি নি যে আমার সোনার চাঁদ তোমার মুখ উজ্জ্বল করবে। এখন দেখছি শুধু তোমার নয়, তোমার চৌদ্দ পুরুষের।

একেবারে নগদ একটা টাকা হাতে গুজে দেন আঁচল খুলে হাবুলের মা গণকঠাকুরের।

বুকটা টাটিয়ে ওঠে হাবুলের বাবার, তবু কি আজ প্রতিবাদ করার উপায় আছে?

কিছুটা লোভ, কিছুটা দুরাশা—আর বেশির ভাগ স্ত্রীর ঝামটার ভয়ে একটি টাকার একখানা টিকিট কিনে আনেন হাবুলের বাবা। সেও অতি কষ্টে।

হাবুলের বাবা জীবনে আর পাঁচজনার মতো অনেক পরিশ্রম করেছেন। পাকা তীরন্দাজের মতো সন্ধান করেছেন অনেক। সেগুলো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এবারেরটা হয় মোক্ষম। আশাতিরিক্ত না পেলেও, কিছু টাকা পেলেন।

এবং তাই সম্বল করে সুরু করলেন মিলিটারী কনট্রাক্ট। হাবুলের পিসের মতো জালের নয়—দুধের। কি পাকা রঙ্! যত তরলই কর না কেন, নিজ আভিজাত্য ছাড়ে না। ওর সঙ্গে ডান হাত বাঁ হাত চললে কেউ ফিরেও তাকায় না। অনেক টাকা আনাকে পাউণ্ড শিলিং করেছেন হাবুলের বাবা,

অনেক পাউণ্ড শিলিংকে টাকা আনা। কিন্তু এ মহামূল্য ভক্তিরস কোথায় ছিল! যুদ্ধের দৌলতে লাভ হয় প্রচুর।

কিন্তু লোকসান হয় একটি বস্তু—সেটি বিষয়।

মায়ের আদরে এবং বাপের অসতর্কতায় হাবুলের লেখাপড়া হয় না। পূর্বের ডানপিটে ছেলে এখন অপূর্ব হয়ে ওঠে। আগে পয়সার অভাবে যা করতে পারে নি এখন তা অনায়াসে করে। ক্লাব-মাইক-সিনেমা-জলসা। বড় বড় স্বনামধন্য সব ব্যক্তিরা আসেন হাবুলের প্রতিষ্ঠিত ক্লাবে। হাবুলের বিশেষ কিছু বলতে হয় না—তার মোটরই কথা বলে।

অহল্যা আঁকু পাকু করে, সাইকেলের প্রতিবন্ধক এড়িয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

হাবুল ইচ্ছা করেই সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা এমন ঘুরাচ্ছে ফিরাচ্ছে যেন চাপা দেবে অহল্যাকে।

ভয়ে শঙ্কায় অহল্যা এদিক ওদিক করে। কুতকুতে চোখ মরে যায় হেসে।

হাবুল বলে, থাম বিশাই, দেখ না আমি ওকে কি করি।

কেন এ আক্রোশ অপরিচিতার ওপর অহল্যা বোঝে না।

পাড়া প্রতিবেশী, এই যারা রোজ আনে রোজ খায় তাঁরা চাঁদা দিয়ে মরে হাবুলের নিত্য নতুন বায়নার। না দিলে গাঁট্টা। পুলিশ কেন, পুলিশের বাবা হাবুলের সিংহ সবুজ সঙ্ঘের সিম্প্যাথাইজার।

হাবুল একাও এসব খরচা চালাতে পারে। কিন্তু যাদের জন্য এসব করা তারা সহযোগিতা না করলে ক্লাব টিকবে কেন? হাবুল তো তাদের ভোটেই প্রতিনিধি হয়েছে—এবং এখন তার ঘাড়ে যাবতীয় দায়িত্ব পড়ে গেছে। হাবুলের নিজের বুদ্ধি একটু মোটা। তবে তার মন্ত্রীর অভাব নেই।

কয়েক বছর আগে বড্ড রোগা ছিল হাবুল—এখন দুধের অভাব নেই বাপের দৌলতে, আর ফলের অভাব নেই মায়ের স্নেহে। হাবুল খেয়ে-দেয়ে ইঁচড়েই বেশ দড় হয়ে উঠেছে। পাকতে আর কদিনই বা লাগবে! মা পিঙ্গলা দেবী ভাবেন, হাবুল আর কেউ নয় স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। যত তাকে ফল খাওয়ান যাবে, ততই ফল লাভ হবে ওঁদের।

এবং তা হচ্ছে।

নইলে এমন সব সুন্দর সুন্দর সিনেমা অভিনেত্রী কি তাঁর বাড়িতে পদার্পণ করে? ফাঙসন শেষ হলেও তারা যেতে চায় না। উর্বশীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায় বাগানে। যত জ্বালা হাবুলের বাবাটাকে নিয়ে। ওদের দেখলে মুখে গর্জান, কিন্তু মনের ইচ্ছা ওদের কাছে গিয়ে দেঁতো হাসি হাসতে। পিঙ্গলা দেবী বেঁচে থাকতে সেটি হচ্ছে না। তাঁর বাড়ি ঘর হাল ফ্যাসানের হলেও, কলতলায় জমাদারনীর মুড়ো ঝাঁটা আছে একখানা।

ঐ মেয়েদের একটি যদি হাবুলের বৌ হয়!

পিঙ্গলা দেবী নখে নেইল পালিস আর ঠোঁটে একটু পাতলা করে লিপষ্টিক ঘষেন, আর বসিয়ে বসিয়ে নানাকথা ভাবেন। হাবুলের বাবা কখনো কাছে এলে হানেন বঙ্কিম কটাক্ষ। লক্ষ্য না করলেই দক্ষ যজ্ঞ হয়ে যায়।

একদিন খবরের কাগজে দেখা যায় যে সিংহ সবুজ সঙ্ঘের ব্যায়ামাগারের পরিচালনায়, হাবুল দেহশ্রী উপাধি লাভ করেছে। সভাপতি ছিলেন একজন মাননীয় বিচারপতি।

সেই হাবুলই এবার চ্যালেঞ্জ করে অহল্যাকে, তুমি এখানে কি চাও?

কিছু না বাবু?—শুকনা গলায় জবাব দেয় অহল্যা।

বটে?

আমি একজন ভিখেরী মেয়ে।

বিশাইর অট্টহাসে দুপাশের দালানগুলো যেন ফেটে পড়ে।—ভিখেরীর পরণে এমন চিকন শাড়ি! তোর কি বিশ্বেস হয় হাবুল?

নো!

তবে কি বলে অনুমান হয়?

ছেলে ধরা।

নারে গবেট—মেয়ে ফুসলানি। তোদের বাড়িতে তিন চারখানা ইংরেজি কাগজ আর তুই এই সামান্য খপরটুকু জানিস নে। ছোঃ! শহরে রোজই এই সব ঘটছে।

তাই নাকি? ছুরি মেরে দেব?

দূর! কাগের ওপর কামান দাগায় কেউ?

অহল্যা ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে শোনে। সবটা অর্থ তলিয়ে বুঝতে

পাবে না। তবে তার বিরুদ্ধেই যে একটা কঠিন ষড়যন্ত্র তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

সন্ধ্যার থমথমে ছায়া পড়েছে গোরস্থানে। এ রাস্তাটাও আঁধার হয়ে আসছে। ব্লাইণ্ড লেন বলে এদিকে লোক চলাচল বিরল। পাশের বাড়িটা হাবুলদের। একটা বাগান সমেত প্রকাণ্ড চৌহদ্দি। উঁচু পাঁচিলের ওপর নানা লতা ডাইনী-চুলো হয়ে ঝুলছে। মাঝে মাঝে লাল-ফুলের গুচ্ছ। দেখলে মনে হয় একটানা গাঢ় সবুজ রঙের ওপর কে যেন নির্বিচারে রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। বার থেকে অন্দরটা সম্পূর্ণ দেখাচ্ছে না।

বিশাই প্রশ্ন করে, তুমি সধবা না বিধবা ভিখেরী মেয়ে?

অহল্যা কিছু বলে না।

পরেছ তো চিকণ ধুতি, একটা মিঠে পান খাবে? এত ঢঙ্ও জানো তোমরা। আজ পর্যন্ত ক কাহন মেয়ে বার করেছ? বড্ড ভুল করেছ পানের রসে ঠোঁট না রাঙিয়ে।

কোনো জবাব না দিয়ে অহল্যা আবারও পাশ কাটাতে যায়।

হাবুল ভাবে, এমন যারা সমাজের অকল্যাণ করে ফেরে, তাদের সঙ্গে আবার রসিকতা। একেবারে ছুরি চালিয়ে দিলেই হয়। সূক্ষ্ম করে সে কিছু রসিয়ে বুঝতে চায় না বন্ধু বিশাইর মতো।

এমন সময় পথের আলোগুলো জ্বলে ওঠে। চারদিকের অন্ধকার পরিষ্কার হয়। কেবল গোরস্থানটা দেখায় আরো গাঢ়।

অহল্যা সুমুখে পিছনে কোনো দিকে চাইতে পারে না। ওর কেমন যে হয়ে পড়ে মনটা।

বিশাই বলে, চেঁচাও যদি, এক্ষুনি গলা টিপে ধরে পুলিশে দেব।

তা হলে এখন সংজ্ঞা হারান ছাড়া পথ নেই। বিধাতা অহল্যাকে মৃত্যু দিয়ে বাঁচাও।

কয়েকটি ছেলে মেয়ে খেলতে খেলতে হাবুল ও বিশাইর পিছনে এসে দাঁড়ায়। তারা ওদের কথাবার্তা শোনে খানিক।

একটি মেয়ে বলে, ছেড়ে দিন ওকে দেহশ্রীদা।

আর একটি ডেঁপো ছেলে বলে, ছাড়বে কি ওকে—ও যে মেয়ে-ধরা।

মেয়েটি প্রতিবাদ করে, মেয়ে-ধরা না হাতী!

হাবুল দাবড়ি দেয়।—তোরা এখান থেকে পালা।

ছেলে মেয়েরা কথা কাটাকাটি করতে করতে চলে আসে। এসে মোড়ের কাছে দাঁড়ায়। ওদের কথাবার্তা শুনে ভিড় জমে।

বিশাই ঠিক অহল্যাকে মারবে না—যেন শিকার নিয়ে খেলবে কি এক পাশবিক উত্তেজনায়। সে অশ্লীল ভাবে টোকা দেয় অহল্যার গায়।

অহল্যা কেঁদে ওঠে।

তার গলা শুনে পথের লোক ভেঙে পড়ে। হৈ-চৈতে পাড়ার সব জানলার কপাট খুলে যায়। লোক জমা হয় শ দেড়েক। প্রশ্ন করে আবোল-তাবোল! বিভ্রান্তির মেঘে ঘিরে ধরে এতগুলো মানুষকে। যে পথ পথ নয়, সেই পথেই পা বাড়ায়।

উত্তেজিত জনতা ভুলে যায় বিচার বিবেচনা—ভুলে যায় যে অহল্যা স্ত্রীলোক। সকলের গা সিমসিম্ করে—কার না ঘরে রয়েছে বয়স্থা মেয়ে! যদি এমনি করে পঙ্কিল ব্যবসায় নিয়ে যায় ফুসলিয়ে। যে যা জানে সত্য মিথ্যা শ্রুত অশ্রুত উদাহরণ দেখায়। এমন অনেক ঘটনা অনেকে নাকি চোখের সামনে ঘটতে দেখেছে।

বিবেক আরো গভীরে, কার্যকারণ আরো জটিল। সে পর্যন্ত উত্তেজনার শিকড় পৌঁছাতে পারে না। দেখতে পায় না উপবাস দারিদ্র বেকারীকে একদল লোভী মুনাফা শিকারী পুঁজি করে খাটাচ্ছে। জ্ঞানের রঞ্জন রশ্মি দিয়ে ফটো তোলে না ভাঙনের। জনতা লাঠি সোটা পর্যন্ত নিয়ে আসে।

জনতা অন্ধ হলেও ওর মধ্যে সবাই অন্ধ নয়।

একটি জ্ঞান তপস্বী যুবক বেরিয়ে আসে বাসা থেকে। সে একটা প্রবন্ধ লিখছিল বর্তমান সভ্যতার গতি প্রগতি সম্বন্ধে। লম্বা দোহারা গড়ন। সে মুহূর্তে সব বুঝে নেয়। বাধা দেয় এই উন্মাদ জনতাকে।—দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ, পায়ের নিচে যে ভাঙন!—সে আরও বলে অনেক কথা।

জনতা লক্ষ্য ছেড়ে এবার উপলক্ষের ওপর মারমুখি হয়ে ওঠে।

হাবুল ও বিশাই বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে সেই জ্ঞান তপস্বী যুবক সুমুখে এগিয়ে আসে। এতক্ষণ তার কলমে যে অগ্নিশিখা লকলক করছিল, তাই তার জিভে ভাষা পায়। সমাজের সমস্ত পঙ্ক লেপে দেয় জনতার মুখে।—তোমাদের অশিক্ষা কুশিক্ষা যুক্তিহীনতাই তো দায়ী। দায়ী গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলা।

বাধা পেয়ে উত্তেজনার গতি মোড় ঘোরে। দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে পাগলের দল।

এমন সময় হাবুলের বাবা প্রবেশ করেন গলিতে। মোটর এগুবে না। তিনি নেমে পড়েন। সব কথা শোনেন কান পেতে। পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করতে তাঁর কষ্ট হয় না। তিনি মাথা হেঁট করেই এগিয়ে আসেন। থামেন একেবারে হাবুলের সুমুখে এসে।

বিবেকের কশাঘাতে হঠাৎ তাঁর মৃত মনের মাস্টার মশাই যেন অমৃত লোকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন।—তুমি আজ থেকে আমার ত্যাজ্যপুত্র—যাও, দূর হও সুমুখ থেকে।

হাবুল মাথা নুইয়ে থাকে।

এবার মনের মাস্টার মশাই মিলিয়ে গেছেন। তার বদলে জাগ্রত হয়েছেন স্নেহ ও সহানুভূতিশীল পিতা—যে পিতা দুধে জল মিশান না, শুধু দরদের সঙ্গে দুনিয়াকে দেখেন। তিনি বলেন, একি করলে তুমি? হাবুলের এ পরিণতির জন্য কি ও একাই দায়ী? একাই দোষী? মাস্টার মশাই তো ইস্কুলের পিরিয়ড কটাই দেখেন!—

হাবুলের পিতা যেন আছড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করেন, এ অবস্থায় আমি কি করব বলতো?

কিছুক্ষণ বাদে অহল্যাকে ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়। এ ইচ্ছা তারই। কিন্তু সে ঠিকানা খুঁজে পায় না। এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকে।

চার

ছুটতে ছুটতে সে আবার গ্রাম্য জীবনে চলে যায়।

আবার লোহালক্কড়ের আড়ম্বর ছাড়িয়ে কংক্রীটের সেতু পেরিয়ে সে এসে বন-বেতসের পটভূমিতে দাঁড়ায় থমকে। সে চাঁদের আলোতে চেয়ে দেখে তার কৈশোর কেটে গেছে। সে যৌবনে ডগোমগো এখন। নিটোল লতার মতো হাত দুখানা দিয়ে বুক ঢাকে লজ্জায়।

তার কৈশোরে যে সাধ পূর্ণ হয় নি, তা আজ হতে চলেছে। খেলা ঘরে যা রূপ পায় নি, বাস্তবে তা সম্ভব হতে বসেছে। আজ অহল্যার বিয়ের রাত্রি। এক্ষুনি পালকী এসে পড়বে। তাকে সাজিয়ে দিচ্ছে কজন প্রতিবেশী মেয়ে বৌ নানা আভরণ সাজসজ্জায়।

এই কটা বছরে অনেক কিছু পালটে গেছে এ দেশের। তাই বর বিয়ে করতে আসছে না কন্যার বাড়ি। কন্যাই উঠে যাচ্ছে বরের ঘরে। অহল্যা আত্ম-বিক্রয় করেছে। হ্যাঁ টাকা যখন নিতে হয়েছে তখন আত্ম-বিক্রয় বই কি? সে টাকা যে ভাবে নিক।

অহল্যাদের ভিটামাটির কথা শুনলে এর হেতু বোঝা যায়। যে মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত ছিল জঁাকজমক বাজনা বাবিয়ানার মধ্যে, সেই মেয়ে আজ কিনা উঠে যাচ্ছে মাথা নুইয়ে।

অল্প কটা বছরের মধ্যে শুধু অহল্যাদের ভদ্রাসনের চেহারা বদলায় নি—ভূগোল বদলে গেছে ও-অঞ্চলের। তার আবর্তে পড়ে কত কি যে তলিয়ে ডুবে গেছে। একটা উঁচু শিবালয় ছিল অশ্বত্থ তলায়—সেটার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একটা ঘাটলা বাঁধান রায়ান ভুঁইয়াদের দিঘী ছিল বন পলাশীর জঙ্গলে—ভাঙাচুরা পাঁচিল ছিল প্রকাণ্ড জন মানুষহীন বাড়িটার চারিদিক

ছিল, সে-সব কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। এ সব প্রাচীন কীর্তি মানুষের সংরক্ষিত বস্তুর মতো এ অঞ্চলের দেখার জিনিস ছিল, কিন্তু তার আর কোনো চিহ্ন নেই। শুধু চিহ্ন রয়েছে মহা প্লাবনের।

কোনো দিন যে গোমুখীতে বন্যা হতে পারে এদেশের লোকের তা কল্পনায় ছিল না। তাই একদিন রামকানাইকে ঠাট্টা করে বলেছিল অহল্যার বাবা, গোমুখীতে যদি বন্যা হাওয়া সম্ভব হয়, তবেই সম্ভব হবে শিবুর পাশ দেওয়া। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল মাখতে নেই রামকানাই।

সেই গোমুখীতেই একদিন বর্ষার এক মহা অশুভ লগ্নে আসে বন্যা।

আকাশে টিপ টিপে জল—কখনো বা গাড়ুর নালে ধারা। মেঘে মেঘে বিদঘুটে আঁধার। মাঝে মাঝে আলো শুধু বিদ্যুতের ঝলকা। সময় সময় ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া। ভয়ে শঙ্কায় ছেলে মার কোল ছাড়ে না। জাবর কাটতে যেন ভুলে যায় গোয়ালের গরু। দু একজন প্রসূতি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রসব করে সন্তান।

অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, থেমে থেমে যেন ক্রোধের গর্জানি। এমন শব্দ কেউ শোনেনি কখনো। তোপ দাগছে নাকি কেউ?

ওরা তো কারুর অনিষ্ট করে নি কখনো।

দু তিন জন বৃদ্ধ বলে যে এ বন্যার শব্দ। এমন আওয়াজ হয় নাকি বঙ্গোপসাগরে।

গোমুখীর কূলে কূলে রটে যায়, মহাপ্রলয় আসছে। আসছে মহাকাল। জীবন্ত মানুষগুলো বলে ও আর কিছু নয় তাঁর ডমরুর শব্দ।

বাঁধ নেই, ভেরী নেই, নৌকা নেই তেমন। তবু আর্ত মানুষগুলো বলে, সামাল, সামাল!

কি সামলাবে?

বাড়ি-ঘর, না হালের বলদ, না ছেলে মেয়ে বৌ? নিজের জীবনও তো কম মূল্যবান নয়।

শাঁখ বাজায়, মানত করে, সিন্নি মানে পাঁচ পীরের, তবু মহাকাল থামে না। শান্ত গোমুখীতে ক্রমে স্রোত বাড়ে, ঢেউ ওঠে। এবার পার ছাপিয়ে উঠবে জল। পোকা-মাকড় জংলা শ্বাপদ যাদের আশ্রয় মাটি, তারাও যেন মানুষের মত দিশা হারায়, আর্তনাদ জুড়ে দেয় ঐকতানে। মরা কান্না কাঁদে গৃহ পালিত কুক্কুরী।

বন্যার ভয়াল রূপ যে দেখেনি, তার কাছে এ কল্পনাতীত।

ঘর ছেড়ে বারবার পুরুষেরা বেরিয়ে আসে।—ওরে নদীর পাড়ে পাড়ে এক হাঁটু।

বলিস কি!

আবার গোমুখীর তীরে তীরে আওয়াজ হয়, সামাল, সামাল!

কি সামলাবে?

কারুর সালতে ভেসে গেছে খরস্রোতে। কারুর তালের ডোঙা। জিরাত জমি ভাসবে, ভেসে যাবে উঠান, ভেসে যাবে ধানের মোড়াই। গলে গলে ধ্বসে পড়বে মাটির পাঁচিল। সামলাবে কি ওরা?

কত শ্রম, কত যত্ন, কত মমতায় যে ভদ্রাসন! এক একটা গাছ, এক একখানা ঘরের আসবাব পিতা মাতার স্মৃতিতে ভরা? কে কোন গাছটা পুঁতেছে, কে কি সন্তানের জন্য রেখে গেছে, সবই মনে পড়ে। কার কোথায় ছিল সূতিকা গৃহ—এক সঙ্গে মনে আসে সমস্ত। বাইরের বন্যার মতই ঠেলে আসে স্মৃতির বান। একটা মুছে যেতে না যেতেই আসে আর একটা ঢেউ। বুকের পাঁজরে আছড়ে পড়ে। কোথায় বসে কার বিয়ে হয়েছে, আজ তা-ও মনে পড়ে। হয়ত কারুর কারুর চকিতে মনে পড়ে শুভ দৃষ্টির মধু লগ্নটি।

কেউ বা ভাবে, কত কষ্টের ঐ গোয়ালখানা। কত ধার কর্জ সুদ লাঞ্ছনার যে ইতিহাস রয়েছে ওর পিছনে! কৃষকের গরু মোষ কি এমনি এমনি হয়। এমন অনেকে আছে যে দুগ্ধবতী গাভীটির দুধ কালে ভদ্রে খেয়েছে। কিন্তু পুত্রস্নেহে পালন করছে জীবটিকে। ওটি ছেলের চেয়েও বেশি। যেদিন ঘরে এসেছে, সেদিন থেকে সংসারের একটা চরম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ওর দুধের বদলে নিত্য আসে চাল বাজার থেকে।

এ-ও যাবে। উঠানে জল উঠেছে। শান্ত গোমুখী হয়েছে শ্মশান কালী। বাঁকা স্রোত তো নয়, যেন অট্টহাসি। সঙ্গে সঙ্গে করতালি।

উঠানে জল উঠেছে।

সামাল, সামাল!

কি সামলাবে ওরা?

সকলে ঘরের বার হয়। নইলে এবার জীবন্ত ঘরে চাপা পড়ে মরতে হবে। ওরা গরু বাছুর হাঁস পায়রা মোরগ ছাগল মুক্ত করে দেয়। জীব জন্তুগুলো

অসহায় হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন প্রশ্ন—যাব কোথায়? তারপর এক একদিকে এক একটা চলে যায়।

মানুষের সাড়া পেয়ে আশ্চর্যের বিষয় দু একটা হিংস্র গো-বাঘা নামে গোয়াল থেকে। বড় মন্থর পাদক্ষেপে, যেন যেতে ইচ্ছা নেই। অমনি দু একটা ভাম।

সাধ্যমত মশাল জ্বালায় এই বিধ্বস্ত মানুষগুলো। ছেলে মেয়ে পোঁটলা-পুঁটলি তুলে নেয় কাঁধে। দু একখানা আত্মরক্ষার হাতিয়ার। ওদিয়ে জল মেপে মেপে এগুনো যাবে সময়েতে।

এ অঞ্চলে দালান নেই। সবই মেটেবাড়ি। তাই সবাই মিলে ঠিক করে রায়ানদের দেউলে গিয়ে উঠবে। অত উঁচু পর্যন্ত যদি জল ওঠে, তা হলে তো আর কোনো ভরসাই নেই। এখনো দু একটা ভাঙা ছাদ রয়েছে। একেবারে ধ্বসে যায়নি রানী মহল্লা। কিছু কিছু চওড়া উঁচু প্রাচীরও আছে। তবে কিসের বাসা হয়ে রয়েছে সে জংলা রাজত্বে কে জানে।

জল প্রায় এক কোমর।

সামাল, সামাল! এগিয়ে চলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা বোঝে স্রোতের গতির বিপরীত দিকে এগুনো যাবে না—হাতীতে হাওদা লাগালেও না। রায়ানদের দেউল উত্তরে। স্রোত নামছে দক্ষিণে। ঘর ছেড়েছে, কিন্তু পথে তিষ্ঠানও অসম্ভব। এক একটা চাপে মানুষগুলো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আবর্তের পাকে পাকে ঘুরে ভেসে চলে তৃণের মত। প্রথম আর্তনাদ, তার পর বোবা গুমরানি। শিশু বৃদ্ধ যুবতী ভেসে যায়। তলিয়ে মিলিয়ে যায় অসহায় কাৎরানি।

এর মধ্যে দু একজনে এ ধ্বংসকেও ব্যঙ্গ করে। গাছের ডালে বসে প্রাণ তুচ্ছ করে ধরে আসন্ত মানুষ। অহল্যা এবং অহল্যার মা এমনি এক জনের চেষ্টায় বেঁচে যায়। সে হচ্ছে রামকানাই। কিন্তু রামকানাইর মেয়ে পদ্মা এবং তার মার কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। তেমনি অহল্যার বাবার।

অহল্যা ও তার মাকে রামকানাই একখানা শাড়ির আঁচল দিয়ে শক্ত করে বাঁধে গাছের ডালে। ওরা কাঁদতে আরম্ভ করে। রামকানাই ধমক দেয়, চুপ। তার চেয়ে জড়িয়ে থাকো শক্ত করে গাছটা। আমি তো রয়েছি ভয় কি!

ঝড় ঝাপটা চলতে থাকে অবিরাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা হারিয়ে ফেলে অনুভবের শক্তি। ওরা যেন পুতুল হয়ে যায়।

রামকানাই ভাবে ক্রোশ পাঁচেক মাত্র লম্বা গোমুখী। তার একি রাক্ষুসী মূর্তি! ওদের সাধের ঘরবাড়ি মেয়ে বৌ ভাসিয়ে নিয়ে গেল! যাক্—যা হবার তা হয়েছে, এখন যারা রয়েছে তাদের আগলে রাখাই কাজ। রামকানাই মাঝে মাঝে অহল্যা ও তার মাকে লক্ষ্য করে। হাত দিয়ে দেখে শাড়ির গিঁট শক্ত আছে কিনা।

এক সময় একটা কচি মাথা ওর কাছে ভেসে আসে। ওর পদ্ম নাকি? ও ধরতে না পেরে গামছার গিঁটটা একটু ঢিলে করে দেয়। ওর হাতে ঠেকে চুলের নরম ডগা। আর একটু, আর একটু কাছে এলেই হয়। খরস্রোতে কচি মুখখানা যেন খালি কলসীর মত বকবক করে ওঠে। ও শোনে, বাবা বাবা। ও দেহ প্রসারিত করে দেওয়া মাত্র পুবানো গামছা ঝুঁকি সামলাতে পারে না। ও কাল্পনিক পদ্মকে ধরে বটে, কিন্তু নিজে ফেরে না।

বন্যা চলতে থাকে দুর্বার গতিতে।

তিন দিন পরের কথা। হয়ত আরো এক আধটা দিন বেশি হতে পারে। অহল্যা ও তার মার যখন সংজ্ঞা ফেরে তখন তারা এক রিলিফ ক্যাম্পে। চোখ মেলে দেখে দেবদূতের মত সব মহান সাধু সন্ন্যাসী। বন্যা রুখতে পারেননি। এসেছেন দুর্গত ত্রাণ করতে।

সকলে বলাবলি করেন, দামোদরের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগ ছিল গোমুখীর। তাই এ সর্বনাশ। যে কটা মানুষ বেঁচেছে, তা হাতে গনা যায়।

এদের পাতেও ভাত পড়ে না, পড়ে লেই এবং মণ্ড। তবু এরা কোমর ভাঙা বাঁশের মত কঁকিয়ে-কঁকিয়ে খাড়া হতে চেষ্টা করে।

এদের একদিন সযত্নে রিলিফ কাম্পের বাইরে বার করে, সাধুজীরা আর এক কেন্দ্রের দিকে রওনা হন শিবির গুটিয়ে।

বালি! বালি! শুধু বালির ঢেউ। বালির সমুদ্রে এই ভাগ্যহত মানুষগুলো পাড়ি জমায়। নিজের বাড়ি ঘর আর কেউ চিনতে পারে না। ভূগোল উলটে গেছে এই শস্যশ্যামা দেশটার। এখন যেন হয়েছে মরুভূমি। ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর চেয়ে থাকা যায় এ শ্মশানের দিকে!

ওটা ধীরে ধীরে এদিক ওদিক হারিয়ে যায়।

অহল্যা এবং তার মা এসে আশ্রয় নেয় এক আত্মীয় বাড়ি। তারাও খুব গরিব। তবে মনটা তাদের বড়।—আহা, এসো এসো। এমন সব্বনাশও হয়। মহাজনের খপর কি?

—ওদের চোখগুলো যেন কেমন করে ওঠে। জল আসেনি—ওদের মা মেয়ের হাতের মোটা রুলি কগাছার দিকে নজর পড়েছে। এতগুলো সোনা এমন ভাঙ্গা-চোরা মানুষ দুটোর হাতে!

আত্মীয়রা একরকম পাদ্য অর্ঘ্য দিয়েই ওদের ঘরে তোলে। অশৌচ পালন শ্রাদ্ধ শান্তি করবার কথা ওঠে না। অহল্যার বাবা হয়ত এখনো ফিরলে ফিরতে পারে। আশপাশের সাত গাঁয়ের লোক চিনত অহল্যার বাবাকে। খবর জেনে তারা ভেঙে আসে। সহানুভূতির থেকে দারুণ কৌতূহল। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ যায় না। দিবা রাত্র লোক সমাগম। এদের আপ্যায়ন করা সে এক পর্ব। কাজ কর্মে ক্ষতি করেও একজন পুরুষ মানুষকে বাড়ি থাকতে হয়। নইলে এটা ওটা চুরি যায় এখান-সেখান থেকে। সেদিন কারা যেন কুড়ি চারেক লেবু চুরি করেছে—একেবারে কচি। এই ঠেলায় পোক্ত কাঁঠাল কটিও না যায়!

সকলেই অবাক হয়ে দেখে, এত বড় গৃহস্থের মেয়ে বৌর ঐশ্বর্য ও অদৃষ্টের ঠাট ভাঙলে কতখানি ফাটল ধরে চেহারায়।

একদিন একটি অবুঝ মেয়ে প্রশ্ন করে অদ্ভুত।—তুই কি বললি মা?

কেন কি বলনু তোকে?

কপাল ভেইঙেছে নাকি অহল্যার মার? কই দিব্যি তো রইয়েছে, আমাদের মতন।

মা একটু করুণ হাসি হেসে বলে, তুই চুপ যা, চুপ যা—বুঝবিনি এখন।

মেয়েটা তবু কপালের দিকে চেয়ে থাকে অহল্যার মার। ওর মা রেগে চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়।

একদিন এ পর্বও শেষ হয়। আসে ভাত কাপড়ের প্রশ্ন। ধার কর্জা করে তো আর চালান যায় না। কি বিহিত করা যাবে এখন?

বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই আলোচনায় বসে। এদেশে যাদের জমি ক্ষেত নেই, তাদের প্রশস্ত পথই হচ্ছে গাঁয়ের হাট-বাজার থেকে কিছু শাক সব্জী কিনে

নিয়ে শহরে বেচা। এমন অনেকেই করছে। এ বাড়ির সবাই। এমন যে নতুন বৌটা সে পর্যন্ত যায় যায় না।

কিন্তু বিনোদিনী ও অহল্যা কি তা পারবে?

অহল্যা বলে, মা কেন যাবে, আমি যাব।

নিকুঞ্জ বলে, কোনো ভয় নেই, আমার বৌটা তো ছেলে কাঁকে নিয়ে রোজ যায়. গড়্ গড়্ কইরে, তুমিও যাবা। টিকিট বাবু, ইষ্টিসন মাস্টার, গাড্ সাহেব —কাকে কি দিতি হয় ও সব জানে। একটু ভব্য-সভ্য হয়ে চলবা। কিন্তু আমার ট্যাকা?

অহল্যার মা প্রশ্ন করে, কত নাগিবে?

এই বিশ-তিশ।

ওরা মা মেয়ে একটা রাত পরামর্শ করে।

মা বলে, তোর সোমত্ত বয়েস তুই থাক অহল্যা, আমি যাব নিকুঞ্জের বৌর সাথে।

অহল্যা গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, সে হয় না মা। তোমার শরীলে ও খাটুনি সইবেনি। অত বড় একটা চ্যাঙারি মাথায় করে ধাওয়া। সময় মত জলফোঁটা খাওয়ার জো নেই। তুমি পারবেনি। হাজার হলেও অভ্যেস চাই।

তোর বুদ্ধি আছে? জীবনে কখনও ছুটোটিও দুভাগ করে দেখিসনি, তুই চাইছিস চ্যাঙারি মাথায় করে শহরে বন্দরে ছুটতে! সে হবেনি, আমি যাব।

তুমি কোন গেরস্থের বৌ সে কথা ভুলে যেওনি। পথে নামলেই মানুষ দাঁত বার করে হাসবে। আমার গায়, দেবে থুথু। এত বড় মেয়ে থাকতে কিনা মাকে পাঠাচ্ছে রোজগারে।

আর সোমত্ত মেয়েকে পাঠালে বুঝি লোকে আমায় রেহাই দেবে? তোকে আমার বে থা দিতে হবে, অমন ছোটনোকের মত খাটলে দুদিনেই গালের হাড় ঠেলে উঠবে নিকুঞ্জের বৌর মত। ট্যাকা পয়সা জায়গা জমি সব গেছে, এখন যেটুকু আছে রূপ। সেটুকু গেলে তো একেবারে ফকির।

অহল্যা মার মুখ চেপে ধরে।—ছিঃ ছিঃ ছোটনোক বলছ মা কাদেরকে? যারা আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দিলে, তারা হল ছোট? ও কথা মুখে

এনোনি। দায় ঠেকলে সব্বাই অমনি খাটে। নিকুঞ্জের বৌ তো যায় ছেলে কাঁখে করে, রাঁধা সেবার নাকি রেল গাড়ির ভিড়ে বিয়োলে।

বলিস কি! এমন আহাম্মক পোয়াতির কথা তো কক্ষনো শুনিনি। একটু বুঝে-সুঝে বেরুতে হয়। তারপর কি হল রাধার?

— কি আর হবে! একজন ডাবওয়ালা নাড়ী কেটে দিলে দা দিয়ে। হিসেব করে তো বাবা অনেক কিছু করেছিল, কিন্তু আমাদেরও তো বেরুতে হবে। দায় ঠেকলে সব্বাই ছোটনোক হয়।

তা ঠিক, বলে বিনোদিনী। কিন্তু মনে মনে কিছুতেই স্বীকার করতে পারেনা রাধার বেহায়াপনা। ইস্, একপাল মানুষের মধ্যে কি কেলেঙ্কারী!

অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হয় অহল্যাই প্রথম যাবে। যদি একান্ত তার চেহারা বিগড়ায়, ক্ষয়ে যায় রূপ, তখন না হয় দেখা যাবে।

কিন্তু টাকা?

মা বলে, এবার আর তোর কথা শুনব নি অহল্যা। আমি ডান হাতের রুলি গাছা খুলে দেব কাল সকালে।

না মা তা পারবেনি—এখানেও অহল্যা বাধা দেয়। উহুঁ তা হয় না।

কেনে? তুই বড্ড জেদি মেয়ে! এবার আর তোর কথা শুনছি নি।

না শুনলে যে বাবার অকল্যেণ হবে? তুমি হাত থেকে কিছু খুলতে পারবে নি।

বিনোদিনী একেবারে চুপ হয়ে যায়। তার মুখে আর কোনো যুক্তি জোগায় না। একান্ত অবিশ্বাস্য হলেও একটু আশার রোশনাই তার আঁধার মনে ঝিলিক দিয়ে যায়।

রাত কম হয়নি। বাড়ি ওপর সবাই ঘুমিয়েছে। ওরা মা মেয়েতেও ঘুমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বিনোদিনীর মনে পড়ে সর্বধ্বংসী বন্যার কথা। কোথায় তাদের ক্ষেত-খামার গোলা? কোথায়ই বা গরু-বাছুর? কোথায়ই বা অহল্যার বাবা? এত খেটে যে এসব করল, সে গেল কিনা ভেসে!

আর ভেসে গেল রামকানাই—যে প্রাণে বাঁচাল ওদের। কত ঝগড়া তর্ক দাদন-মজুরী ধার-কর্জ নিয়ে, কিন্তু বিপদের সময় রামকানাইর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আশ্চর্য মানুষ ছিল এই রামকানাই! এমন মানুষ বুঝি আর

পৃথিবীতে জন্মাবে না। ক্ষণিকের জন্য স্বামীর চাইতেও যেন মহৎ বলে মনে হয় রামকানাইকে।

তারপর আবার বন্যা, আবার বালি।...

ভাবতে ভাবতে হাঁপিয়ে ওঠে বিনোদিনী। সে ডাকে, অহল্যা!

এতক্ষণে অহল্যার ঘুমান উচিত ছিল, কিন্তু সেও ঘুমাতে পারেনি। বলে, কেন মা?

অহল্যাও সুরু করেছিল বন্যা থেকে ভাবতে। কখন সে যেন তার অজ্ঞাতে বন্যাকে ছাড়িয়ে তার কিশোর জীবনের বন্ধুর কাছে চলে গিয়েছিল। পদ্ম নয়, তার ভাই শিবুর কাছে। খেলার স্বামী। অহল্যা ঘর বেঁধে ঘরনী হতে চেয়েছিল তার। সে সাধ তার মেটেনি তখন। আজ শিবু কোথায়? বন্যার সময় সে দেশে ছিল না। এমনিতেই সে গাঁয়ে আসত কম। সে নিশ্চয় মামাবাড়ি আছে। গাড়ি ঘোড়ায় না চড়লেও বড় হয়েছে। কত বড়টি হয়েছে তা দেখতে ইচ্ছা করে অহল্যার। ওদের সঙ্গে ঠিক প্রীতির যোগ সূত্র ছিল না শিবুদের। যা কিছু ছিল দেনা পাওনার টান। তবু এক গাঁয়ের মানুষ তো! তাকে দেখতে চাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

না, না—শুধু এক গাঁয়ের নয় শিবু, এক বয়সের। বাড়লে ওর মতই সে বেড়েছে। হয়ত রেখা পড়েছে গোঁফের। হাত পা হয়েছে শক্ত। বুকটা চওড়া। চোখের চাহনিতে এসেছে যৌবনের চমক। বড় ভাল মানুষ ছিল শিবু। এখনো কি তেমনি আছে? মাঝে কবার বাড়ি এসেছে, কিন্তু অহল্যার সঙ্গে দেখা হয়নি। অহল্যাই সুমুখে আসে নি।

যদি খপ করে হাত ধরে টান দেয়! বলে, ঘর বাঁধতে চ অহল্যানদীর পার!

কি জবাব দেবে অহল্যা? সে তো বড় হয়েছে অনেক। স্বপ্ন বলো, সাধ বলো, সে তো অহল্যারই। শিবু শুধু পূর্ণ করে যাবে। অহল্যা আপত্তি করবে কোন অজুহাতে? তাই সে দূরে রয়েছে।

সেই শিবুকে দেখার জন্যই কামনা তীব্র হয়ে ওঠে আজ অহল্যার।

বিনোদিনী বলে, তুই কি পারবি অহল্যা?

তুমি অত ভেবনি, খুব পারব।

দুধের সর পুরু না হলে খেতে চাসনি—

ও সব মায়া কান্না তুমি এখন রাখো তো মা। আমার শুনতি ভাল লাগেনি।

ঘুমিয়ে পড়ে। সকাল বেলা উঠে অহল্যা তার হাতের এক গাছা রুলি খুলে দেয়।

নিকুঞ্জ বলে, এতে আর কটাকা হবে? সব তো চাঁচ বোম্বাই।

শ ট্যাকার কম হবেনি। তোমরা তো ওসব কখনো ব্যবহার করে দেখনি। ও রূপ নয়, সোজা।

—অহল্যা জবাব দেয়, মা তুমি এখনো কথা বলতে শেখোনি। আমায় বলতে দাও। শোনো নিকুঞ্জদা চাঁচ বোম্বাই তো বটেই। কিন্তু চাঁচ গালিয়ে যা হবে, সে কম নয়। তুমি হামেশা কেনা বেচা করো, স্যাকরার দোকানে গেলেই টের পাবে। আমার তরে একখানা শাড়ি এনো।—একটু ফিক করে হাসে অহল্যা।

নিকুঞ্জের মনটা বিনোদিনীর কথায় যতখানি ভেঙেছিল, তা ... চরের মত ভরে যায়।—শ ট্যাকা হলে ভাল। আমি কি আর তোমাদের ঠকাব?

নিকুঞ্জের বৌ স্বামীকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, দিয়েছে?

হ্যাঁ।

নিকুঞ্জের দাদা বলে, ওরা কেউ সাথে যেতে চাইলে নাকি গয়না গালাবার সময়?

না।

ভাল খপর। গাও মরলেও তার সোঁত মরে না—।

বাড়ির আরো দু চার জন আত্মীয় সোনা না পরলেও যারা সোনার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন, তারা নিকুঞ্জর বৌ ও দাদার মত প্রশ্ন করে। নিকুঞ্জ খেতে বসলে সবাই মিলে একটা ফর্দ করে আবডালে বসে। যে যার প্রয়োজনের কথা তোলে। শাড়ি গামছা জামা ইত্যাদি। অবশেষে তা নিকুঞ্জের বৌর হাত দিয়ে যথাস্থানে পেশ করে।

নিকুঞ্জ বলে, আমি আর যা করি, ধম্ম খোয়াতে নারাজ।

বৌ জবাব দেয়, ওরে আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে!

পাঁচ

কালিঘাট পৌঁছে অহল্যার আব্বুর মনে হয় সবগুলো রাস্তাই যেন এক। এটায়ও যেমন পুঁতুল-কড়াই-গামলা-চুড়ি সাজান, ওটায়ও তাই। আলো এক রকম—লোকজনের চলাচলতি এ রকম। গাড়ি ঘোড়া মোটরের শব্দেও কোনো প্রভেদ নেই।

শুধু তার মত উড়ু উড়ু মন কারুর নেই। সকলেরই একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য রয়েছে, রয়েছে ঠিক-ঠিকানার আস্তানা। অহল্যার তা কিছু নেই।

কোনো রকমে তার জাতি কুল বেঁচেছে! সাক্ষাৎ যমের হাতে পড়েছিল সে। উঃ কি ষণ্ডামার্কা ছেলে দুটো? ওর সম্বন্ধে যা তা মন্তব্য করতে একটু সংকোচ করল না? থাকতে পারে ওদের বড় বাড়ি, মোটর, ধোপ খাওয়ান কাপড় জামা—কিন্তু অহল্যাদেরও কম ছিল না। ধানের গোলা শস্য ভরা ক্ষেতের সঙ্গে ওদের ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। ওদের ওপরটা কত ফিটফাট কিন্তু ভিতরটা কি নোংরা! তবে হাবুলের বাবার ব্যবহারটুকু ভুলতে পারে না অহল্যা। ভদ্র লোকের সত্যি বিচার বুদ্ধি আছে।

ঘুরতে ঘুরতে রাত বাড়ে।

তার সঙ্গের সামান্য যা কিছু জিনিসপত্র তা সঙ্গীদের জিম্বায়। খোঁজ না পেলে এবার সে সত্যিকারের সর্বহারাই হবে। একটুকরা চট, ছেঁড়া নেকড়া দুখানা ফুটো ফাটা বাসন, এ শহরে যে কত দুর্লভ! কত হোটেল রেঁস্তোরা চায়ের দোকান আছে, এখন যে তার পেট পুড়ে যাচ্ছে—কেউ কি ডেকে জিজ্ঞাসা করবে?

অহল্যা মা-কালী বাড়ির আশ-পাশ দিয়ে কেবল্ল ঘোরে। যে পথটা সে একবার ছাড়িয়ে আসে আবার সেই পথে এসে পড়ে খানিক বাদে।

ফুলদি লোকটি বোধ হয় মন্দ ছিলেন না? ওখান থেকে অহল্যা পালিয়ে এসে ভুল করেছে। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন, তা শুনে আসাই উচিত ছিল। অহল্যার কাছে তিনি আর কিছু চাইতেন না, বরং তিনিই কিছু দিতেন। তাঁকে উপেক্ষা করে অহল্যার এখন একূল ওকূল, দুকূল মজল।

তেমন একটা বড়লোক নন ফুলদি। তবু তাঁর একটা দরদী মন আছে। সে মনের পরিচয় অহল্যার সর্বাঙ্গে যেন এখনো জড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণ এ ভাবে তার হাঁটাই দায় হত। কাপড় ছিঁড়েছে কি আজ দু একদিন!

শুধু সে ঐ চশমা জোড়ার ভয় পালিয়ে এসেছে। ফুলদি থাকতে তাকে আর গিলে খেতে পারত না। অহল্যা ভয়ানক কাঁচা বুদ্ধির কাজ করেছে।

পরিশ্রান্ত হয়ে অহল্যা একটা ময়রার দোকানের সুমুখে ফুটপাতে বসে পড়ে। তার গলা শুকিয়ে গেছে। একটু জল চাই। কিছু কিনে না খেলে তো এমনি জল পাওয়া যাবে না। কিন্তু পয়সা যে নেই। সে দু একজনের কাছে হাত পাতে। কাজ হয় না।

একজন যেন ইচ্ছা করেই একটা উচ্ছিষ্ট ঠোঙ্গা তার গায় ফেলে দেয়।—আহা দেখিনি!—বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে একটু যেন হাসে।

অহল্যা বলে, তুমি বাবু যেন জন্ম জন্ম এমনি অন্ধ হয়েই থাকো।—অহল্যার কণ্ঠে উত্তাপ নেই—কিন্তু দাহের তীব্রতা ঠিকই আছে।

লোকটার রঙ কালো। তার মুখটা শুকিয়ে যায়। অহল্যা দেখে যেন পুড়ে গেছে।

এও তার ভাল লাগে না। সে পিপাসায় অধীর হয়ে ঘোরে। আরো দু এক জায়গায় চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারে না। এমনি কাটে ঘণ্টাখানেক।

এবার অহল্যা গঙ্গার পারের দিকে এগিয়ে যায়—পাথরের পথ ভেঙে চলে। ভরা গাঙে ডুবে মরলে কেমন হয়? কে টের পাবে, কে জানবে? এ যন্ত্রণা আর তো সয় না।

অনির্দিষ্ট রুজি-রোজগার, অনির্দিষ্ট বাসস্থান, মান মর্যাদা ঠুনকো পেয়ালার মত—এ ভাবে কত কাল নিজেকে টানা যায়? এত যে শহরের জাঁক জমক, এত যে চোখ ঝলসান আলো; সবই অহল্যার কাছে কি আলেয়া নয়? ধরতে যাও নিবে যাবে। ছুঁতে যাও ঘৃণায় সরে দাঁড়াবে। আত্মহত্যা মহাপাপ,

কিন্তু আত্মনিগ্রহেই বা কি পুণ্য? অহল্যা সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে নামে এবং মনে মনে তর্ক করে চলে।

একখানা মুখ মনে পড়ে অহল্যার—যে মুখখানা এখন সর্ব বিষয়ে তার ওপর নির্ভরশীল। সেই জন্যই তার বাঁচা উচিত। যখন সে মানুষ হয়ে জন্মেছে, এ দায়িত্ব সে কি করে ত্যাগ করবে?

কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে হলে, অপমান উপবাসের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে—আত্মহত্যাই শ্রেয়। এ ছাড়া আর অন্য পথ খোলা নেই। সে একটু থামে।

জল তো নয় জননী। নিশ্চয় আশ্রয় দেবে কোলে। শীতল হয়ে যাবে তার সব জ্বালা। কিন্তু নিশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে আসবে, তখনকার অবস্থা কি ভেবে দেখেছে অহল্যা? তিলে তিলে নিজের পরমায়ুকে বলি দেওয়ার মুহূর্তগুলো? যদি কষ্ট সয়ে মরতে না পারে? যদি তার মনের বল এমনি মাঝ পথে ভেঙে যায়? তারপর সহস্র চোখের প্রশ্ন। অজস্র শারীরিক লাঞ্ছনা। উঃ অহল্যার কাছে মুক্তির শেষ দুয়ার খানাও যেন বন্ধ।

তাকে রাবনের চিতায় জ্বলতে হবে। কতকাল যে এ দাহন রয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। কতকাল যে তার এ পোড়া পরমায়ু তা সে জানে না।

আরো দুটো ধাপ নামে অহল্যা। এ নিষ্ঠুর আত্ম নিগ্রহ সে কিছুতেই আর সইতে পারবে না। আরো গোটা তিনেক সিঁড়ি সে ছাড়ায়।

গঙ্গায় ডুবে মরা তো দূরের কথা, একটু পানীয় জলও নেই। যেটুকু আছে পাঁক ও দুর্গন্ধ।

অহল্যা সিঁড়ি বেয়ে ওপরের-দিকে ওঠে।

একটি বছর পনরর মেয়ে বলে, কি গো লীলাবতী? গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলে নাকি? এই সাঁঝ রাতেই খদ্দের জুটেছে?

অর্থটা খুব ভাল ভাবে হৃদয়ংগম হয় না অহল্যার। সে মুখ ফিরিয়ে দেখে যে একটা খাবারের ঠোঙা নিয়ে মেয়েটা বসে বসে রসিয়ে রসিয়ে চিবুচ্ছে। এখানে গ্যাসের আলোটা অস্বচ্ছ। ওকে একটা হাসিমুখো পেত্নীর মত দেখায়।

কিরে পটল, আর সবাই কোথা?

যে চুলোয়ই থাক—খাবি নাকি দুটো গরম গরম কচুরি?

অহল্যার ঘৃণা হয় প্রথম।—না, কার না কার মুখের!

ওরে আমার রাজরানী মরে যাবি নি।

অহল্যা হাত বাড়ায়।—এ যে সত্যি গরম গরম! কে দিলে এতগুলো?—সে ছুটো মুখে পুরে দেয়। তেলে ভাজা কচুরি হলেও চমৎকার।

অহল্যা পটলের পাশে বসে। দুজনে পেট ভরে খায়। পটল নিজের ভাগের এক আধখানা ঠেলে দেয় অহল্যার ভাগে।—খা, খেয়ে ফেল। ও বাড়িতে বুঝি কিছু জোটেনি? এতক্ষণ তবে করলি কি? কোথায় ছিলি?—ভাবলাম গঙ্গায় যখন চান করতে এয়েছিস তখন একটা কিছু পুন্নির ফল জুটেছে?

এসব কথায় অহল্যা কোনো জবাব দেয় না। অল্প দিন হয় সে শহরে এসেছে এখন পর্যন্ত এ সমস্ত ইঙ্গিতময় কথার সে অর্থ বুঝতে শেখেনি। শুধু আবছা আবছা যা বোঝে, তা ওর কাছে অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হয়।

ওরা দুজনে উঠে ঘোড়ার জন্য সংরক্ষিত টব থেকে আঁজল ভরে জল খায়।—আঃ!—হাঁরে তোকে কে দিলে এতগুলো গরম খাবার?

পটল বলতে চায় না।

অহল্যার মনে একটা উগ্র কৌতূহল জমে ওঠে। সে বারবার পটলের কাছে জিজ্ঞাসা করে।

পটল বলে, চ মরাগুলোর খোঁজ করি।

অহল্যা বলে, তাই চ।—কিন্তু ওর মনে প্রশ্ন জেগে থাকে।

রাত কম হয়নি। চারপাশের রাস্তার কলকোলাহল অনেকটা নীরব হয়েছে। দোকানে পসারে এখন আর তেমন ভিড় নেই। দু একজন ইতিমধ্যে মাল পত্র গুছিয়েছে। কেউ কেউ তালা মেরে শেষ করেছে আজকার বেচাকেনা।

তুই তো ওদের সাথে এয়েছিস, দল ছাড়া হলি কি করে?

সেও ঐ খাবারের ঠোঙার সঙ্গে জড়ান রহস্য। পটল বলতে চায় না।

আচ্ছা আমাদের বিছানা পত্তরগুলো যেখানে রেখে এয়েছি, সে জায়গাটা কোথা?

চিনতে পারছিস নি?

না।

আমি দেখে এসেছি, কেউ সেথা নেই।

চ আমি একবারটি যাব। ওগুলো হারালে কেমন হবে ভাই? কেউ কি চুরি করে নে গেল?

চোরের চোখে আর ঘুম নেই—রাজরানীর অহঙ্কার নিয়ে পালাবে!—পটল হাসে। মাথার কাপড়টা সরে যায়। একরাশ রুক্ষ চুল বেরিয়ে পড়ে। কখনো কখনো আঁচলটা বক্ষচ্যুত হয়ে লোটায়। ছ্একটা লোক গাছের তলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সজোরে বিড়ি টানে।

অহল্যার কাছে কদর্য ঠেকে। সে ইঙ্গিতে ওকে সাবধান হতে বলে।—ওকি?

পটল সাবধান হয়। আবার তার আঁচল খসে পড়ে।

অহল্যা ঠেলা দেয় সজোরে।

পটল বলে, যেতে চাইছিস চ, কিন্তু কেউ সেথা নেই।

তা হলে কি জিনিসপত্তরগুলো পাব না?

পাবি লো অত অস্থির হস নি।

ওরা দুজনে এগিয়ে চলে। অহল্যা গন্তব্যের জন্য যত উন্মুখ, পটল তা যেন নয়। সে রাস্তার দুধারে তাকায়। যেখানে একটু সামান্য গলি-ঘুচি গাছপালার আবডাল সেইখানে যেন তার দৃষ্টি। সে একটা গান ধরে—

সাঁজ বাতি জ্বেলেছি বঁধূ
তুমি এসো না!···

পটলেরও তো যথা সর্বস্ব অহল্যার মত বিপন্ন—কে নিয়ে সরে পড়েছে ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু ও গান গায় কি করে? কিছুই বুঝে উঠতে পারে না অহল্যা। হাসছেও তো পটল বেশ নিশ্চিন্ত মনে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পটল।

ওকি তুই দাঁড়ালি যে?

এমনি।—বলেই পটল অহল্যার মুখের দিকে তাকায়। অহল্যা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে। ওর সরল মুখখানার দিকে চেয়ে পটলের সহানুভূতি জন্মে। একটু হেসে পটল বলে, চল। তুই আবার দাঁড়ালি কেনে?—পটল ভাবে ও এমন আনকোড়া যে ওর সঙ্গে ঠাট্টা ফাজলামি করাও ফ্যাসাদ। না বুঝে হয়ত ভয়ে এক সময় কেঁদে ফেলবে।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করে দুজনে। একটা বড় গাছ তলায় এসে পৌছায়। বেশ শান বাঁধান খানিকটা। হয়ত কোনো ঘর দুয়ার ছিল—এখন শুধু চিহ্ন আছে। ইমপ্রুভমেণ্ট কিম্বা অমনি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দৌলতে ইস্তক বিস্তি কাবার। বস্তি ছিল—দালান উঠবে কিছুকাল বাদে। মাঝের দিনগুলোর

জন্ম নো-ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ড হিসাবে পড়ে রয়েছে। কিন্তু ট্রেস্‌পাসারের অভাব নেই। নিত্যু ছেঁড়া খোঁড়া মানুষ আসছে। অহল্যাদের দল তাদেরই একটি। এরা বনেদী নয় চাকুরেজীবীও নয়—নানা স্থানের যেন পচা জংপরা জীবন্ত রাবিশ।

দূর থেকে যেটুকু আলো এসে পড়েছে, তার সাহায্যে খুব ভাল না দেখা গেলেও অহল্যা খোঁজ করে। তার জিনিসপত্র তো দূরের কথা পরিচিত একটি মুখও দেখে না। একদল অপরিচিত তাদের স্থান দখল করে নাক ডাকাচ্ছে।

রাত প্রায় দুপুর। এখন পথে আর মানুষজন নেই বললেই চলে। কয়েকটা কুকুর এদিক ওদিক করে ছুটে বেড়াচ্ছে। দু একটা বেওয়ারিশ গরু।

সুকুমারী, খুশী!

অহল্যার ডাকে কেউ জবাব দেয় না। বরঞ্চ দু একজন বিরক্ত হয়, আঃ চিল্লা চিল্লি করছ কেনে? ধীরে সুস্থে খোঁজ লিয়ে দেখ।

আবার ডাকে অহল্যা।

ওরা মরেনি বাপু! একটু চোখ বুঁঝতে দাও।

অহল্যার সন্দেহ হয়—জায়গাটা তো ভুল করে নি? সে ভাল করে চেয়ে দেখে। না—ঐ তো সেই গাছটা। অহল্যা আশ্বস্ত হয় একটু। বাড়ি ঘর সব গেছে—গেছে পিতা মাতা স্বামীর পরিচয়। এখন থাকার মধ্যে আছে ঐ গাছটা। সেটাও যদি হারিয়ে যায়!

ইতিমধ্যেই গাছটার প্রতি একটা মমতা জন্মেছে, শানখানার জন্যও যেন টান হয়েছে অহল্যার। এই তো ওর বাঁচা মরা খোঁজ-নিখোঁজের ঠিকানা! এগুলোর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে আর যেন উপায় নেই। অথচ এর কতটুকু ভগ্নাংশই বা ওর দখলে!

একটা ঠং করে শব্দ হয় শানের ওপর।

টাকা পড়ল নাকি রে পটল?—অহল্যা প্রশ্ন করে।

নিশ্চয় ট্যাকা।—আর একজন কান খাড়া করে।

হ্যাঁ ট্যাকা ছাড়া কি! আমি দেখেছি গড়িয়ে যেতে।

যারা শুয়ে ছিল, তারা সবাই জেগে বসে। হুলুস্থুল পড়ে যায় চারদিকে। খোঁজ খোঁজ। এদিক ওদিক—চারপাশ।

টাকা কে দিলে ?

দেবে আবার কে—আমি কামাই করেছি।

কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। এক আনা দু আনা হলে সম্ভব ছিল—এ গোটা একটা টাকা, চৌষট্টিটা পয়সা। নিশ্চয় ও চুরি করেছে, এমন মন্তব্যও করে দু এক জন।

খুঁজতে খুঁজতে যেটা পাওয়া যায়, সেটা একটা আধুলি।

এবার অহল্যা শোনে সকলে বলাবলি করে, আমরা বলিনি যে ওটা ট্যাকা হতে পারে না—কিছুতেই না। ও মাগীকে কে দেবে একটা গোটা ট্যাকা ?

আধুলি হলেও কম নয়—অনেকক্ষণ ধরে ঘুম হয় না সকলের। *

প্রথম খাবার, তারপর এই মিশ্রধাতু মুদ্রা—ভিতরে ভিতরে অহল্যাকেও বেশ একটু চঞ্চল করে। কোথা থেকে পটল এ সব সংগ্রহ করল ? দিল কে ? অহল্যা কিছুতেই ভুলতে পারে না আধুলিটার শব্দ।

পটল সহসা চকিতা হয়ে ওঠে। কে যেন শিষ টানছে—সঙ্কেতময় ধ্বনি।

একটু বস অহল্যা আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। তুই কোথাও যাবি নি। তারপর ওদের এক সাথে চুরতে যাব।

একা একা আমার ভাল লাগে না। আমি তোর সাথে যাব।

মরতে ?—একটু ফিক করে হেসেই পটল চলে যায়।—ভয় নেই বেশি দেরি হবে নি।—কোন দিক দিয়ে কোন দিকে যে পটল অদৃশ্য হয় ঠিক ধরতে পারে না অহল্যা। সে চুপ করে বসে থাকে।

কি যেন ঠিক-ঠাক করে পটল অল্প সময় বাদেই ফিরে আসে।

এর মধ্যেই কাজ হল ?

নারে হলনি।

কেনে ?

ভদ্দরলোকের মজলিশ, একটু পান সিগ্রেট ফুট ফরমশ জোগাতে হবে। এ নোংরা কাপড়ে হবে না। একটু ফিটফাট চাই। তোর এই কাপড়খানা একটু ধার দিবি ? একটা ট্যাকা পাবি ? সত্যি বলছি ফিরে এসে দেবে—মাইরি, মাথার দিব্যি।

এতগুলো প্রতিজ্ঞা করার যে কি কারণ থাকতে পারে অহল্যা তা বোঝে না। সে বলে, টাকা না দিলেই বা কি।

ওরা শাড়ি বদল করে একটু আবডালে গিয়ে।

যখন তোর শাড়ি পরে কামাব তখন তোকে ঠকাব কেন? সত্যি তুই একটা ট্যাকা পাবি।

তবে দিস্।

পটল কিছু দূর এগিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢোকে। একটা ছোকরা এসে তার হাত ধরে।—কিরে এ শাড়িখানা পেলি কি করে? মেয়েটা দিলে?

ট্যাকা হলে বাঘের চোখ মেলে।

বল যে বাঘ নয়, বাঘিনী। একদিন নিয়ে আসতে পারিস খাঁচায় পুরে?

কামড়ে দেবে।

দিক—তাতে তোর কি?

পটলের স্বার্থ আছে। নিজের শিকার সে অন্যের মুখে তুলে দিতে চায় না। আরো একটা জিনিস সে চায় না—অহল্যার মহত্বটা চট্ করে ধুলায় টেনে নামাতে। সে সত্য ঘর সংসার ছেড়ে এসেছে, আবার ফিরে যেতে পারে। তেমন আশা অহল্যার রয়েচে। পটলের সেখানে কুড়ুল মারার লিপ্সা নেই।

পটল ভাগ্যহীনা। এই শহরের ফুটপাথেই নাকি জন্মেছে। ওর ঘর সংসার স্বামীর ঐতিহ্য নেই, ওর ফেরা-না-ফেবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বরং ওযে এখানেই একদিন মরবে তা প্রায় অবধার্য। তাই অহল্যাকে চায় একটু দূরে ঠেলে রাখতে। যে এড়িয়ে যেতে পারে যাক। আগুনে জলছে বলে আর একজনকে টেনে এনে সঙ্গী করে লাভ নেই।

ওরা হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারে ডুবে যায়।

অহল্যা বসে বসে অপেক্ষা করে পটলের পথ চেয়ে।

ফর্সা শাড়িখানা পরার পর বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছিল পটলকে। এমনি ওর গড়নটাও মন্দ নয়। রঙ কালো। তবু আলো করেছে যেন ধবধবে শাদা কাপড়খানায়।

অহল্যা চলতে থাকে।

ছয়

ঢুলতে ঢুলতে অহল্যা আবার তার উদ্বাস্তু জীবনে এসে পড়ে। আছে পরের আশ্রয়ে মা মেয়ে কোণঠাশা হয়ে।

নিকুঞ্জ গয়না নিয়ে সেই যে বেরিয়েছে, ফিরছে না—রাত হয়েছে অনেক।

বাড়ির সবাই সন্ধ্যা হলে ভাবে এক্ষুনি ওরা দেখবে যে ওদের যাবতীয় ফরমাশ নিয়ে হাজির হয়েছে নিকুঞ্জ। মুখে ও যত ধর্মের ভান করুক বাপ-মা বৌ ছেলের কি কাপড় জামা, না এনে পারবে? তা হলে অন্যায় সকলের জন্যও কিছু না কিছু আনতে হবে। করলে কি হয় ফল পাকুড়ের ব্যবসা, ও লোক মন্দ নয়। ওর চক্ষুলজ্জা আছে।

দেখ তো কে আসে ঘরের পাশ দিয়ে?—নিকুঞ্জের বাপ চোখে কম দেখে, বলে, এগিয়ে বোঝাটা ধর পিন্টু।

দাদা নয়।

তবে কে আসে এত রাত্তিরে? চোর নাকি?

না—

গজেন মণ্ডল, প্রেসিডিং। আসছে না—যাচ্ছে ঘরের পাশ দিয়ে।

বুড়ো লাফিয়ে ওঠে—হারামজাদা আগে বলতি হয়। দু কিস্তির ট্যাক্সো বাকি। ডেকে নিয়ে আয় এখানে তামুক সাজ।—

একটা আলো নিয়ে পিন্টু বার হওয়ার আগে গজেন মণ্ডল চলে যায়। তার মাথায় দেশ সেবার নানা চিন্তা পঞ্চাইত্‌ রাজ, কুটির শিল্প, ইলেকসন। সে কি পারে এখন এখানে বসে তামাক খেতে? নিকুঞ্জের বাবা কেন তার নিজের বাবা হলেও সে সম্ভাবনা ছিল না।

ওরা সবাই আবার চুপ-চাপ বসে থাকে। এবার অহল্যা আসে। কি হল নিকুঞ্জদার? কক্ষনো তো এত রাত্তির হয় না।

নিকুঞ্জের বাপ বলে, বলতে নেই তোমরা বড্ড অলুক্ষণে। তোমাদের সোনা নে গেছে, যতক্ষুণ না ফেরে ততক্ষুণ স্বোয়াস্তি নেই। পথে কত ভয় ভীত আছে, ট্যাংরার মাঠটা তো ছাড়া।

ক্রমে রাত একটু একটু করে বাড়ে। ওরা জিনিসপত্রের কথা ভুলে শুভ কুশলে নিকুঞ্জর আগমন প্রতীক্ষা করে। ট্যাংরার মাঠটাই সাংঘাতিক! পিণ্টু শিশুকাল থেকে শুনছে ওর লোমহর্ষণ ইতিহাস।

অহল্যা মার কাছে ফিরে যায়।—কেমন হবে মা?

কইতে পারি নি—আমাদের কপাল মন্দা নইলে কি অমন সোনার সংসার ভাসিয়ে নে যায় বানে।

অহল্যার মার চোখের কোটর ভিজে ওঠে। কি আশ্চর্য—প্রদীপটা নিবে যায় তখনি। অহল্যার মা আবার বলে, এমনি কইরেই সোনাটুকুন যাবে। যদি তোর বে-টাও হত।

অহল্যার চকিতে মনে পড়ে শিবুর মুখখানা।

বাড়ির ভিতর সোর গোল শোনা যায়। অহল্যা ও তার মার বুক ছ্যাক করে ওঠে। সংবাদ ভাল তো!

বাবা এয়েছে।—নিকুঞ্জের ছেলেটা ধেই ধেই করে নাচে।

পিণ্টু বলে, দাদা অনেক কিছু এনেছে।

শুধু নিকুঞ্জের বাবা গম্ভীর হয়ে থাকে। তার পক্ষে এখন উচ্ছ্বাস দেখান উচিত নয়। সে গিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ে। একটু বাদেই হুঁকোর শব্দ হয়।

নিকুঞ্জের বৌ এক সময় একটু টিপ্পনি কাটে।—ধম্মপুত্তুরের এত দেরি হল যে?

তোর সতীন জইরে ধরেছিল ট্যাংরার মাঠে। এখন ভাত দে তো!

অহল্যা ও বিনোদিনী এসে দেখে—প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু এনেছে নিকুঞ্জ। জামা কাপড় খেলনা কত কি!

কত বেচলে গয়না? - বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করে।

সে খপর পরে নিও—একটা সুসম্বাদ আছে। মেয়ের বে দেবে? ভাল বর। খেটে-খুটে দু পয়সা করেছে। শুধু একটু দেখতে যা কালো। বিপ্র পাড়ার কাছে বাড়ি। খাসে ভাল ধান জমি আছে।

ফর্সা মেয়ে কালো জামাই—মোচড় দিয়ে ওঠে যায় মন।

অহল্যা ভাবে শিবুও তো কালো ছিল। কিন্তু তার মুখে ছিল যেন রোশনাই। সে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

বিনোদিনীর মনের অবস্থা অনেকটা অনুমানে বুঝে, নিকুঞ্জ বলে, ধান দেখলে ছেলের রঙের কথা ভুলে যাবে। নদীর ধারের সব ভাল জমি।

নিকুঞ্জের বাবা একখানা কাপড় পেয়েছে। সে বলে, আর দেরী না কইরে রাজি হয়ে যাও। তোমারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

নিকুঞ্জ মন্তব্য করে, যা কয়েছ বাবা। ছেলে ওদের চেনে। এক গাঁয়েই নাকি বাড়ি ছেলো। এই পাশাপাশি ঘর। ছেলের নাম শিবু। বাপের নাম রামকানাই।

অহল্যা অস্থির হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

লম্ফটা আন।

কেউ বলে, জল দে এক ঘটি।

অহল্যার সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম হয়েছে। মুখ চোখ গেছে ঘামে ভিজে। জলের ঝাপটা দিতেই সে উঠে বসে।

নিকুঞ্জের বৌ বলে, শুনেই এই, পেলে না জানি কি হবে!

অহল্যা কোনো জবাব না দিয়ে সভা ছেড়ে চলে যায়।

একে [illegible] তাতে বাড়িরপাশের জন-মজুরের ছেলে বিনোদিনী দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে। শিবুর সুশ্রী নাক মুখের জন্য তার ওপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তা বলে যে তাকে জামাই করতে হবে, এ কথায় হঠাৎ সায় দিতে পারে না বিনোদিনী।

নিকুঞ্জ বলে, আচ্ছা ভেবে চিন্তে না হয় কাল সকালে বলো।

বিনোদিনী বলে, গয়নার ট্যাকা?

বাক্সিরেই তো কোনো কাজে লাগাচ্ছ না—আছে, কাল সকালেই নিও। এখন ট্যাকার জন্য এত না ভেবে, আসল কথাটা ভাব। এদিকে গলা-জাতা মেয়ে, ওদিকে ধান জমি।

অগত্যা বিনোদিনী চলে যায়। যাদের আশ্রয়ে আছে তাদের বেশি ঘাঁটাতে চায় না।

কি করবি অহল্যা?

তুমি যা করো।

দেখতে কালো—

কর্দা পাচ্ছ কই?

কৃষাণের ছেলে—

রাধিপুকুর আসবে নাকি?

নিকুঞ্জ ট্যাকা পয়সার হিসেব দিলে না—

— এখন ওকে কচলে তেতো কইরো না। কাজ কম্ম হলে ওরাই তো খাটবে।

তা বলে কি গয়নার ট্যাকাগুনো মেরে দেবে? ওমন মানুষের কথায় আমি আমার মেয়ের বে দেবো না—অহল্যার মা পাশ ফেরে। মেয়ের উক্তি তার ভাল নাগেনি তাই মুখোমুখি শুয়ে থাকা চলে না।

অহল্যা বলে, সে তোমার ইচ্ছে। নিকুঞ্জদা দায় ঠেকেনি। গলায় পেরো তার নয়, তোমার।

বিনোদিনী সারা-রাত ঘুমাতে পারেনি। সে ছটফট করে কাটিয়েছে। সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করা যে কি কঠিন! কতদিন তার স্বামী শিবুর সম্বন্ধে কত কি মিথ্যা অভিযোগ করেছে, বিনোদিনী তা ষোল আনা বিশ্বাস করেনি। নিতান্ত সহানুভূতির সঙ্গে শিবুর পক্ষ হয়ে লড়েছে, কিন্তু আজ গ্রহণ করতে পারছে না সেই শিবুকেই। নইলে শিবুর অনেক গুণ—দেখতে সুশ্রী, মিষ্টি ব্যবহার, লেখা পড়াও শিখেছে। ছিল অবস্থা খাটো, তা নাকি ইদানীং ভাল হয়েছে। এ আর কিছু নয়, ওর মামারই যোগাযো[illegible]র নিজের অধ্যবসায়।

মা, নিজের দিকেও তো চাইতে হবে। এখন আর ঠমক-গমকের দিন নেই আমাদের।

তুই ঘুমোস নি?

তুমি না ঘুমলে আমি কি করে চোখ বুজি?

সকালবেলা উঠে বিনোদিনী বলে, নিকুঞ্জ বাবা তোমরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছ, যা ভাল বোঝ তাই করো। আমি আর ভাবতে পারিনি। মেয়ের মত আছে।

নিকুঞ্জ বলে, আমরা তা জানি। নইলে কানে শোনা মাত্তর কেউ কি ভিরমি যায়? তুমি দেখে লিও কাজ না হওয়া তক্ আমরা ধম্ম খোয়াবনি। আমি বলা মাত্তর ছেলে লাফিয়ে উঠলে। বললে, তুমি কি জান নিকুঞ্জদা ওঁনরা তো আমার আপন জন। ছেলেবেলা মেয়ের সাথে বৌ-বৌ খেলেছি।

সকলে হেসে ওঠে—বিশেষ করে মেয়েরা।
অহল্যার নাক মুখ দিয়ে যেন গরম বাষ্প বার হয়।
নিকুঞ্জ বলে, তা হলে কথাবাত্তা পাকাপোক্ত করব?
বিনোদিনী বলে, করো।
নিকুঞ্জ বলে, কথার আগে ট্যাকার দরকার।
বিনোদিনী বলে, কেনে?
এইটে আর বুঝলে না? এখানে তো ছেলে মেয়ে দেখার বালাই নেই। শুধু কি-কি দেবে তার ফন্দ চাই।
আমাদের আর কি আছে যে দেব?
কেনে, যা সোনা রয়েছে তা তো কম লয়। ওই বেচেই সব কিছু করতি হবে।
আগে ঠিক-ঠাক করো, পরে দেখা যাবে।
ঠিকের বাকি তো নেই। ছেলে রাজী ছেল, তোমরা সায় দিয়েছ। এখন দিনটা দেখলেই হয়। আমার সময় অল্প—শিবুর সাথে দেখা কইরে পাকা কথা কব, অমনি যা যা পারি কিনে আনব।
বাপ বলে, সেই ভাল।
অহল্যা তার হাতের বাকি রুলি গাছা খুলে দেয়।
নিকুঞ্জ বলে, ওকি, আর দুগাছা?
বিনোদিনী বলে, দিচ্ছি।
অহল্যা বলে, থামো মা। ওতে যদি হয় ভাল, নইলে এ-বিয়ে থাক।
সকলে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। নিকুঞ্জ কি যেন ভাবে। সে মাথা চুলকায় ঘন ঘন। বাপকে একান্তে ডেকে নিয়ে পরামর্শ করে খানিক। ফিরে এসে বলে, নানা ওতে হবে না।
অহল্যা জবাব দেয়, না হলে আর করা কি! মা এদিক পানে চলে এসো।
নিকুঞ্জ একটু অপেক্ষা করে ঐ এক গাছা রুলি নিয়েই চলে যায়। খেতে বসে অহেতুক বৌকে তেড়ে ওঠে।—যত সব…

বেলা প্রায় এক প্রহর হয়েছে। রোদ উঠেছে ঝিলিক দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে পথ আর ফুরায় না নিকুঞ্জর। দুগাছা রুলিতে আর ক-টাকা হবে? কাল তো খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশ বেয়াল্লিশ টাকা। যা রইবে তা দিয়ে কি

একটা মেয়ের বিয়ে হয়? আচ্ছা শক্ত মেয়ে অহল্যা—বুদ্ধিটাও বেশ পোক্ত। হুট করে একেবারে ভোল বদলে ফেললে। যাক, যখন দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে নিকুঞ্জ তখন যে কোনো প্রকারে উতরে দিতে হবে। আর এমন কুটিল কঞ্জুস কেউকে আশ্রয় দেওয়া নয়। যার ওপর খাবে, তাকেই অমান্য করবে। হায়, হায়!

— সুন্দর একখানা বাড়ি করেছে শিবু গোমুখীরই একটা ডালের পাড়ে। এখনো বড় গাছ জন্মায়নি—কালা গাছ ও আম গাছ ঘন সবুজ পাতা ছড়িয়ে দিয়েছে। খড়ো ছাউনি বেয়ে উঠেছে কি যেন কি একটা লতা। ফল ধরেনি। ফুলে নবজাতকের সম্ভাবনা। ছবির মত দেখায় বাড়িটা।

শিবু!

এসো, এসো নিকুঞ্জদা।—একখানা কাটারি হাতে শিবু বেরিয়ে আসে। দিব্যি তেইশ, চব্বিশ বছরের ছেলেটি হয়েছে শিবু। চোখের মণিতে একটা সংযত কৌতুহল। বীরত্বব্যঞ্জক ঢক হয়েছে বুকখানার। কিন্তু মুখখানা এখনো সুকুমার। কাজ করে মাঠে ঘাটে, তবু কোমলতা রয়েছে কৈশোরের। সে কতগুলো কাঁটাগাছের তুচ্ছ শুকনা ডাল কেটে আঁটি বেঁধে রাখছিল।

এগুলো দিয়ে হবে কি?

বর্ষাকালের জ্বালতি।

এত হিসেব তোমার। বর্ষার তো কত দেরী।

হিসেব ছাড়া কি সংসার চলে? লাই কুড়িয়ে বেল।—শিবু একখানা চাটাই বিছিয়ে দেয় দাওয়ায়।—আরাম করে বস। জল আছে কলসীতে পা ধুয়ে নাও।

নিকুঞ্জ পা দুখানা ধুয়ে, নিজের কাঁধের গামছাখানা দিয়ে পা মোছে না—শিবুরখানা টেনে নেয়।—বললাম কি জানো, তোমাদের বাড়ির পাশের লোক, অহল্যার সাথে বৌ-বৌ খেলছে।

শিবু লজ্জায় বেগুনী হয়ে ওঠে।—একথা তো তোমায় বলতে বলিনি নিকুঞ্জদা। ছিঃ ছিঃ তুমি আন্দাজে তীর ছাড়লে!

বে-থার ব্যাপারে অমন দুটো-পাঁচটা ছাড়তি হয় বই কি! নইলে কি প্যাখি ঘায়েল হয়?

তুমিই কথা পেড়েছ, আমি তো কারুকে ঘায়েল করতে বলিনি।

আহা আমি থাকতে তুমি বলতি যাবা কেন? সোমত্ত মেয়ে আমাদের

ঘাড়ে এসে উঠেছে, এখন আমাদেরই দায়িত্ব। যা কিছু ধর্মের দিকে চেয়েই করছি। দেখছ না এ দুদিন ধরে আমার কাজ কম্ম বন্ধ।

শিবু বলে, মামা কিছু সাহায্য করলে। তাই খেটে-খুটে বাড়িঘর জমিয়ে যা কিছু করেছি। এ ঘরে বড় লোকের মেয়ে না আসাই ভাল। ছোটবেলা থেকে তো অহল্যা কুটো গাছও সরিয়ে দেখে না। শুধু আঁচল মেলা দিয়ে ঘুরে বেড়াবার অভ্যেস। ওকে দিয়ে—উহুঁ, কিছু হবে না।

জানো না শিবু এখন একেবারে পালটে গেছে—বলে যে চ্যাঙারী মাথায় করে হাটে বন্দরে যেতে আমার লাজ নেই। আর কি যে রূপ হয়েছে!—নিকুঞ্জ সম্যক কিছু ব্যাখ্যা করে না, কিন্তু সন্ধান করে অব্যর্থ।

শিবু একটু কাবু হয়। মুখ না তুলেই প্রশ্ন করে, সে পারবে এ সব সাদা-মাঠা কাজ করতে? পোষাকি বলতে এখানে কিন্তু কিছু নেই। শুধু গতরে খেটে লোভ সামলে যা কিছু জমান। এমনি কইরেই তিলে তাল হয়।

অহল্যা কি গেরস্তের মেয়ে নয়? সে সব পারবে। অন্যের চেয়ে ভাল পারবে। সে হেজি-পেজি বংশের নয়! তার রুচি আছে। বুদ্ধি আছে। সে যেমন ধান ভানতি পারবে, তেমনি পারবে চুল বাঁধতি, আলতা পরতি। চোখে কাজল দিতি হবে না। বিধাতা জন্ম কালেই তা ছুঁইয়ে দিয়েছে। এখন যা হয়েছে তা আর কব কি!

শিবু আর-একটু কাবু হয়। কিশোরী অহল্যা পূর্ণ যুবতীর লাস্যে ও হাস্যে তার মনের নরম মাটিতে এসে দাঁড়ায়। সে চমকে যায় আচমকা। নিকুঞ্জের মুখের দিকে চেয়ে সে লক্ষ্য করে, নিকুঞ্জ কিছু দেখল কি না!

অবশেষে শিবু সায় দেয়। নিকুঞ্জ অহল্যার রুলিগাছ শক্ত করে কোমরে বাঁধে। তারপর সে ওস্তাদ তবলচির মত তবলায় শেষ বাজনা তোলে।—মেয়ে তো না যেন রাজকন্যে!

এখন মামার অনুমোদন সাপেক্ষ।

নিকুঞ্জ বিরক্ত হয়। তবু বলে, তুমি থাকো আমি গিয়ে মত নিয়ে আসি।

সেই ভাল!—শিবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে নিকুঞ্জ হাসি মুখে ফিরে আসে। দুপুর গড়িয়ে গেছে—তবু এতখানি পথ যাতায়াতের কোনো ক্লান্তি যেন তাকে স্পর্শ করেনি। সে পা দুখানা না ধুয়েই চাটাইটা টেনে বসে পড়ে।

জোঁকের মত ধরলাম, কিছু কি আর বলার জো আছে। বললে, ছেলে

লায়েক হয়েছে ওর মতেই মত। আমার এসব কাজকম্ম ছেড়ে এক দণ্ড মরার ফুরসত নেই। যা ভাল বোঝে তাই করুক। আমি সাজিয়ে গুছিয়ে দিইছি, এখন বুঝে-সুঝে চলুক। বললাম দোকানে থাক, পায় জল লাগবে নি, গায়ে কাদা লাগবে নি—না স্বাধীন হব। হয়েছে, ঠেলা সামলাক—আমাকে আবার ডাকা কেন? বুঝলে শিবু, তাঁর কোনো আপত্তি নেই। তিনি নিজেদের কাজ-কারবার নিয়ে মত্ত।

একটু থেমে নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

শিবু বলে, না।

রান্না-বান্না?

তা-ও হয় নি।

শুকনা মুখে নিকুঞ্জ প্রশ্ন করে, কেনে?

এবার আর কোনো জবাব দেয় না শিবু। 'এতক্ষণ যে তার কি আমেজে কেটেছে! সে বেলার দিকে চাওয়ার অবকাশ পায়নি।

সাত

ঢুলতে ঢুলতে অহল্যা গ্রাম ছাড়িয়ে আবার সহরে এসে পড়ে। ভাঙা-চোরা টক্কর খাওয়া মানুষের ভিড়ে বসে বসে সে ঝিমাচ্ছে। কখনো কখনো সে চেয়ে দেখছে পটল এল কিনা? ভাই বোন অহল্যার ছিল না—এই একটা রাতের মধ্যে পটলের ওপর যেন দুর্বোধ আকর্ষণ জন্মেছে। এত যে ভেঙেছে তবু ভিত টলেনি স্নেহ মায়া প্রীতির। তাই মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় অহল্যার।

. রাত দুটো। ফাঁড়ির ঘড়িতে শব্দ হয়। একা অহল্যা জেগে। রাস্তার ওপর এখন কুকুরগুলোরও সাড়া শব্দ নেই। তার গা ছমছম করতে থাকে। প্রেত ডাকিনীর ভয় নয়। যদি কেউ এসে ধরে নিয়ে যায় তাকে। এ সহরে সদা সর্বদা গুমখুন রাহাজানি চলছে। এসব সংবাদ অহল্যা এসেই জেনেছে। এখানে এত রাত্রে তার মত একটা মেয়ে মানুষের নিঃসঙ্গ বসে থাকা মোটেই উচিত হয়নি।

পটলটা কি আহাম্মক। আহাম্মক নয়, স্বার্থপর। অহল্যার কথা ভুলে গেছে টাকার লোভে। একটু যে দরদের জৌলুস দেখিয়েছিল, তা আর কিছু নয়—ঐ শাড়িখানা বাগাবার উদ্দেশ্যে। পটলটা শয়তান। সে আর আদৌ ফেরে কিনা কে জানে?

কিছুক্ষণ ভেবে অহল্যা আবার ঢুলে পড়ে ঘুমে। সে অজ্ঞাতে আঁচল বিছায় শানের ওপর। সারাদিনের পরিশ্রমে সে অত্যন্ত কাতর।

ফাঁড়ির ঘড়িতে চারটার আওয়াজ হয় ঢং ঢং করে। ঘুম ভেঙে যায় অহল্যার। প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। বড় গাছটার ডালপালায় কাকের

কর্কশ চীৎকার। ওর ভাল লাগে না। ও উঠে বসে। চোখ মুখ রগড়ায়। পটলটা এখনো এল না। নিশ্চয় ও উধাও হয়েছে শাড়িখানা নিয়ে। এমন একখানা শাড়ি অহল্যা আর কিছুতেই জোটাতে পারবে না। উঃ কি বাটপার মেয়ে! যেমন দেখতে তেমনি স্বভাব। ওর ভিতরটাও নিশ্চয় কালো। অহল্যা ভুল করেছে অল্পতে গলে গিয়ে। ওর ইচ্ছা করে নিজের হাত পা কামড়াতে। অহল্যার বুদ্ধি আছে তীক্ষ্ণ। কিন্তু সরলতাই ওর কাল হয়েছে।

রাস্তায় পাইপের জল দিচ্ছে—হুশ হুশ শব্দ। অতর্কিতে এক পাইপ জল ছুটে আসে অহল্যাদের আস্তানাটা পর্যন্ত। জলের সঙ্গে আসে নানাবিধ রাবিশ। হাঁউ মাঁউ করে ওঠে ঘুমন্ত মানুষগুলো। অহল্যা সাবধান হওয়ার আগে তার নোংবা কাপড় আরো নোংরা হয়ে যায়। সকলের সঙ্গে অহল্যাও গাল মন্দ করে গলা বাড়িয়ে। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। ওদের কাছে রয়েছে নাকি সহরটার সমস্ত জঞ্জাল হটাবার নির্দেশ!

কয়েকটা মোটর লরি চলে যায়। দু একটা ঠেলা গাড়ি। মালে মানুষে ঠাসাঠাসি। কেউ কেউ ঝগড়া তর্ক থামিয়ে অনির্দিষ্ট জল-পাইখানার উদ্দেশ্যে ছোটে। দু একটা বুড়োবুড়ি ঝুঁকি না নিয়ে নিকটের নর্দমাতেই বসে।

অহল্যা চোখে মুখে আঁচল দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে থাকে।

এখানে কতকাল এভাবে কাটাতে হবে কে জানে? কত কাল নয়, হয়ত চিরকাল, মৃত্যু পর্যন্ত। অহল্যার দম বন্ধ হয়ে আসে।

একটা ঠেলা বোঝাই পাঁঠা খাসি যায় মুণ্ডহীন—রক্ত ঝরছে।

অহল্যা চোখ ফিরিয়ে দেখে সূর্য উঠছে। চারদিকে অমনি যেন চাপ চাপ রক্ত।

সুপ্রভাত! বলেই অহল্যা কেমন যেন একটা ভয় নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এমনি সময় প্রতিদিন অহল্যার ধান ভানা হয়ে যেত। সে ঘর থেকে বেরিয়ে মহা বিস্ময়ে নিজেদের ক্ষেত খামারের দিকে চাইত। ঘন সবুজ গাছপালার বুক ঠেলে বার হচ্ছে শিশু সূর্য। সে প্রণাম করে বলত, সুপ্রভাত।

আজো সে অভ্যাস মত বলেছে। শৈশবে মা শিখিয়েছে। কৈশোরেও সে মনে করিয়ে দিয়েছে যেদিন ভুল করেছে অহল্যা। স্বামীর ঘরে এসেও সে বজায় রেখেছে মার নির্দেশ।

কিন্তু কার জন্য সুপ্রভাত? কার জন্য প্রার্থনা? এখানের এই সূর্যকে দেখে যে তার ভয় হচ্ছে। শিউরে উঠছে সারা শরীর। তবে কি এখানে কল্যাণ কামনার কিছু নেই? কোনো মঙ্গলই এখানে হয় না? তা হলে দলে দলে মানুষ এখানে আসে কেন? বাস করে কেন বন জঙ্গলের মত?

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অহল্যা সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে চলে যায়।

যেখানে মানুষ, সেখানেই দেবতা। যেখানে পাপ, সেখানেই পুণ্য। অতএব সুপ্রভাত। জগতের কল্যাণ কুর হে সূর্য!

ভাবতে ভাবতে অহল্যা এগিয়ে চলে। পটলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আ শা নেই, পূর্ব পরিচিত কেউকেই অহল্যা দেখছে না, এখন সে কি করবে চিন্তা ক'রে স্থির করতে পারে না।

এমন করে অহল্যাকে নিজের জন্য ভাববার প্রয়োজন শৈশবে ছিল না। কৈশোরেও সে নিশ্চিন্ত মনে কাটিয়েছে। শুধু উদ্দাম বাসনা ছিল বন অরণ্য নিয়ে—ঘুরেঘুরে দেখা তার শালিখ টিয়া বুলবুলির খেলা, মুহুর্মুহুঃ বিস্ময় উদ্ঘাটন বৃষ্টির ঝাপটার, রাধাপদ্মর দক্ষিণা হাওয়ার।

কিন্তু যৌবনে তাকে একবার নিষ্ঠুর পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল—প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দুঃখের সমুদ্র মোহানায়। সে কূল পেয়েছিল। তখন সঙ্গে ছিল মা। আজ স্বামী থেকেও নেই। তবু তাকে বাঁচতে হবে। তার নায়ের নোঙর আটকাতেই হবে শক্ত কিছুর বুক চিরে—ইট কাঠ লোহালক্কর দেখে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

অহল্যা দৃঢ় পদে এগিয়ে চলে। ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ওঠে আরো। সে একদল ভিখারীর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, লতুকে তোমরা চেনো?

কে লতু?

সুকুমারী?

তারও তো নাম শুনিনি বাছা। পথ ছাড়ো। আমরা তাকে চিনি নে।

পটল?

কদ্দিন এখানে এয়েছ? কালিঘাট বাজারে ছ আনা সের—একটু এগিয়ে জিজ্ঞেস কর। যে এ কথাগুলি বলে সে খোঁড়া। সে চলতে থাকে এক অনবদ্য ভঙ্গিতে। তার কথায় সঙ্গীরা হাসে।

অহল্যা লজ্জা পায়।

কিন্তু তার লজ্জা ছাপিয়ে একদল ছেলে হেসে ওঠে।—দেখ্ না বুড়ির ঢং!

অহল্যার মুখ দিয়ে একটু শাসনের সুর বেরিয়ে আসে,—ছিঃ অমন করে বলতে নেই।

তোমায় যে কালিঘাটের বাজার দেখালে ?

দেখাক।

অহল্যার মুখের দিকে চেয়ে ছেলেরা একটু বিস্মিত হয়ে থাকে। তারপর যে যার বাড়ির দিকে চলে যায়। উৎসাহ পেলে হয়ত কোন্ না ঢিলই ছুঁড়ত।

একে রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, তাতে তেজ বাড়ছে সূর্যের—অহল্যার আর ঘুরতে ইচ্ছা করে না। সে এক জায়গায় কিছু সময়ের জন্য বসে পড়ে। কিন্তু এ ভাবে বসে থাকলেও তো তার পেট চলবে না। না চললেও তার আর উপায় নেই। তার পা দুটো শরীরের ভার আর কিছুতেই সামলাতে পারছে না। প্রচুর আলস্যে সে ভেঙে পড়ে।

একজন বলে, সরো মেয়ে সরো—এখানে জলের ছিটা দিতে হবে। নইলে ধুলো ওড়ে।—সে একখানা ঝাড়ু হাতে অবাক হয়ে অহল্যার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

অহল্যা বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সুমুখে একটা পানের দোকান। একখানা প্রকাণ্ড আয়না টাঙান। অহল্যার সমস্ত শরীরের প্রতিবিম্বটা তাতে গিয়ে প্রতিফলিত হয়। চকিতে সে বোঝে কেন লোকটা অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আবার সে হাঁটতে থাকে। পথ চলাও কি সহজ! এখানে খানা ওখানে ত্রিপলের তাঁবু, বোধ হয় রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে—কুড়ি খানেক বালতি ও টব রেখেছে কারা যেন ফুটপাথ জুড়ে। অহল্যা পদে পদে বাধা পায়। সে হোঁচোট খায় একখানা আধলা ইটের সঙ্গে। পা কাটে নি, কিন্তু প্রাণ যেন বেরিয়ে যেতে চায়। অহল্যা বসে পড়ে।

সে নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিতে পারে কি পারে না, ইতিমধ্যে একটা হৈ চৈ শোনা যায় পাশের রাস্তায়। ওকে উঠতে হয় তাড়াতাড়ি। ছুটতে হয় দৈনন্দিন চিন্তায়। দুপুরের আর কতটুকুই বা বাকি!

এক পয়সাওয়ালা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি পুণ্য করতে এসেছেন কালিঘাট। মাথায় সর্পিল রঙিন পাগড়ি! কপালে রক্তচন্দন! মাতৃদর্শন ঘটেছে—এখন ভিখেরী বিদায় বাকি! তার সিডান বডি গাড়িখানা চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে সেই

পঙ্গপালের দল। কি যে হট্টগোল, বানরের পালের মত কিচির-মিচির! পুণ্যকামী হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছেন না। হয়ত খাবলে-ছুবলে খেয়ে ফেলবে তাঁকে, নয়ত ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেবে তাঁর জামা কাপড়।

তোমরা সব লাইন দিয়ে দাঁড়াও।

এ আইনের কথা, মানতেই হবে। তবু অনেক চেষ্টার পর একটা লাইন তৈরী হয়। অহল্যা এসে একেবারে সবার শেষে দাঁড়ায় মুখ নিচু করে।

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি একটিবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন, যাকে যা দেব, তা মেনে নিতে হবে—কারণ সবাইর চাহিদা সমান নয়।

এও আইনের কথা, কিন্তু এবার সবাই যেন বেঁকে বসে। তর্ক তোলে তুমুল। প্রায় লাইন ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। পুণ্যকামী হাত গুটিয়ে বসেন। এবার অনেক ঝগড়া তর্কের পর স্বীকার হয় সবাই।

এখন প্রত্যেকের ভাগে এক আনা দু আনা করে পড়ে। বয়স এবং শক্তি সামর্থের মাত্রা দেখে বিলি হয় দান।

মসৃণ গতিতে মোটর এগিয়ে চলে।

অহল্যার ভাগ নেই। সে আঁচল পাতে। শ্রদ্ধেয় দাতা একটি বার মাত্র তার দিকে চোখ তুলে তাকান! অমনি অহল্যার আঁচলে এসে পড়ে পাঁচ টাকার একখানা নোট।

মোটর ছুটে চলে।

সকলে বলে, ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে বাবুজী। এই ড্রাইভার মোটর থামাও।

কিন্তু মোটর থামে না! ভুল হলেও, দাতা দিয়ে আর ফিরিয়ে নিতে পারেন না। কারণ তাঁর অনেক বাগান-বাড়ি এবং রেস করেও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে শ্যাওলা পড়ছে।

মোটর যখন দাঁড়ায় না, তখন সবাই মিলে কাড়াকাড়ি জুড়ে দেয় নোট-খানা নিয়ে। অহল্যা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছেড়ে দেয়। ভয় হয় ওখানা বুঝি ছিঁড়ে যাবে।

তুই কেরে হারামজাদী, উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস?

মার ঝ্যাটা সোনামুখির মুখে।

অহল্যা মুখ চুন করে থাকে। তার স্বপক্ষে যুক্তি থাকলেও সে মুখ খুলতে পারে না। এ ছাড়া তার ঘৃণা বোধ হয় প্রচুর। কি অদ্ভুত নোংরামি! কিন্তু

ওর ন্যায্য প্রাপ্যটা কি এমনি এমনি যাবে? শক্ত মানুষ যার তার মনের টানা পড়েন যেন ছিঁড়ে যেতে চায়। পাঁচ পাঁচটা টাকা—অহল্যা হতাশ হয়ে পড়ে।

কোনদিক দিয়ে পটল যেন এসে দাঁড়ায় বিতণ্ডার মাঝখানে।

কি হয়েছে রে, কি?

কিছুক্ষণ হৈ-চৈ চলে। আবোল-তাবোল উলটা পালটা উক্তি।

পটল কয়েকটা কুৎসিৎ গালাগালি দেয়।—তোরা চুপ যা, ওকে বলতে দে।

অহল্যা ধীরে ধীরে সব ভাঙিয়ে বলে। এবার কারুর মুখে রা-টি নেই পটলের উগ্র মূর্তি দেখে।

পটল এক জোয়ান মর্দের হাত মুচড়ে কেড়ে আনে নোটখানা।—যত সব জোচ্চোর ছুঁচোর দল। সোজা মানুষ পেয়ে ঠকান হচ্ছে।—সে আবার মুখ খোলে। তখন লজ্জা পেয়ে সূর্যও যেন মুখ ঢাকে মেঘের আড়ালে!

শব্দপাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ঠোঁটের গরলে।

দু-একজন পথচারী বলে, তুমি মেয়ে ঠিক বিচার করেছ। একেই বলে উচিত শিক্ষে।

অনেকে চলে গেলেও কুড়ি পঁচিশ জন অন্ধখঞ্জ বুড়োবুড়ি স্থান ত্যাগ করে না। তারা অহল্যা ও পটলের কাছে ঘুরে ঘুরে শুধু হা হুতাশ করে। বক্তব্য, ওর থেকে কিছু দাও—তোমাদের তো শক্তি সামর্থ রয়েছে।

আজ এই ফুটপাথে মানুষের শক্তি ও শ্রমের যে কতটুকু মূল্য স্বীকৃত তা ওরা জানে। তাই পটল ওঠে দাঁত খিঁচিয়ে। ভাগ সব হাড়গিলে অন্ধ বেইমানের দল। পরেরটা দেখে নোলায় অত জল কেন?

এর উত্তর প্রাঞ্জল; কিন্তু ওরা দিতে পারে না। তাই মুখ বুঁজে থাকে।

পটল অহল্যাকে নিয়ে এক পাঞ্জাবী হোটেলে ঢোকে। অহল্যার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়—সে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে। পায়ের সঙ্গে যেন পা জড়িয়ে যেতে চায়। পটল হাত ধরে টানে।—ওলো আমার নতুন বৌ অত লাজ কিসের? একটু পা চালিয়ে আয়।

ছোট রাস্তার ওপর হোটেল। তেমন অভিজাত মহলের আনাগোনা নেই। টেবিল চেয়ার ভাঙা বেঢপ জোড়াতালি দেওয়া। তবু গোটা দুই জং পড়া ফ্যান ঘোরে। খদ্দের ঢুকে হাঁকে, এই বয়! কেবিনও আছে দুটো, তবে পরদা টাঙান। ফুটো ত্রিপলের মাঝ দিয়ে দৃষ্টি চলে।

পটল অহল্যাকে নিয়ে একটাতে ঢুকে পড়ে।

একটা বয় কি যেন ইসারায় বলে। মালিক পাঞ্জাবী হলেও বাঙলা জানে, চোখ রাঙায়। বলে, খদ্দের লক্ষ্মী—দে, দে যা চায় ঝটপট করে।

পটল বলে, কেমন লাগছে বরের ঘর? ভাঙা চালে চাঁদের আলো!—নিয়ন-লাইটের আলোর দিকে আঙুল নির্দেশ করে পটল।

অহল্যার কাছে এই ভাঙা কেবিনই যেন রাজ-প্রাসাদের কল্পনা আনে। সে তার পরণের শাড়িখানার দিকে চেয়ে ভাবে, এখানে সে অনধিকার প্রবেশ করেছে যেন। তার ঘামিয়ে ওঠার উপক্রম হয়। কিন্তু যান্ত্রিক ফ্যানে তাকে ঠাণ্ডা রাখে।

সেই বয়টা এসে দাঁড়ায় পর্দা ঠেলে।

কি খাবি অহল্যা?

কি জানি বাপু!—অহল্যার এখন পর্যন্ত পায়ের কাঁপুনি কমেনি। সে স্বস্তিতে বসতে পারছে না চেয়ারের ওপর।

মাংস পরেটা নেব?

মাগো, ওদের হাতের মাংস! তুই খা।

তুই কি বামুনের ঘরের বিধবা নাকি?

অহল্যার বুকটা ছ্যাক করে ওঠে—এখনো তার স্বামী জীবিত। তার মুখখান পাংশু হয়ে যায়।

পটল তা বুঝতে পারে। সে নিজের চপলতার জন্য লজ্জিত হয়।—নারে এদের রান্না মাংস খুব ভাল। খেলেই বুঝবি। আমি অনেক খেয়েছি।

তবে আনতে বল।

পটল হুকুম করে। বয়টা চলে যায়।—তুই কি কিছু মনে করলি অহল্যা?—পটলের গলা নরম হয়ে আসে।

অহল্যা জবাব দেয়, না।—তবু তার মনটা কেমন করে যেন। কিছুক্ষণ বাদে এ মেঘও কেটে যায়। সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

ডিসে ডিসে মাংস পরেটা আসে। পটল খেতে আরম্ভ করে। একটু ইতস্তত করে অহল্যাও অনুকরণ করে পটলকে। শেষ পর্যন্ত ভালই লাগে রান্না—মাংস, জুস, চাটনিটুকু পর্যন্ত।

হ্যাঁরে কাল এই আসি বলে সারা রাত কোথায় কাটালি?

স্ফূর্তি করে।

অহল্যা ঠিক অর্থটা বুঝতে পারে না। কিন্তু বিরক্ত লাগে তার। একটা বয়স্থা মেয়ের মুখে একি উক্তি? সে ও প্রসঙ্গে আর যায় না। চেয়ে দেখে যে ওর শাড়িখানা অনেক ময়লা হয়েছে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওরা কেবিন ছেড়ে চলে আসে।

অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, কত ফিরল?

সিকে পাঁচেক। এই নে।

ওমা এত লাগল!

ওরা বেরিয়ে দেখে অন্ধ খঞ্জের দল অনেকটা পাতলা হয়েছে। বেলাও ঠিক দ্বিপ্রহর। সুমুখের রাস্তার পিচ গলে উঠেছে।

আশ-পাশের দালান কোঠা দোকান পসার, রিক্সা ষ্ট্যাণ্ডের রিক্সাগুলো।

একজন অন্ধ বলে, মা ভিক্ষে দাও—লক্ষ্মী মাগো এই দুকুর বেলা হিল্লে করো দাও অন্ধজনের।

অহল্যা অভিভূত হয়ে পড়ে। সে হাতের পয়সা থেকে কয়েক আনা অন্ধের হাতে দিয়ে বাকিটা ভাগ করে দেয় উপস্থিত সবাইকে।

চক্ষুষ্মানেরা বিস্মিত হয়ে থাকে।

আট

অসহনীয় সূর্যের তেজ।

অহল্যার চোখ জ্বালা করে। সে আবার এসে বন বেতসের আবডালে দাঁড়ায়। পা ধুয়ে দাওয়ায় ওঠে। চুপি চুপি এগিয়ে যায়।

কান পেতে নিকুঞ্জের কথা শোনে। নিকুঞ্জ যেন দিগবিজয় করে এসেছে।

—বলিনি আমি যে ট্যাকা হলে বাঘের চোখও মেলে। ছেলে আমার কথা শুনে গলে গেল। বললে, শুভ কাজে আর দেরি করে না নিকুঞ্জদা তোমার পায় পড়ি।

বিনোদিনীর গা জ্বলে ওঠে।

অহল্যা সব বোঝে, কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে পারে না। আর যা-ই হক শিবু অত ছ্যাবলা নয়।

নিকুঞ্জ বলে, কে আছিস, এক গেলাস জল দে ঃ

নিকুঞ্জের বৌ শুধু জল নিয়ে এগিয়ে আসে না, একখানা পাখা দিয়ে জোর জোর হাওয়া করতে থাকে।

নিকুঞ্জের বাবা নতুন কাপড় পরেছে। বলে, ধন্যি ছেলে—একটা অঘটন ঘটিয়ে এয়েছে। ও নইলে কি অহল্যার বে হত?

অন্য সময় নিকুঞ্জের বৌ নিন্দায় পঞ্চমুখ—অহরহ তো গাছ-কোমর বেঁধে ঝগড়া করে। আজ বলে, শাউড়ী আমার পুণ্যবতী!—তার মাথায় ঘোমটার বালাই নেই। হাটে বন্দরে গিয়ে তার লজ্জা ভেঙে গেছে।

বিয়ের দিনক্ষণও নিকুঞ্জ ঠিক করে এসেছে।

অহল্যা ভাবে, এ কি সত্যি?

বিনোদিনী বলে, এ তোমার উচিত হয়নি—এটু শলা-পরামর্শেরও যে সময় নেই!

নিকুঞ্জের বাপ বলে, এ কি মামলা মকদ্দমা যে শলা-পরামর্শ করত্তি হবে? কি কেপেল তুমি! শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

বিনোদিনী মুখ ভার করে থাকে। তার মনে হয়, এ বাড়ি শুদ্ধ সবাই যেন একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের দড়িতে পাক দিচ্ছে। মুস্কিল এই যে অহল্যাও যেন এদের সপক্ষে। অনেক কিছু বলার থাকলেও তার মুখ খোলার উপায় নেই।

নিকুঞ্জ বলে, ছেলে একটা আবদার করেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করে, আবার কি আবদার? আমাদের আবদার রাখার মত কোনো ক্ষ্যামতাই নেই। দেখছি এ কাজ হবার নয়।

আমরা যখন কিছু দিতে পারব না, ওরা মেয়ে তুলে নিয়ে যাবে। খুব ধুম-ধাম করে ওখানে বসেই বে হবে। কোনো ঝামেলা পোয়াতে হবে নি—আমরা নিশ্চিন্দি।

সে হবে নি কিছুতে নিকুঞ্জ। সোমত্ত মেয়ে তুলে দেব—যদি গণ্ডগোল হয়!

হলেই হল, আমি রইচি কেনে? আমরা কি এমনি এমনি মেয়ে ছাড়ব? ওরা তুলে লেওয়ার খরচ-পাতি দেবে।

তোমাদের পাল্লায় পড়ে শেষ কালে মেয়ে বেচতে হল!—বিনোদিনী কাঁদতে বসে। সে তার ভাগ্যমন্ত স্বামীকে স্মরণ করে ইনিয়ে-বিনিয়ে চোখের জল ফেলে।

তবু নিকুঞ্জ কথাবার্তা চালায়। সম্বন্ধ পাকা হয় আরো।

যেদিন বরপক্ষ মেয়ে তুলে নিয়ে যেতে আসে, সেদিন বিনোদিনী আঁচলে মুখ ঢাকলেও, মনে মনে খুশি হয় যথেষ্ট। কারণ তারা প্রচুর গয়না এনেছে—সেই সঙ্গে দামী কাপড়-চোপড়, অনেক পান বাতাসা, ছুটো বড় বড় রুই। এ বাড়ি-ও বাড়ির লোক দেখে তো অবাক।

বিনোদিনীর মুখের দিকে চেয়ে প্রথম অহল্যার মনটা পুড়ে উঠেছে। মনে পড়েছে বাড়িঘর বাবার কথা। সব বজায় থাকলে মা আর অমনি মুখ ঢেকে থাকত না। এত যে জিনিসপত্র অহল্যা পেয়েছে, এর ভিতর কোনো গৌরব নেই। সে ছেলে হলে একথা উঠত না—মেয়ে বলেই যত জ্বালা হয়েছে। ওরা গরীব, তাই বর পক্ষের অনুগ্রহ নিতে বাধ্য হয়েছে।

নিকুঞ্জের বৌ বলে, এখুনি ঝটপট সেজেগুজে নাও পালকী ব্যায়রা এলো বলে।

অহল্যা একটা নিশ্বাস ছেড়ে চলে যায় হাত পা ধুতে।

পাড়ার সব মেয়েরা এসেছে, কিন্তু অহল্যা না এলে কিছুই হবে না। তাই তারা অপেক্ষা করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে গয়নাগুলো। রূপোর হলেও এত রকমারী অলংকার এ তল্লাটে কারুর অদৃষ্টে জোটেনি। বরের পছন্দ আছে। অহল্যা ভেসে এলেও এতদিনে সবাই বোঝে যে ও ভাগ্যবতী। সাজলে-গুজলে ওকে দেখাবে ভাগ্যবতীর মতই। গা শুদ্ধ সবাইর প্রাণ পোড়ে।

অহল্যা নিজেই এসে ঘরে বসে একখানা মাদুর বিছিয়ে।

কে যেন বলে, গরজ বড় বালাই!

অহল্যা কোনো জবাব দেয় না।

এমন আমরা বাপের জন্মেও দেখিনি—বিয়ে তো সব্বারই হয়!

এবারও অহল্যা কিছু বলে না।

কে যেন এসে মুখখানা একটু তুলে ধরে।—কথা বল। চুপ করে রইলি কেনে?

অহল্যা একটু ফিক করে হাসে। তার মনের মেঘ কেটে গেছে। পাড়া-পরশীর টিপ্পনিগুলো তাই একেবারেই খারাপ লাগে না।

সবাই মিলে অহল্যাকে সাজাতে থাকে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত গয়না। নখে ঝুমুর-আংটি, পায়ে পদ্ম মল, কোমরে বেট, হাতে বাজু পৈছি। খোপায় রূপোর চাঁপা, সিঁথিতে সোনার টিকলি। রঙিন কাপড় পরে অহল্যা যখন চোখে কাজল দেয় এবং পা দুখানায় আলতার গণ্ডী টানে, তখন আর কেউ চোখ ফেরাতে পারে না।

এযুগে রাবণ উপস্থিত নয়, তা হলে এক্ষুণি হয়ত অভিনয় হয়ে যেত সীতাহরণ। মন্ত্রপূত কোনো গণ্ডীই হয়ত ঠেকাতে পারত না তার দুর্মদ বাসনা।

সময় মত পালকী আসে।

সময় মতই দুলকি চালে চলতে থাকে চার বেহারা।—হেঁইও হোঁ শব্দ। হেঁইও হোঁ……

অহল্যা ভাবে, একজন তার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে দিয়ে তাকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদানে সে কি দেবে? দেওয়ার মত তার কি আছে।

কৈশোরে যাকে খেলার ভিতর দিয়ে চেয়েছিল, যৌবনে তাকে স্বামী রূপেই পাচ্ছে—এ ভাগ্যের তুলনা হয় না। কিন্তু একি শুধু ভাগ্য? না, না এর ভিতর নিশ্চয় আছে শিবুর উদারতা।

সেই উদার মহৎকে সে কি দেবে? দেওয়ার মত তার কি আছে?

পালকির দরজা দুখানা একটু ফাঁক করে অহল্যা ভাবতে থাকে।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। রূপালী থালার মত চাঁদ উঠেছে আকাশে। ছোট ছোট গাছে পাতায় থোকা থোকা জোনাকি। মেঠো পথে অদৃশ্য ফুলের গন্ধ। রাস্তার দুপাশে কোথাও বা কচি কামিনীর গাছ, ঘন আম জাম—কোথাও বা বুড়ো বট। শিকড়ে শ্যাওলা, জটের মুখে কোমল ঝুরি। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

অহল্যার মনে অস্পষ্ট চিন্তা শিবুকে কি দেবে?

এবার তার সর্বাঙ্গ থেকে থেকে কাঁপতে থাকে। এ কাঁপনের সে কোনো অর্থ করতে পারে না। কখনো অধর, কখনো নয়ন, কখনো উরুতে সে অনুভব করে স্পন্দন। একি কোনো অমঙ্গল? কিছুই বুঝতে পারে না অহল্যা।

একটা নদী পার হতে হবে—শুকনা ঢালু।

শক্ত হইয়ে রইও।

অহল্যা উপদেশ মত বসে থাকে। পালকিটা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামে। তারপর অত্যন্ত সাবধানে ওঠে ওপর দিকে। নিকটে একটা হাট। পালকি বাহকরা একটু বিশ্রাম করে কাঁধের বোঝা নামিয়ে।

আজ হাটবার। হাট ভেঙে গেছে। কিন্তু এখনো রেশ আছে। লোক-জনের গোলমালে শোনা যাচ্ছে তল্পিতলপা গুটাবার। দুটো-চারটা লণ্ঠন জ্বলছে এখানে ওখানে। কোথাও বা লম্ফ। সকলেই বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে মাল তুলেছে।

অহল্যা মুখ বার করে। তাদের সঙ্গের ডে লাইটটায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে চারদিক। এই ভাঙা হাট মাঠ প্রান্তর সব।

অহল্যা তখনো ভাবছে শিবুকে কি দেবে?

একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। মাথায় তার বোঝা। কোলে একটি ছেলে।

অহল্যা এবার উত্তর খুঁজে পায়—আর কিছু নয়, শিবুকে দেবে অমনি একটি বলিষ্ঠ সন্তান। দিতে হবে না, সে হয়ত জুলুম করেই আদায় করে নেবে।

অহল্যা চোখ ফিরিয়ে আনে। তার মুখখানা একটু রাঙা হয়ে ওঠে। আবার চলতে থাকে পালকি—হেঁইও হো শব্দ।

কতক্ষণে সেখানে গিয়ে বিয়ের আসর। কি যে ভাল লাগে অহল্যার! কি যে ব্যাকুলতা! কি সে আধো আধো লজ্জা! জীবনে সবার এমনি একদিন আসে, এমনি এক মোহময় শুভ লগ্ন—অহল্যা এ সকলই জানে; তবু ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে শিহরণ। সে ভুলে যায় সমস্ত বিগত শোক, দুঃখের কথা।

খুব বেশি পথ নয়। ক্রোশ তিনেক রাস্তা। তবু যেন শেষ নেই। দরজা ফাঁক করে বারবার চেয়ে দেখে অহল্যা।

স্বচ্ছ নীল আকাশ। তাতে জ্যোৎস্না পক্ষের চাঁদ। অহল্যা চেয়ে থাকে। পালকি এগিয়ে চলে। চাঁদের চাইতে তার ভাল লাগে যেন কলঙ্কটুকু দেখতে। ওর জীবনেরও শোভা হবে যেন কালো শিবু। ও চাঁদ, শিবু কলঙ্ক। অহল্যার দৃষ্টি নেমে আসে দিগন্ত থেকে ছোট্ট একখানা ঘরে। অহল্যা আজীবন বুকে করে রাখবে। ওর মন স্নেহে উথলে ওঠে।

এক সময় শাঁখের শব্দ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে উলুধ্বনি—বৌর পালকি এসেছে। বৌর পালকি।···ছেলে-মেয়ের দল ছুটে যায় মহা কৌতূহলে। অহল্যা দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সে নিজেকে সম্বৃত করে বসে যতটা পারে।

কয়েকজন মেয়েলোক এসে হাত ধরে নামায় অহল্যাকে। সকলে উৎসুখ হয়ে দেখে বৌর মুখ।

কে একজন যেন বলে, এতো চাঁপার কলি!

আর একজন আপত্তি জানায়, না, না এ তো মুক্তোর মালা, শিবু এখন কদর বুঝলে হয়। আরো অনেক কথা হয় বর্ষিয়সীদের মধ্যে। কিন্তু প্রথম কথাটাই টিঁকে যায়—ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে।—এ যে চাঁপার কলি বৌ।

খুব বেশি লোক সমাগম হয়নি। ছোট উঠান। তার চেয়েও ছোট ঘর। কিন্তু সাজান হয়েছে চমৎকার করে। মেয়েরা আলপনা দিয়েছে প্রাণ ঢেলে। অহল্যা চেয়ে চেয়ে দেখে।

বুড়োরা তামাক টানে, ছেলেরা আনাচে কানাচে বিড়ি—আর সকলে ব্যাখ্যা করে বৌর রূপের। শিবু বয়সের চেয়েও গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা বলে। একটা ছাগল আছে, বারবার বেরিয়ে আসে ঘটের ওপরের আম্র পল্লবের

লোভে, সেটাকে সামলায়। উপদেশ নির্দেশ দেয় যদি কেউ কিছু প্রশ্ন করে।

শিবুর ছায়া দেখে, কিন্তু শিবুকে ঠিক দেখে না অহল্যা। কৈশোরের শিবু কত বড় হয়েছে যেন—অহল্যার চোখ নিবে আসে।

অল্প সময়ের ভিতর বিয়ে হয়ে যায়। এখনো যথেষ্ট রাত আছে। সকলে তাড়াতাড়ি বাসরের আয়োজন করে।

একটি মেয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে। একটা প্রদীপ উজ্জল করে রাখে দক্ষিণ কোণে। অহল্যাকে বলে, এটা যেন নেবে না সারা রাত। নিবলে বড্ড দোষ।

অহল্যা এবং শিবু বড্ড মুস্কিলে পড়ে। ওরা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। ক্রমে ক্রমে বিয়ে বাড়ির গোলমাল কমে যায়। এত প্রতীক্ষার রাতও শেষ হয়ে আসে খানিকটা।

শিবু বলে, অযথা তেল পুড়ছে।

এর মধ্যে গৃহস্থের হিসাবের ইঙ্গিত রয়েছে—রয়েছে আরো কি যেন নির্দেশ। চিন্তা করে নতুন সালংকারা গৃহিনী ওঠে। শয্যা ছেড়ে নামে। সলতেটা কমিয়ে একটা পিঁড়ি দিয়ে আবডাল করে শিখাটা। সন্তর্পণে ফিরে আসে শিবুর কাছে।

শিবু হাত বাড়ায়।

নির্জন রুদ্ধ কপাট জানালার রন্ধ্র রন্ধ্র খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, দোষ হবে।

ওরা সরে যায় বিছানার দুই প্রান্তে।

কিন্তু কদিনবাদেই একদিন বাড়িতে কেউ থাকে না—শিবু অন্ধ আবেগে জড়িয়ে ধরে অহল্যাকে। অহল্যাও তাকে ছাড়ে না।

কিছুক্ষণ বাদে শিবু জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগে অহল্যা?

অহল্যা বলে, ভাল।

আমার নতুন ঘর, নতুন সংসার—এখন তুই সাধ মিটিয়ে খেল।

পরদিন সকালবেলা থেকে অহল্যা নিবিড় ভাবে মগ্ন হয়ে যায়। সে রান্না করে, ঘর গুছায়, ছাগল বাঁধে, উঠান ঝাঁট দেয়। কাজ করতে করতে তার আর আশা মেটে না। হাসিও নেবে না মুখের। এক এক সময় গান বেরিয়ে আসতে চায় গলা দিয়ে—অফুরন্ত নিষ্কলঙ্ক গান।

দু একজন জন-মজুর নিয়ে সকাল হলেই শিবুকে বেরিয়ে যেতে হয় মাঠে। সেখানের কাজে তো ফাঁকি দেওয়া চলে না। বেগুন তুলতে হবে। লঙ্কা গাছে জুলি কেটে দিতে হবে আল টেনে। নতুন গাছগুলো সবে ঝাড়ু মেলে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ। ঝমঝম করে বর্ষা এলো বলে। নইলে তখন জল নামবে না।

কোদাল ও নিড়ানি এগিয়ে দিয়ে সেদিন অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, কখন ফিরবে?

জানি নে বৌ। আজ ওখান থেকেই ভাবছি হাটে যাব বেগুন নিয়ে।

সে হবেনি। আমি রেঁধে রাখব। খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে হাটে যেও। না যাও আমার কাছেই পাইকারী বেচো।

তুই কিনবি বৌ? তবে আগাম দে।

শিবুকে অবডালে ডেকে অহল্যা তা দিয়ে দেয়।

ফলে সেদিন মাঠে যাওয়া হলেও, আর হাটে যাওয়া হয় না—বেগুন অবিক্রিতই থাকে।

সন্ধ্যা বেলা শিবু বলে, ওগুলো শুকিয়ে যাবে।

অহল্যা বলে, আমি যখন রয়েচি তখন যাবে না।—একটু তেল-জল মিশিয়ে বেগুনগুলো মেজে অহল্যা ঢেকে রাখে একখানা ভিজা নেকড়া দিয়ে। তার ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট হয়।

শিবু ঠাট্টা করে, একি বিয়ের কণ্যে?

কাল দেখো।

পরদিন হাটে গিয়ে শিবু দেখে যে তার বেগুনের রঙ দেখে পাইকার পাগল। সে আশাতিরিক্ত লাভ করে।

আসতে আসতে সে ভাবে, হ্যাঁ এমনি একটি স্ত্রীরই তার প্রয়োজন ছিল। অহল্যা জাত-চাষীর মেয়ে।

ওরা দুজনে অমনি করেই দিন কাটায়। ওদের প্রেম গাঢ় হয় শুধু কূজন-গুঞ্জনে নয়—এই ছোট্ট সংসারটুকুকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। যে যত খাটে সে তত অপরের আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ওদের প্রেম বিলাসে নয়—শ্রমে। প্রতি ঘর্ম বিন্দু দিয়ে ওরা দৃঢ় করে ভালবাসা। তাই ওদের দুজনার স্বপ্ন আশা চলে হাতে হাত মিলিয়ে।

শিবুর বিষয় জ্ঞান ছোট কাল থেকেই পাকা। সে শাশুড়ীকে মাঝে মাঝেই দেখে আসে। খরচপত্র দেয়। কিন্তু এখানে আনে না।

একদিন এসে শিবু বলে, নিকুঞ্জদা বৌর জন্ত দুগাছা সরু সরু সোনার চুড়ি গড়িয়েছে।

আনন্দ সংবাদ কিন্তু মুখ শুকিয়ে যায় অহল্যার।

একটা সপ্তাহ যেতে না যেতেই শিবু অহল্যার জন্ত অমনি দুগাছা চুড়ি গড়িয়ে আনে।

একি! এতো আমি চাইনি। আমার কি কোনো গয়নার অভাব আছে?

তবু হাতে দাও।

অহল্যা জিদ করে না। শিবুর ইচ্ছাই পালন করে। তার মনটা সারা-দিন ধরে খচমচ করতে থাকে। মিছামিছি এতগুলো টাকা নষ্ট। ওগুলো থাকলে কত কাজ করা যেত। রাত্রে স্বামীর কাছে সব কথা খুলে বলে অহল্যা। একটা হাসির খোরাকী জোটে। শিবু মন্তব্য করে, নিকুঞ্জদাব এই কশ্ম! যাক মন্দ হল না। নগদ টাকা তো হাতে থাকে না, তবু এক জোড়া জিনিস হলো তোমার।

ওরা শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যতের অনেক পরিকল্পনা করে। আর একখানা ঘর তুলতে হবে। মাঝে মাঝে যেমন চোরের উৎপাত ধানের মোড়াইটা পাকা করতে হবে ইট গেঁথে। ইটের কাজ তো শিবুর চৌদ্দ পুরুষেও কেউ করেনি—ওর কি সইবে?

পুজো-আচ্ছা দিয়ে নিলে ভয় কি? একদিন তো এই মেটে ঘরের বদলে দালান উঠতে পারে। তারপর ঘাটলা বাঁধানো পুকুর। আরও কত কি!

বৌ তুই আমার লক্ষ্মী।

বাইরে বৃষ্টি নামে। ঘরের ভিতরে ওরা আবোল-তাবোল বকে।

অহল্যা গদগদ হয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে।

দুপুর রাত্রে চোর চোর বলে চারদিক থেকে সোরগোল শোনা যায়।

কণ্ঠ বেষ্টন ছেড়ে দিয়ে অহল্যা শিবুকে ধাক্কা দেয়। দিয়ে, নিজের গয়না-গুলোতে হাত বুলিয়ে দেখে—না, সব ঠিক আছে। ওরা আলো জ্বালায়। বেরিয়ে আসে বাইরে। শুনতে পায়, ওবাড়ির বৌর গলা থেকে নতুন হাঁসুলিটা বাঁকিয়ে নিয়ে গেছে।

সারারাত হৈ চৈ চলে। দিনটা কাটে এজাহার ও জটলায়। জিনিসের

হদিশ মেলে না। বৌটা কেঁদে কেঁদে মুখ চোখ ফুলিয়ে ফেলে। অহল্যার প্রাণটা পুড়ে যায়। সে প্রবোধ দেয় সাধ্য মত।

কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার। অহল্যা ও শিবু সন্ধ্যার পরই পরামর্শ করে। ওদের তো নগদ টাকা তেমন হাতে নেই—যা কিছু জমি ক্ষেত ও গয়নায় আটকা। জমি চোরে ডাকাতে নিতে পারবে না। সাধের জিনিস গয়নাগুলোই হচ্ছে যত চিন্তার।

অহল্যা বলে, এসো ওগুলো পুঁতে রাখি মাটিতে। এমন তো বাবা টাকা পয়সা সামলে রাখত।

তাই নাকি? চমৎকার পরামর্শ।

ওরা গয়নাগুলো একটা বড় আম গাছের শিকড়ের নিচে গর্ত করে পুঁতে রেখে আসে। সে রাত্রে ফিরে এসে অহল্যা আর কেন যেন তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে না।

দিন কেটে যায় একটা দুটো করে। আসে শ্রাবণ মাস। তারপর ভাদ্র। সুদূরের পাহাড়ী নদী বর্ষার গেরুয়া ঢল নিয়ে নামে—কূলপ্লাবী অশান্ত চঞ্চল। গোমুখির ডালে জল ধরে না। ছাপিয়ে ওঠে কূলে।

পাড়ের মানুষগুলো জন্তু জানোয়ার প্রমাদ গণে। ঝড় ছোটে। উপড়ে পড়ে বড় বড় গাছ।

অহল্যা ভাবে, তার সাধ ফলে মুকুলে পূর্ণ হওয়ার আগেই কি আবার মহাকালি এল? সে শিবুর হাতখানা ধরে কাঁপতে থাকে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কলকল খলখল শব্দে জল উঠতে থাকে। মাঠে, গ্রামে চতুর্দিকে।

নয়

পটল জিজ্ঞাসা করে, তারপর ?

অহল্যা উত্তর দেয়, ভেসে এলাম হেথা এই কালিঘাট।

তা নয়, তোর স্বোয়ামীর কি হল—আর গয়নাগুলো ? উঃ কি সব্বনাশ !—পটল ভয় ভয় প্রশ্ন করে, কেউ ডুবে মরে নি তো ?

না। তবে মরণের অধিক হয়ে আছে।—আর কিছু বলতে পারে না অহল্যা। তার বুকের ভিতরটা কেমন যেন উথলে উথলে ওঠে।

পটল ওর মনের অবস্থাটা মুখ দেখেই বুঝতে পারে। সে কিছুক্ষণের জন্য কৌতূহল দমন করে রাখে। অহল্যা ধাকাটা সামলে নিক। ও যে সমাজ সংসার থেকে ভেঙে এসেছে তা প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছে পটল। গ্রাম থেকে যারা ফুটপাথে ভেসে আসে তারা সকলেই অহল্যার মত। শ্বশুর স্বামীর বন্ধন, বাড়ি ঘরের শালীনতা একেবারে বিদায় দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু অহল্যার ঘটনাটা যেন সকলের চেয়ে করুণ, সবার চেয়ে মর্মস্পর্শী। এমন স্বামী এমন পরিবেশ ক জন পায় !

পটল ও অহল্যা হোষ্টেলের সুমুখ থেকে এসে সোজা একটা পার্কে ঢুকেছিল। সুবিধা মত একটা নির্জন গাছের তলায় এসে নিয়েছিল আশ্রয়। ইচ্ছা ছিল একটু বিশ্রাম করবে। নানা কথার পর উঠল বাড়ি ঘরের কথা। তখন কি আর ঘুম আসে, না কাহিনী শেষ হয় !

অহল্যা বলে, বন্যা তেমন হলনি বটে, কিন্তু ঝড় হল ভয়ানক। মানুষ গোরু এবার না মরলিও আমাদের নিচু ক্ষেতে বালি উঠল। আর সেই আম গাছটা, যেটার তলে গয়না ছেলো উপড়ে গেল। ঝড়ের পর গিয়ে কত খোঁড়াখুঁড়ি, কিন্তু গয়নাগুলোর আর হদিস পেলাম না।

পটল অভিভূত হয়ে শোনে।

তারপরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক।

শোকে দুঃখে পরিশ্রমে শিবুর জর হয়। সঙ্গে সঙ্গে গা-গতর বেদনা। বলতে গেলে সে একরকম অচল হয়ে পড়ে যাচ্ছে। অমন চেহারা কুঁকড়ে কুঁজো হয়ে যায় ধনুকের মত। প্রায় একটা বছর তাকে নিয়ে অনেক চিকিৎসা পত্তর, টানা-টানি। তারপর নিরুপায় হয়ে এখানে চলে আসা।—যেন ছুটকে এলাম তীরের মত পটল।

পটল বলে, চুপ কর, আর শুনতে ভাল লাগে না।

অহল্যা বলে, এখন চিন্তে যা কিছু বাড়ির জন্তে। মাঝে মধ্যে কিছু পাঠাতেই হবে। নইলে ধার কর্জে কদিন চলে? বসে বসে ভিটে খুঁড়ে তো একটা বছর কাটালাম।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে। হালকা বাতাসে গাছের পাতা ঝরে পড়ছে দু একটা করে। কয়েকটা হলুদ ফুলের পাঁপড়ি। অমনি যেন অহল্যার জীবনের গনা সুখের দিন কটা খসে পড়েছে মাটিতে। এখন লুটাচ্ছে। আশঙ্কা হয় উচ্ছৃঙ্খল পায়ের তলায় পিষে যাবে কোনো একদিন।

পটল জিজ্ঞাসা করে, নিজেরটা নিজের চালিয়ে রাখাই তো ধুম, কি করে সোয়ামীকে পাঠাবি?

জানি নে।

পটল শুয়েছিল—উঠে বসে। কি যেন ভাবে নিবিষ্ট চিত্তে। তার মনের কাঁটাটা উত্তর মেরু থেকে হঠাৎ দক্ষিণ মেরুতে ঘুরে যায়। অহল্যার মুখখানা অনেকবার দেখলেও আবার ভাল করে দেখে। একটা মুনাফার ব্যবসা, হীরা মুক্তার চাইতেও দামী সামগ্রীর দালালী। জমা লাগবে না, পুঁজির দরকার নেই—শুধু হাত বদলের সুর সংগত। পটলের চোখ দুটো জলজল করে ওঠে। ওর জিভে গলায় লালাস্রাব হতে থাকে অপরিমেয়।

অন্তরায় নিজের ব্যবসায় মন্দা পড়তে পারে। কিন্তু অহল্যা তো হেঁজিপেজি ভাঙা পেয়ালার সরবৎ নয়। ওর স্থান সোনার গেলাসে রূপোর টেবিলে। পটল সেখানের চাকরানী হবারও যোগ্য নয়। কাল রাত্রে বড় মহলে সে যে পান সিগ্রেট জোগাবার কথা বলেছে, তা একান্তই মিথ্যা। মুখের কাছে এসেছে বলে ফেলে দিয়েছে। এক সময় কতগুলো করকরে নোট পাওয়ার এই প্রথম সুযোগ—মুঠো মুঠো টাকা।

একটা কথা অহল্যা—

কি ?

থাক পরে বলব—ঠিক এখনই বলা উচিত নয়। ও হয়ত পালিয়ে যাবে। এখনো ওর হুড়হুড়ি ভাঙতে ঢের দেরী। লাভের আদিম লিপ্সায় পটলকে ঠেলে নিয়ে যায় এক বর্বর যুগে। ওর যা কিছু কল্যাণ ও মহৎ অনুভূতি ক্ষয়িষ্ণু পায়ের মত ভেঙে ভেঙে পড়ে।

এখন চ ওদের খোঁজ করি।

অহল্যা থমথমে মন নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পটলের পিছেপিছে ও হাঁটতে থাকে।

কি ভাবছিস ?

কিছু না।

ওরে মন খারাপ করে লাভ নেই। চেষ্টা চরিত্তির করলে একটা হিল্লে হয়ে যাবে তোর। কলকাতার সহর, রূপ আর গতর থাকলে কি কাজের অভাব ?

একটু আগে যে বললি একার পেট চালানই ধুম ?

পটল একটু ইতস্তত করে বলে, ও আমাদের কথা বলেছি। দেখ না তোর মত আমাদের কি আছে ? যেমন রূপ তেমনি চেহারা, যেন জলার পেত্নী। এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে ওয়াক থু করে।

ওরা কয়েকটা গলি-ঘুজি ঘুরে বড রাস্তায় এসে থামে। ট্রাম লাইন, খোলা মাঠ, ফাঁকা চৌহদ্দিগুলোর দিকে তাকায়। একটা চেনা জানা মুখও নজরে পড়ে না।—হাভাতেগুলো গেল কোথায় ?—পটলের রাগে কপালের রগ ছুটো দপদপ করে। এইবার ওরও মনে হয়, যা কিছু সম্বল ছিল তা বুঝি আর পাওয়া যাবে না ?—আয়, আর একটু খোঁজ করে দেখি এদিকটা।

কিছুক্ষণ সন্ধানের পর একটা লম্বা দালানে ওদের সাক্ষাৎ মেলে। দরজা জানালা লাগান হয়নি। বড় বড় কোঠা—ফাঁকা অসম্পূর্ণ পড়েছিল, চুণকাম আস্তর এখনো বাকী। একদিন হয়ত ঢাউস কারবারীরা অনেক আগাম দিয়ে বহু আড়ম্বরে ঢুকে পড়বে। এখন হয়েছে চুনো-পুঁটির আশ্রয়স্থল। ওদের দেখে সকলে চীৎকার করে ওঠে। অভিনন্দন জানায় কয়েকটা কটু কুৎসিৎ ইঙ্গিতে।

অহল্যা ও পটল সিঁড়িতে বসে হাঁফ ছাড়ে।

আমাদের জিনিসপত্তর,

সবই ঠিক-ঠাক আছে। শুধু তাই নয়, ওদের জন্ত স্থানও সংরক্ষিত করে রেখেছে দুখানা। একজন বলে, ঐ দেখ! তোদের পছন্দ হয়েছে তো?

ব্যারাকের মত পাশাপাশি ঘিঁজি আস্তানা। হুক দালান—ভাল করে নিশ্বাস টানার উপায় নেই। আবার ঠিকানা বদল, অহল্যার ভাল লাগে না। এ কদিন কাটিয়েছে উন্মুক্ত আকাশের তলে। সীমানা চৌহদ্দির বালাই ছিল না। কাকের কর্কশ চীৎকারে ঘুম ভাঙলেও একটা বৃহৎ সবুজ পত্র বহুল গাছ ছিল। তারায় ভরা আকাশের সঙ্গে দেখা হত নিত্য রাতে—যে আকাশ চেনে ওর স্বামী এবং সংসারকে, যে আকাশ এই সহরের লোকগুলোর মত হৃদয়হীন গোমড়ামুখো নয়।

নতুন দালান হলেও জীবনে বারম্বার এ ঠিকানা বদলান ভাল লাগে না। শেষের দিকে অহল্যা অবশ্য অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছে, তবু ঘর সংসারের আবেষ্টন ভুলতে পারে না। সে জানে যে ফেলে আসা পল্লী জীবনে তার ফিরে যাওয়া এক-রকম অসম্ভব, তবু মনে মনে তা স্বীকার করতে চায় না। তার মনে আজ দুঃখের দিনগুলির চাইতেও সমৃদ্ধির দিনগুলির কথা বেশি ভেসে আসে—শিবুর বলিষ্ঠ বাহু বন্ধন, মোড়া বোঝাই ফসল।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে ঘনিয়ে এসেছে। রান্না-বান্না চড়েছে ফুটপাথে। আলো জ্বলছে রাস্তায় ট্রামে বাসে। ঝমঝম করছে চারদিক। অজস্র লোকের প্রাণ চাঞ্চল্য। হাসি ঠাট্টা রসিকতার অন্ত নেই। যুবক যুবতীর চটুল পদক্ষেপ। হকারেব চিৎকার। চারদিক সরগরম।

শুধু অহল্যার মনটা অন্ধকার। কয়েকবার উঁকিঝুঁকি মেরে একবার চাঁদ উঠেছিল—আর বুঝি আশা নেই জ্যোৎস্নার। এই জংপড়া টুটা-ফুটা রাবিশের মধ্যে সে কি করে যে কাটাবে?

অহল্যা চেয়ে দেখে কখন যেন পটল উঠে গেছে। তার কাছে কিছুই তো জিজ্ঞাসা করা হল না। আজ না হলেও অন্তত কাল সকালে তো অহল্যারও অর্থের প্রয়োজন।

দোয়েল-শ্যামা হরিয়ালের শিষ নয়, রাত গোটা দশেকের সময় মানুষের শিষ শোনা যায় ধারাল। একটা, দুটো, তিনটা…

পটল এগিয়ে যায়।

ইতিমধ্যেই সে ঘুরিয়ে গুছিয়ে পরেছে শাড়িখানা। ঠোঁট রাঙিয়েছে পানের রসে। চুল বেঁধেছে হাল ফ্যাসান করে। ইচ্ছা করেই ব্লাউজের একটা টিপ বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছে পটল। একটা চাপা গলি পথে সে এসে দাঁড়ায়। তার সুমুখে গত কালকার সেই হাফপ্যাণ্ট গেঞ্জি পরা আবলুস কালো ছোকরা। দাঁত তো না পুষ্ট শাঁখা কেটে যেন পল তোলা ফুটো পংক্তি।

পটল বলে, কি রে বুলবুল? অত হাঁইপাই কেন? একটা গজলের টানই তো যথেষ্ট!

বাঘিনীর খপর কি?

মেজাজ ভাল। খাঁচা লাগবে না। পায় হেঁটেই আসবে। তবে টাকা চাই।

তার অভাব হবে না।

ওরা অনেকটা পথ হেঁটে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে এসে থামে। এ অঞ্চলটা কর্পোরেশনের এলাকার বাইরে—ঝগড়া তর্কে মিউনিসিপ্যালিটির তেল ফুরিয়ে এসেছে, তাই আলো জ্বলে না। পটলকে একটা জামরুল গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেটা চলে যায়। পটল বলে, একা একা দাঁড়িয়ে থাকব?

ভয় নেই এটা টালিগঞ্জ, কেউ গিলে খাবে না।

পটল নিশাচরী। অন্ধকারের অলিগলিতে তার আনাগোনা। সহরে সাপের বিবরে তার পা দেওয়াই অভ্যাস। তবু তার একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ভয় করে। একটা দমকা হাওয়া আসে। কয়েকটা জীর্ণ বিবর্ণ পাতা ঝরে পড়ে পটলের গায়। ওর সিমসিম করে সারা শরীর। যত পাপের-বেসাতি করুক না কেন, ওর ভিতর যে চিরন্তন নারীচিত্ত তা অসহায় বোধ করে। ও সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে তাকায়।

ছোকরা ফিরতে দেরি করছে। এত কি পরামর্শ? কটা টাকা দেবে, কখন দেবে—ব্যস। যদি অহল্যার বদলে ওকে চালান করে দেয়? কোথায়, কত দূরে, কি ভাবে নিয়ে যাবে—পটলের তা সঠিক জানা নেই। তবে সে শুনেছে চায়ের বাগানে, রবারের ক্ষেতে নাকি ঐ সব জীবন্ত মাল চালান হয়। অনিশ্চিতের ভয়াবহতা তাকে অধীর করে। তার আর মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। সে মনে মনে মুণ্ডপাত করে ছোকরার।

আরো কিছু সময় কাটে। লোভে লালসায় সে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে থাকে। হুট করে এতগুলো টাকা কামাই করা এত সহজ নয়।

কিন্তু এ কাজটা কি ভাল করছে পটল ?

জবাব আসার আগেই হাতে টাকা এসে যায়।

এই নে তোর ভাগে পঁচিশটে, আর আমার ভাগে পঁচিশটে।

মাত্তর এই কটা টাকা দিলে ?

জিনিস হাতে পেলে আর পঞ্চাশটা দেবে।

তাতে হবে না। এতো একটা গোরুর দামও নয়।

তবে কি লাখ টাকা দেবে ? এই দিতে চায় না। কত হাতে পায় ধরে আনা। কিছু না দেখে মুখের কথায় আর কত দেবে বলত ? তুই হলে কি দিতিস ? দেখিস নি তো হাড়গিলের মুখখানা, কথা বলা যায় না।

সহসা পটলের মনে হয় এই লোকটাকে সে যেন কোথায় দেখেছে।...

ওরা দুজনে আবার কালিঘাটের দিকে ফিরে আসে। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তা, ট্রাম লাইন, তারপর রেলওয়ে ব্রিজ। পথে তেমন মানুষের আনাগোনা নেই। দু একটা মোটর, কদাচিৎ এক আধখানা রিক্সা। পটল ধীরে ধীরে হাঁটে।

কি ভাবছিস ? একটু পা চালিয়ে আয়। আমি তোকে ঠকাইনি।

সে সব কথা ভাবছে না পটল, সে জিজ্ঞাসা করে, এ সব মেয়ে লোক দিয়ে কি করে রে ? কি কাজে লাগে ?

তা বুঝি তুই জানিস নে ? এখন একেবারে ন্যাকা সাজলি দেখছি। রানী করে সিংহাসনে বসিয়ে রাখবে ?

তবু—

কোনো জবাব না দিয়ে কয়লার মত কালো ছোকরা অস্বাভাবিক সাদা দুপাটি দাঁত বার করে হাসে।

পটল সজোরে একটা যেন ধাক্কা খায়। মাথাটা তার রিমঝিম করতে থাকে। অস্পষ্টে জাহাজের এক অশুভ সিটি তার কানে বাজে। কল্পনায় আসে রবার চাষের অনাত্মীয় দেশের কথা। তারপর চা বাগান। নেপালী গুজরাটি গোয়ানীজ সিংহলীর মধ্যে বাঙালী অহল্যা। রাত্রে পানের ছিবড়ে, দিনে বেদম খাটুনি। সবই টুকরা টুকরা শোনা কথা, পটল কিছু চোখে দেখেনি। তার যেন ঝিমঝিম লাগে।

সে বলে, টাকা না পেলে অহল্যা কোথাও যাবে না।

কেন ঐ যে পঁচিশ টাকা পেলি ?

বারে তা ওকে দিয়ে দিলে আমার আর কি রইল ?

কাল টাকা ফের পাচ্ছিস।

চালাকি পেয়েছিস আমার সঙ্গে—আমার নাম পটল।

ওরা যত এগিয়ে আসে, তত বচসা বাড়ে। দু জনের ভিতর পটলই বেশি ঝাঁঝাল কথার ছুরি চালায়। সঙ্গের ছোকরা বিব্রত হয়ে পড়ে।

হাজার টাকা হলেও অহল্যা তোদের মুখে লাথি মারবে না—যত সব ঠগবাজ বেইমান। কাজ যে গুছিয়ে দিচ্ছে তার মজুরী নেই।—পটল এখন আর ঠিক টাকার নিক্তি নিয়ে ঝগড়া করে না, তবু সেইটেই উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ওর মনের মান দণ্ডটা ঝুঁকে পড়েছে এক অসহনীয় মমতায়।—এই নে তোর আগাম, থুথু তোর টাকায়। অহল্যা যাবে না।—পটল টাকা কটা ছুঁড়ে দেয় পথের ওপর।

ছোকরা টাকা কটা কুড়িয়ে নেয় ঝুঁকে পড়ে।—একটু দাঁড়া—দাঁড়া পটল।

পটল দাঁড়ায় না। সে হন হন করে ছুটে চলে।

কথাবার্তা চালিয়ে আমাকে গেঁথে দিয়ে পালাচ্ছিস—ঠগবাজ কে রে, এখনো একটু ভেবে দেখ। ও পটল!

পটল ফেরে না। একবার যে কাঁটা তার থেকে সে কাপড় ছাড়িয়েছে, তাতে ফের জড়াতে চায় না। সে গতি বাড়িয়ে দেয়।

পিছন থেকে সেই ছোকরা আবার ডাকে দাঁড়ারে, দাঁড়া।

এবার আর সখের বুলবুলের শিষ নয়—পটল থামে না।

ছোকরা ছুটে আসে ক্রুদ্ধ মোটরের মত গর্জে।—আমাকে নাজেহাল করলে আমিও ছাড়ব না।—সে পটলকে জড়িয়ে ধরে নানাস্থানে দাঁত বসিয়ে দেয়।

পটল চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু তার মর্মভেদী চীৎকারে বিটের পুলিশের ঘুম ভাঙে না।

সকাল বেলা পটলই ঠেলে তোলে অহল্যাকে। অহল্যা ওর দিকে চেয়ে তো অবাক। সে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন।—একি রে ?

কিছু না। হ্যাঁরে তোর ফুলদি কেমন লোক ?

এ প্রশ্নের অর্থ অহল্যা সম্যক বুঝতে পারে না। বলে, মনে হয়ত ভাল।

তবে একবার সেইখানেই চল। এখানে তোর আর রাত কাটান ঠিক নয়।

দিনের প্রচুর আলোয় ভিতর অহল্যাও যেন অনেক কিছু দেখতে পায় স্পষ্ট। সে বলে, তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর।

তোর জন্ত ছোটদির একটু যাবা জমে ছিল, তাই না? ধরে-পড়ে দেখ যদি একটা কাজ কাম জোটে। আমাদের পথ তোর পথ নয়। তুই হচ্ছিস গেরস্ত ঘরের বৌ।

কিন্তু পথ চিনিয়ে নে যাবে কে?

আমি।

সারা শরীর পটলের ব্যথায় টাটাচ্ছে। জায়গায় জায়গায় ফুলে উঠেছে। তাই নিয়ে পটল অহল্যার শাড়িখানা কেঁচে দেয় সাবান দিয়ে। দুপুরের পর বলে, এখন চল।—সে অনেক উপদেশ নির্দেশ দেয় অহল্যাকে। ধরতে হবে বণ্টুর মত শক্ত করে।

অহল্যা ওঠে।

ব্যারাক বাড়ির গেটের কাছে এসে পটল বলে, আমি ভেতরে যাব না তুই যা এগিয়ে।

অহল্যা একটু দাঁড়িয়ে থাকে। একখানা হাত জড়িয়ে ধরে পটলের।

এখন যা—আমি চলি। ফের দেখা হবে।

অহল্যা অসহায়ভাবে ভিতরে ঢোকে। যেন তার পায়ের তলা দিয়ে খানিকটা জমি সরে গেছে।

পটল ভাবে এই পথেই তাদের সঙ্গে সেদিন এক হাড়গিলের দেখা হয়েছিল। কাল রাত্রের সেই কি মহাজন?

দশ

মাত্র দুটো দিন আগে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছিল অহল্যা। ভিখারী মেয়ে কতক্ষণই বা ছিল! কিন্তু তার মধ্যেই যেন মনে হয়েছিল এখানে প্রাণ আছে। নইলে আজ সে কিছুতেই আসতে পারত না। সেদিন তার ওভাবে পালিয়ে যাওয়ার কোনোই অর্থ হয় না। যেখানে এতগুলো লোক সেখানে আর একজোড়া নীল চশমা তার কি করত!

বড্ড ছেলেমানুষি করেছে অহল্যা। সে সলজ্জ পায়ে সেই ফুলগাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। দুদিনের ভিতর অহল্যা যতটা ম্লান হয়েছে, ডালিয়াটা তা হয়নি।

অহল্যাকে দেখা মাত্র বাড়ির ভিতর একটা সাড়া পড়ে যায়। মৌমাছির মত ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। পুষ্পির তো পড়ি কি মরি ভাব।—কি গো মেয়ে এ দুদিন ছিলে কোথায়?

পুষ্পি একেবারে কচিটি নয়। তাই এ ডেঁপোমি ভাল লাগে না অহল্যার। সে কোনো জবাব দেয় না।

তোমার কি মাথা খারাপ নাকি যে সেদিন ছুটে পালালে?

অহল্যা ইতি-উতি চাইতে থাকে, যদি কোনো বয়িয়সীর সঙ্গে দেখা হয়।

পুষ্পি আবার বলে, তোমার আক্কেল খুব—শাড়িখানা পেয়েই পিটটান।

রক্তাক্ত হয়ে ওঠে অহল্যা।

বাড়ির বৌঝিরা জোড়াতালি, নাটক নভেল—অথবা দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কেউবা জামা কাপড় ছেঁটে নিয়ে বসেছিল ছেলেমেয়ের। সাড়া পেয়ে উঠে আসে। অহল্যাকে দেখা মাত্র সবাই চেনে।

এসো এসো এদিকে।—কালো বৌ হাত ইশারায় ডাকে।

সেদিন অমন করে গেলে কেন?—জিজ্ঞাসা করে মিনতি।—এক মুঠো চালও তো নিলে না।

অহল্যা সবাইকেই দেখে। কিন্তু ফুলদি কোথায়? তাঁর তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিল। তবে কি তিনি এখানে নেই? দেখা না হলে কেমন হবে? নানা কথা ভাবে অহল্যা।

পুষ্পি আবার জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি সত্যি সত্যি কালিঘাট থাকো, না মিছেমিছি ভাঁওতা দিয়েছ? তোমার চোখ মুখের ভাব তো ভাল নয়।

কনকদি বলেন, তুই সর দেখি পুষ্পি—তোর কথাবার্তা ভাল না। আর কিছু বললে মার খাবি পাজি মেয়ে।

বেলা প্রায় চারটা। পশ্চিম দিকের ঘরগুলোর সুমুখে ছায়া পড়েছে লম্বা। মাঝে মাঝে এক-এক ঝলক হাওয়া। প্রজাপতির মত সিজন ফ্লাওয়ারগুলো কেঁপে ওঠে। দু একটা ডালিয়া মাথা দোলায়। শিউলি ফুলগাছটার পাতায় মৃদু বোল বাজে।

এত বড় একটা বাড়ির সমগ্র কৌতূহল অহল্যাকে কেন্দ্র করে। অহল্যা সপ্রতিভ হয়ে থাকে। তাকে সবাই মিলে ডেকে এনে ছায়ায় বসতে দেয়। কনকদি জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছ?

এ প্রশ্ন ভিখারিণী মেয়ের জন্য নয়—এ যেন কোনো আত্মীয়ার অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসা। অহল্যা অভিভূত হয় বলে, ভাল।

অমন করে পরশু দিন চলে গেলে কেন?

অহল্যা নখে মাটি খুঁড়তে থাকে।

কালিঘাটে কোথায় থাকো?—কালো বৌ প্রশ্ন করে।

এক দালানে।

পুষ্পি হেসে বলে, দালান কাকে বলে তাকি তুমি জানো?

কনকদি মন্তব্য করেন, পুষ্পির মা তোমার পুষ্পিকে নিয়ে যাও তো—নইলে ও মার খেয়ে মরে যাবে। বয়েস একেবারে কম নয়, কিন্তু কথা-বার্তার আদব-কায়দা মোটেই শেখেনি।

সকলে ধমকে পুষ্পিকে সরিয়ে দেয়। অহল্যা কি দালানে বাস করে তা খুলে বলে।

কালো বৌ জিজ্ঞাসা করে, রান্নাবান্না?

ফুটপাতে।

আবার পুপ্পি এসে হাজির হয়েছে। সে প্রশ্ন করে, জলকল পাইখানা?

এবার কনকদি উঠে মারতে যান।

অহল্যা বাধা দেয়।—ওকে কিছু বলবেন না, ও ছেলেমানুষ। ছোটবেলা আমরাও অমনি ছিলাম।—এরপর সে জলকলের কথা বুঝিয়ে বলে, কিন্তু তার পরেরটা যে কি করে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে নীরব থাকে। সভ্য সমাজে তা বলার নয়।

সকলের মুখ লজ্জায় নীচু হয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। অহল্যা মনে মনে সংকোচ বোধ করে। সে আবার চোখ তুলে ফুলদিকে খুঁজতে থাকে। তাঁর ঘরের সুমুখেই তো সে এত সময় বসে।

কনকদি ভাবেন, সেদিন অহল্যাকে একখানা শাড়ি ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয়নি। অবশ্য সেই পালিয়ে গিয়েছিল—আজ যদি সে ক্ষোভটা পূর্ণ করা যায়। কিন্তু এ বাড়ির বৌরা এখনো হয়ত তিলের জ্বালা ভোলেনি, ভোলেনি তার চাঁদা ট্যাক্সোর কথা। তেমন কিছু কি তারা দিতে স্বীকার করবে?

অহল্যা তুমি কি কিছু খাবে?

অহল্যা মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানায়।

উৎপলা বলে, ভাল আপ্যায়ন! এ ভাবে সমাদর করলে কেউ কি খেতে চাইতে পারে?

কনকদি একটু লজ্জিত হন। ওর জন্য দোকান থেকে একটা অনুষ্ঠান করে খাবার আনাও দায়। এতগুলো লোকে দেখবে—দিতে গেলে আনা দশেকের কমে ছোট্ট একটা প্লেটও ভরবে না। বাড়ি এসে হিসেব চাইলেই বা কি জবাব দেবেন তখন? দিয়ে তো গেছেন মাত্র একটি টাকা ঘুশ ঘুঁটে কিনতে।

কনকদি পুপ্পিকে ডেকে নিয়ে যান একান্তে।

কি মাসী?

দু আনার আধখানা নারকেল আনবি, আর দু আনার চিঁড়ে। চট করে ছোট বাজার থেকে ঘুরে আয়। একা একা যেতে ইচ্ছা না করলে তোর বন্ধু রমাকে ডেকে নিয়ে যা।

এমন একটা সভা ছেড়ে যেতে সে যথেষ্ট মোড়া-মুড়ি করে।—আর কারুকে বলুন, আর কারুকে। আমি পারব না।

না, তুই ছাড়া ভাল নারকেল কেউ কিনে আনতে পারবে না।

অগত্যা পুপি টাকাটা নিয়ে চলে যায়। কনকদি ভাবেন, এ চার আনায় এক রকম গোঁজামিল দেওয়া যাবে। দেড়শ খুঁটেকে দুশ বলে চালিয়ে দেওয়া খুব কঠিন হবে না। দেশ গাঁ ছাড়ার পর স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে, বিশ্বাসে এমনিই তো মাঝে মাঝে পঞ্চাশ-খানায় খাদ মিশাতে হচ্ছে!

ইরা-মিলি-ইলা-কালোবৌ সবাই একটু এদিকে আয় তো? একটা পরামর্শ আছে।

কনকদির ডাক শুনে সবাই উঠে এগিয়ে যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা শুধু থাকে অহল্যার কাছে। কনকদিকে সবাই ঘিরে ধরে। মিনতি বলে, দাঁড়াও ছেলেটাকে নিয়ে আসি। ঘুম থেকে উঠে কাঁদছে।

একটা কথা বলব, রাখবি?

কালো বৌ বলে চাঁদা দিতে হবে বুঝি?

নারে, না।

তবে এমন কি পরামর্শ আছে যে আমাদের ডেকেছ?

আছেরে, নইলে কি এমনি এমনি ডাকি? একটা গুরুতর কাজে সবাইকে ডাকতে হয়, বুদ্ধি নিতে হয় সকলের।

চাঁদা ছাড়া সবটাতে আমি আছি।

তোর ঐ এক গোঁ, তবু শোন।—কনকদি কালোবৌর হাত ধরে টেনে নিকটে বসান।

এমন সময় অহল্যা এসে বলে, আমি চলি।

সকলের সন্দেহ হয়—ওর কি মাথাটা ঠিক আছে?

অহল্যার কোনো দোষ নেই। বড়রা উঠে গেলে অহল্যা ছোটদের ঝাঁকে একটা ঢিল ছুঁড়েছিল আন্দাজে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়নি। ফুলদি নাকি তাঁর এক ভাইপোর কাছে গেছেন চিঠি পেয়ে—যে ভাইপোর রূপ একমাত্র অহল্যার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে—যার চোখের চাহনি বোধহয় অহল্যাকেও হার মানায়।

এ কথা শুনে ঈর্ষায় নয়, বিস্ময়েও নয়—কেমন যেন গুমটের ছায়া নেমে এসেছে অহল্যার মনের আকাশে।

সে উঠে গেছে।

কনকদি বলেন, তুমি ওকি কথা বলছ? যাও বসগে। কালিঘাট আর ক পা! এখনো ঢের বেলা আছে।

জলা থাকলেও অহল্যা পার হয়ে কোন পাড়ে যাবে? এপাড় তার ভাঙা, ওপাড় যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন। আবার গিয়ে সে জায়গা মত বসে।

পুস্পি এসে বলে, এই নিন।

কনকদি বলেন, আমার হাতে না দিয়ে, একটু ভিজিয়ে দেগে চিঁড়েগুলো।—একটু বাদেই আমি যাচ্ছি। যা—।

কি মুস্কিল!

অনিচ্ছায় পুস্পি চলে যায়।

দেখ বৌরা, মনে হচ্ছে মেয়েটা ভাল—হয়ত কোনো গৃহস্থের বৌ, হালে বাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে। এখনো ভাল করে হাত পাততে শেখেনি। সবাই মিলে চেষ্টা করলে ওকে একটু বিশেষ ভাবে সাহায্য করা যায়। যে যা পারিস দে—কাপড় পয়সা চাল কোনোটায় আপত্তি নেই।

কালো বৌ বলে, আমার আপত্তি আছে। যদি ঠগ জোচ্চোর হয়। কলকাতা সহর কিছুই বিচিত্র নয়। সেবার সেই মনে আছে?

সে একটা কাহিনীই ফেঁদে বসে।—

অমনি একটি অল্প বয়সী বৌ এসেছিল আলতা ফেরি করতে। কম দামী হলেও বেশ গোছগাছ শাড়ি পরা। পায় এক জোড়া স্যাণ্ডেল। চোখে সূক্ষ্ম সুর্মার টান। সে নাকি এক কোম্পানীর মেয়ে এজেন্ট। নাম অসীমা চাটার্জি। সে প্রায় কেঁদে কেটে আট আনার মাল বার আনায় প্রত্যেক ঘরে দুটো একটা গছিয়ে দিয়ে গেল।—আপনাদের দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ—নমস্কার।...

সময় মত পায় দিয়ে দেখা গেল, শিশিগুলো বোঝাই আলতা নয়, এক রকম ভ্যানিসিং লোশন।

কনকদি জবাব দেন, আঠার কুড়ি বছর আগে ভদ্র ঘরের মেয়েদের এমন সব ছোটখাটো নোংরা কাজ করতে কেউ দেখেনি—সমাজ যত ভাঙছে পাপও তত বাড়ছে। তা বলে মানুষ কি মানুষের উপকার করবে না?

কালো বৌ বলে, ঠগ জোচ্চোরকে আস্কারা দেওয়ার মধ্যে আমি নেই। অত ফালতু পয়সা আমার স্বামী রোজগার করে না।—সে সভা ছেড়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে যায় যে অত আলগা মায়া নাকি তার নেই।

দেখ তোরা কালোবৌর বুদ্ধির দৌড়টা। অহল্যা কি কোনো জিনিস বেচে

দাম নিতে এসেছে নাকি? ওকে কিছু দিলে আমরা ইচ্ছা করেই দেব এখানে কি হার জিত ঠগ্ জোচ্চোরির কথা উঠতে পারে? যার ঘটে বিধাতা কিছু দেন না, তাকে বোঝান কঠিন।

দূর থেকে কালোবৌ কণ্ঠ তুলে বলে, আমি বোকা আছি, ঘর বসেই বোকামি করব—তা বলে আর ফাঁদে পা দেব না। সেবার আমি তিন তিনটে আলতা কিনেছিলাম তোমার আর ফুলদির সুপারিশে।

এ বাড়ির সবাই ঠকেছে, কিন্তু কালোবৌর কথায় কেউ না হেসে থাকতে পারে না।

শুধু ম্লান মুখে বসে থাকে অহল্যা। সেই আলতা বেচা মেয়েটির সমস্ত গ্লানি এসে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে। যে জীবনে কিছু করেনি, সে-ই যেন মুখ তুলতে পারেনা।

বেলা আর একটু শেষ হয়ে আসে। ব্যারাকের ছায়া আর একটু প্রলম্বিত হয়। অহল্যা চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেদিনের মত তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। এক ছুটে গেট, তারপর রাস্তা। এবার সে পথ চিনে এসেছে। হাবুলদের ওদিকটা সে অনায়াসে এড়িয়ে যেতে পারবে।

আপিস ফেরৎ রাধাকান্ত বাবু বাড়ি এসে ঢোকেন। ইনিই প্রথম আগন্তুক। এবার একে একে সবাই এসে ঢুকবেন। বৌরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিকালের চা জল খাবার কেউ কিছু গোছাতে পারেনি।

আমরা যাই তা হলে?

কনকদি বলেন, কি করবি তোরা? কালো বৌর তো উক্তি শুনলি।

তুমি যা করো তাতেই আছি। ওর কথা হিসেবে ধরো না।

কে কি দিবি?

সবাই বলে, একটু পরে—ওকে একটু বসতে বলো। আমরা এলাম বলে।

আর একটু বাদেই সন্ধ্যা। তবু উপায় নেই। কনকদিকে বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। বাক্স পেটারা খুলতে বৌদের একটু তো সময় এবং সুযোগ দেওয়া চাই।

অহল্যা ভাবে আর নয়—এবার কে যেন তাকে ধৈর্যের সীমান্তে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। সে হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সেই সময়ই কনকদি তার একখানা হাত ধরেন।—এসো চিঁড়ে কটি মুখে দেবে চলো। খাবারটুকুর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।

এখন আমি যাব না।

সেকি হয়—চলো।

অহল্যা বাধ্য হয়ে কনকদির পিছন পিছন হাঁটে। বারান্দায় সারি দিয়ে সব ছেলেমেয়েরা বসেছে। তারই এক পাশে অহল্যাকে বসিয়ে দেন কনকদি। উজ্জ্বল আলোতে সুন্দর দেখায় অহল্যাকে। একটু একটু যা সপ্রতিভ ভাব নইলে এই চাষীর বৌ অনায়াসে মিশে যেত মধ্যবিত্তর সংসারে।

ওকে একটু বেশি করে নারিকেল কোরা দিস।

ছোট ছেলেমেয়ে দুটি একটু চোখ পাকিয়ে অহল্যার দিকে তাকায়। অবশ্য মুখে কিছু বলে না। অহল্যাকে এক কাপ চাও দেওয়া হয়। সে কুন্ঠিত চিত্তে খেতে সুরু করে। এ সময় এটা-ওটা নিয়ে রোজ যেমন হৈ চৈ হয়, আজ তা হয় না। সকলে ভব্য সভ্য হয়ে খাওয়া শেষ করে।

এমন সময় কনকদির স্বামী ঋষিদাস বাবু এসে ওঠেন। একটু কড়া প্রকৃতির রাশভারী মানুষ তিনি। ছেলেমেয়েরা উৎকন্ঠিত হয়ে ছুটে যায়। একজনে বাজারের রেশন ব্যাগটা, আর একজনে ছাতি, মিলি বড় বড় পাউরুটি দুখানা হাত বাড়িয়ে ধরে। তবু ঋষিদাস বাবুর মেজাজটা একটু খিঁচড়ে যায়। ঠিক ওঁর আফিসের বেয়ারার মত এরা গুছিয়ে ধরতে পারেনি। তিনি জুতো খুলে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করেন, ওটি কে?

বড় মেয়ে মিলি বলে, একটি ভিখারী বৌ।

তোর কাছে কে জিজ্ঞেস করছে!

মা, বাবা ডাকছে তোমায়।—বলে বড়মেয়ে মিলি সরে যায়। সে পড়তে বসবে। আগামীকাল তার একটা অঙ্কের পরীক্ষা আছে।

কি ডাকছ কেন?

আজ বুঝি চা-টা কিচ্ছু হয় নি?

কেন হবে না? সবাই খেয়েছে। ঐ তো তোমার জন্য কেটলিতে ফুটছে গরম জল।

লাগবে না—ও আমি জানি। সেকালের ভক্তি শ্রদ্ধা এখন আর নেই।

কি করে বুঝলে? কোনটার অভাব পেয়েছ শুনি। সবই তো সাজান গোছান। এখন হাত পা ধুয়ে আসারই যা দেরী দেখছি।

হুঁ—বুঝেছি বুঝেছি। আমার মা কিন্তু এমন ছিলেন না।

তা আমার জানতে বাকি নেই। সে ছাড়া আমি তোমার মা নই।

ঋষিদাস বাবু সুবিধা না করতে পারলেও গনগন করতে করতে হাত পা ধুতে যান। ইদানীং তাঁর মনে একটা ধারণা পাকা হয়ে গেছে যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সংসারের প্রতি তেমন আর আসক্তি নেই। ছোকরা বয়াটে জুনিয়ারগুলোর মত দৈনিকের ফাইলে কেবল গোঁজামিল দিয়ে চলেন! তাই মাসে তিনশর জায়গায় চারশ এলেও সংসার কাঁপে না।

ফিরে এসে ঋষিদাস জিজ্ঞাসা করেন, ওটি কে?

তোমার দরকার?

বাড়িতে এসেছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না? দেখতে তো সুন্দর।

বুঝেছি, তাই জিজ্ঞাসা। নইলে হয়ত ফিরেও চাইতে না।

কে?

একটি ভিখারী মেয়ে।

তা হক—ঋষিদাস তাড়াতাড়ি চা জলখাবার খেয়ে বার হন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেন অহল্যার আদ্যপান্ত।

এমন সময় ঘর ঘর থেকে কাপড় চাল কিছু টাকা পয়সা বার হয়। কনকদি উৎফুল্ল হয়ে বলেন, এই নাও অহল্যা।

স-সংকোচে অহল্যা বলে, ওদিয়ে আমি করব কি? রাখব কোথায়?

সবাই আশ্চর্য হয়ে যায়। ইলা বৌদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে তুমি কি চাও?

অহল্যা আবার নিচের দিকে চেয়ে থাকে।

পুম্পি বলে, মাটিতে তো লেখা নেই।

এবার ইলা বৌদির হাতে মার খায় পুম্পি। বড্ড বাড় হয়েছে তোর।

অহল্যা বলে, ফুলদি কোথায়?

তিনি থাকলেও তো তোমায় রাতারাতি একটা রাজত্ব গড়িয়ে দিতে পারতেন না। কি যে বলো তুমি?—কনকদি চুপ করেন।

অহল্যা বলে, আমি একটু আশ্রয় চাই।

ইলা বৌদি প্রশ্ন করেন, কেমন আশ্রয়?

চিরদিনের মত কোনো সংসারে থাকতে চাই—খেটে-খুঁটে খাব, আর নড়ব না। রাস্তায় লজ্জা বাঁচান দায়। কি ভাবে যে এ কটা দিন কেটেছে আমার!

আবার সব বৌরা অহল্যার মুখের দিকে তাকায়। সকলের সামর্থ নেই, যাদের আছে তাদের বুকের রক্তও হিম হয়ে যায়। অহল্যার কথায় কেউই কোনো জবাব দেয় না।

এগার

গতকাল চিঠি পেয়েই ফুলদি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন—আপন না হলেও তাঁর বড্ড স্নেহের ভাইপো। অমন সুন্দর বলিষ্ঠ গঠন সুপুরুষ তাঁর নজরে পড়েছে কম। কথাবার্তা কি মিষ্টি—যেন মধু ঝরে পড়ে। হাসে অদ্ভুত উদার হাসি। কিছুদিন সত্যবন্ধু এখানে ছিল। তার হাসির শব্দ এখনো কানে বেজে আছে ফুলদির। এত বিনয় এবং বিবেচনা ফুলদি আর কোথাও দেখেন নি।

কি-ই বা তার বয়স! এই ত্রিশের কোঠা এখনো বুঝি ছাড়ায়নি। এর মধ্যেই রোগে ধরল তাকে। ধরবে না কেন? অত্যাচারে অবিচারে সবই হয়। মানুষের শরীর তো!

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।

ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটা হল জড়ো।…

শুধু এই কটা লাইন নয়—আগাগোড়া সমস্ত কবিতাটা বারবার ঘুরে ঘুরে মনে আসে ফুলদির। সত্যটা আবার ফাঁকি দিয়ে না যায় বিনুর মত।

ভিতর থেকে ডাক পড়ে, শোনো দেখি?

কি আবার শুনব, সবই তো হাতের কাছে গোছান আছে। যেটা দরকার একটু হাত বাড়িয়ে নাও। চোখ নেই,—তা বলে তো নুলো নও।

তা নয়—কে চিঠি লিখেছে?

তোমার দরকার? তুমি কি পড়তে পারবে?

না-ই বা পারলাম, কিন্তু শুনতে তো পারব। কিসে লিখেছে—খামে, না পোস্ট-কার্ডে?

খামে। বলেই ফুলদি একটু হাসেন।

খামে আবার কেন—পোস্ট-কার্ডই তো যথেষ্ট। এত পয়সা নষ্ট করলে তার কি দুর্গতি না হয়ে পারে!

তোমার এ দুর্গতি কেন? তোমার তো কত হিসেব। কে লিখেছে, কেন লিখেছে, কিসে লিখেছে, তা তোমার কাছে এ বয়সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই। তোমার কাশের ডাবর বেড্‌প্যান পেতে কি কষ্ট হচ্ছে? তারপর তুমি আমার কাছে আর কি চাও?

ঝনাৎ করে একটা পানের ডিবে উঠানে এসে পড়ে। অবজ্ঞার হাসি হেসে ফুলদি সরে যান। ঘরের ভিতর ওঝা যেন ভূত তাড়াবার মন্ত্র পড়তে থাকে।

সত্য চিঠি লেখেনি—চিঠি লিখেছে তার এক সহকর্মী ডাক্তার বন্ধু।

কিছুদিন পর্যন্ত সত্যবন্ধু নাকি বিশেষ পীড়িত। সে কোথাও যেতে চাইছে না বা ভাল চিকিৎসা-পত্রও করাচ্ছে না। তাকে এসে একবার দেখে যাওয়া উচিত, নইলে ভবিষ্যত শুভ নয়। এখানের জলটা কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না সত্যবন্ধুর—পেটের পীড়ায় ভুগে একেবার আধখানা হয়ে গেছে। সে বলে যে চিকিৎসা করিয়ে কি হবে? আসল চিকিৎসাই হচ্ছে পথ্যাপথ্য। হোটেলে মেসে চাকর ঠাকুরের অনুগ্রহে তা তো হবার জো নেই। আপনাকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে—যদি কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তা সময় থাকতে করাই ভাল।

মিঃ ডাসকে দেখে গতকাল অহল্যা ছুটে পালিয়ে গেল। ফুলদির ইচ্ছা ছিল কালিঘাট গিয়ে তার একটা খোঁজ নেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই চিঠি। তিনি বৃদ্ধ স্বামীর সমস্ত ব্যবস্থা করে, মিঃ ডাসকে খবর পাঠালেন।

আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

কোথায়?

বাঁকুড়ার শেষ সীমায়।

আমি ভেবেছিলাম রসাতলের।

আপনাকে নিয়ে? জগতে আর লোক নেই? ফুলদির চোখের তারা দুটিতে একটু অবজ্ঞার হাসি খেলে যায়। মিঃ ডাস তা গায় মাখেন না।

হঠাৎ ওখানে কি দরকার?

আমার এক ভাইপো অসুস্থ। তাকে দেখতে যাব, তেমন বুঝলে সঙ্গে করে নিয়ে আসব। ছেলেটি বড্ড ভাল। দেখলেই বুঝতে পারবেন পিলীমা অন্ত প্রাণ।

দেখার প্রয়োজন নেই—অনুমানেই সব বুঝতে পেরেছি। কটায় ট্রেন?

তা তো জানিনে। এই ঠিকানা। আপনি রাস্তা ঘাটের সব খোঁজ নিয়ে আসবেন। কত ভাড়া তাও জেনে আসবেন কিন্তু। শুনেছি নাকি পাহাড়ী রাজ্য। আশ-পাশে কোথাও—মানুষ নেই। এখানে-ওখানে শুধু দু-চার ঘর সাঁওতালের বাস।

কিন্তু আমার যে কাজ আছে।

কি কাজ?

একবার ভেবেছিলাম অহল্যার খোঁজে যাব।

এ ইচ্ছা ফুলদিরও ছিল। তিনি তা মিঃ ভাসের কাছে ব্যক্ত করেননি। হয়ত ফুলদিই মিঃ ভাসকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। কিন্তু মিঃ ভাসের তরফ থেকে যখন কথাটা এল, তিনি ছুরির ফলার মত কচ্ করে প্রশ্ন করে বসলেন, কেন?

সত্যি সত্যি ওকে উদ্ধার করার মহান ব্রত নিতে চাই। It is my honest sacred duty.

ফুলদি রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, মানে?

ফুলদির স্বামীর ঐ অবস্থা। সন্তানের কোনো বন্ধন নেই। সংসার তাঁর কাছে ঊষর ধূসর কঙ্করময় দেশ—সেখানে মেঘ নেই, জল নেই—না আছে কোনো আকর্ষণের ইন্দ্রধনু। তিনি রমণী—ধরণী, অথচ বন্ধ্যা বলে অপাংক্তেয়। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ নেই তাঁর বিরুদ্ধে। তবু তিনি গোবী মরুভূমি নয়ত সাহারা। তাই হঠাৎ কোনো যাযাবর মেঘ আসলে তিনি উন্মুখ হয়ে থাকেন। তাঁর নারী প্রকৃতিকে সংযত করতে পারেন না। তাই তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে মিঃ ভাসকে আবার প্রশ্ন করেন, মানে?

ভাবছিলাম অভিমান করে সেই সায়লেণ্ট যুগের শেষ থেকে সিনেমার সম্পর্ক ছাড়াটা ভাল হয়নি। ব্যবসা বলতে আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবসা সিনেমা। রুচি বলুন, কৃষ্টি বলুন, সাংস্কৃতি বলুন - সবই কন্ট্রোল করছে সেলুলয়েডের রিলে। এক কথায় বলতে গেলে এ হচ্ছে সেলুলয়েড সভ্যতা। এতদিন লেগে থাকলে আমি একজন ধারক ও বাহক হতে পারতাম—সে প্রমিস আমাতে ছিল। কিন্তু অভিমানে কিছু হল না।

তার সঙ্গে অহল্যার কি সম্পর্ক ?

রামচন্দ্র পাষাণ উদ্ধার করেছিলেন পা ছুঁইয়ে। কিন্তু আজ ছোঁয়াতে হবে পয়সা—সে পয়সা আমার নেই। তাই অহল্যাকে যেমন খুঁজে বার করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন একজন ক্যাপিটালিষ্টকে ঘায়েল করা। কে জানে একদিন হয়ত এই অহল্যাই জেনেভায় যাবে এক মিশনের রূপসী নেত্রী হয়ে। দিন দিন ইউ, এন, ও-র যেমন চেহারা বদলাচ্ছে, তাতে করে একদিন প্রেম ছাড়া অন্য কিছুর আলোচনা ওখানে হবে না। তখন প্রেসিডেণ্ট মার্শালদের কেউ ডাকবে না। অভিনেত্রীরাই হবে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। আজ আমি যে অহল্যাকে. উদ্ধার করতে চাইছি, সেই তখন উদ্ধার করবে শত শত। অহল্যা পুরুষদের। দেখবেন আগামী সপ্তাহে এ কথা আমি রূপশিল্পী পত্রিকায় ফ্ল্যাস করব।

তা হলে আপনি থাকুন, আমি অন্য কাউকে নিয়ে রওনা দি।

না, না আপনি রাগ করবেন না। আপনার জন্যও একটা ভাল রোলের বরাদ্দ রাখব। কাল সারারাত আমি অনেক কিছু ভেবেছি। আমি জগতে বিশ্বপ্রেম ছাড়া আর কোনো প্রেমবাদে বিশ্বাস করি নে।

ওসব কচকচানি রেখে তবে এখন তৈরী হয়ে নিন। বাড়ি যাবেন, না এখানে খাবেন ? রাস্তা, ঘাট, ভাড়ার কথা কি ভাবে জানবেন ?

একবার তালা মেরে আসতে হবে দোতলায়। পথের কথা পথে বসেই হবে। এ আর সাত সমুদ্দুর পারের দেশ নয়।

হ্যাঁ আপনি তো আর কোনো সংসার ঝামেলা করলেন না—আপনার আর কি! আমাকে এক পা নড়তে হলে—কি আর বলব যেন কুরুক্ষেত্রের আয়োজন। তবু কি ছাই হতে চায়! কত বায়না, কত ঝামেলা, কত কৈফিয়ৎ। ইচ্ছা করে যেন আর না ফিরি।

দুপুরের একটু আগে ট্যাক্সিতে এসে বসেন ফুলদি ও মিঃ ডাস। একটি হোল্ডঅল এবং একটিমাত্র স্যুটকেশ। প্রবাস যাত্রার একেবারে সংক্ষিপ্ত উপকরণ। মিঃ ডাস হ্যাংলা হলেও কৌমার্যের ধ্বংসমুখি একটা শ্রী রয়েছে তাঁর মুখে। একটু বিশেষ করে তলিয়ে দেখলে তা নজরে পড়ে। আজ ভাল করে সেভ্ করে একটু পাউডারের মিহি প্রলেপ লাগিয়েছেন মিঃ ডাস। তাই আরো স্পষ্ট হয়েছে সে রূপ। আর ফুলদি তো দিবসান্তের অস্তরাগ শিখা।

বেশ্ স্পীডে চলেছে মোটর।

মিঃ ডাস বলেন, আপনার ইচ্ছা মত আর যদি না ফিরি, কেমন হয়?

একটু মুখ ঘুরিয়ে ফুলদি বলেন, ঠিক এমনি। একটা প্রশ্ন শরৎচন্দ্র বার করেছিলেন তাঁর এক নায়কের মুখ দিয়ে। নায়িকা কমল কি বলেছিল জানেন?

মনে নেই। অনেকদিন আগে পড়েছি কিনা!

হয়ত আদৌ পড়েন নি। সে তো ভুলে যাওয়ার মত কথা নয়।

এখন আপনি স্মরণ করিয়ে দিন।

তখন তারা ট্যাক্সিতে ছিল না—ছিল প্রাইভেট একটা মোটরে। এমনি হয়ত নরম গদি। কিন্তু এমন ইট কংক্রিটের পরিবেশ নয়। সেকালের দিল্লীর প্রান্তসীমায় কিম্বা তাজমহলের নিকটে। আমারও সঠিক মনে পড়ছে না সব।

তবে স্মরণ থেকে সে নায়িকার কথা উদ্ধার করে না বলে, আপনার জবাবটাই পেশ করুন।

ফিরতে তো চাইছেন না, খরচ কি পোষাতে পারবেন? জ্যোৎস্নার খরচ নয়, পেতলের বাটির কলঙ্ক তোলার মাসুল? সে ব্র্যাস্ পলিসের অনেক দাম।

মন তো সে সব হিসেব করতে চায় না।

সেই হিসেব করেই তো চুল প্রায় পাকল। আর মিথ্যে ভাষণ কেন? এ বড় শক্ত অডিট মিঃ ডাস!

মিঃ ডাস একটা নিশ্বাস ছাড়েন। মুখে কোনো জবাব দেন না।

অনেক ট্র্যাফিক কাটিয়ে ট্যাক্সিটা এসে হাওড়া ব্রিজে ওঠে। দূরে দূরে পণ্যবাহী পোত, ভাসমান ডক, রেল ইয়ার্ড, নভস্পর্শী চিমনি শীর্ষ। তারই বিপরীত তীরে, মাটি গর্ত, সৈন্যাশ্রয়। ট্যাঙ্ক বন্দুক মেসিন গানে সুসজ্জিত। প্রয়োজনে উর্ধ্বাকাশে ঘূর্ণায়মান এয়ারোপ্লেন হাইড্রোজেন বম নিয়ে প্রস্তুত। হাওড়া ব্রিজে অগণিত নাট বল্টু, লক্ষ লক্ষ স্ক্রু। মানুষের সভ্যতার চরম প্রাপ্তি নজরে পড়ে মিঃ ডাসের। আর ভেঙে চুরে নড়ে যাওয়ার জো নেই। নদী স্রোত পাষাণ প্রাচীরে শৃঙ্খলিত। আর ভয় নেই বন্যার। এরপর মানুষেরও বুঝি চাওয়ার ও পাওয়ার কিছু নেই।

ঝমঝম করে যেন ইস্পাতের করতাল বাজিয়ে ট্যাক্সিটা এগিয়ে চলে।

শুধু মিঃ ডাস কোন দিকে যেন চেয়ে থাকেন।

ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন, চুপ চাপ যে?

এমনি।

ট্যাক্সিখানা এসে হাওড়া স্টেশনে ব্রেক করে। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, মিঃ ডাস এগিয়ে যান। কুলীর মাথায় বিছানা স্যুটকেশ। ফুলদি পিছনে।

এখানে একটু দাঁড়ান, টিকিট কেটে আনি।

কত ভাড়া?

জানি নে। কাউণ্টারে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব।

মিঃ ডাস দুখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে আনেন।

একি, এত টাকা পেলেন কোথায়? আমি তো আপনাকে অত দেইনি।

ভেবেছেন আমি কি একেবারে দেউলিয়া? এখনো যা গচ্ছিত আছে, তা এ বেডানর ব্যালেন্স মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট।—মিঃ ডাস হাসি মুখে এগিয়ে চলেন।—আসুন!

ফুলদি তাকে অনুসরণ করে একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে ওঠেন। কয়েকটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যাত্রী ছিল তারা কয়েকটা স্টেশন বাদে নেমে যায়। একজন বম্বেওয়ালা ঐ কামরায়ই উঠবে ভেবেছিল, কিন্তু কি চিন্তা করে যেন পাশের গাড়িতে আশ্রয় নেয়। মুনিবজীর ফসিটা গুছিয়ে দিয়ে সঙ্গের চাকরটা ভিন্ন গাড়িতে গিয়ে হাঁফ ছাড়ে।

ফুলদি দেখেন ক্রমে চেহারা বদলাচ্ছে বাঙলা দেশের। নদী মাতৃক পূর্ব বাঙলার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। এখানে জল নেই, মাটি তেমন সবুজ শ্যামলে সমৃদ্ধ নয়। কাঁকর পাথর পাহাড়ী রুক্ষতা আসছে ক্রমে। বহুদূরে নীল বন রেখা। তারপর শ্বাপদ সংকুল অরণ্য। বাঙলার লাবণ্য বদলাচ্ছে। সবুজে নীলে আকাশ পাতাল ব্যবধান। দু চার জন মানুষ যাদের দেখা যাচ্ছে, তাতাও যেন পোড়া, ছেই মারা—নয়ত তামাটে। জলহীন দেশের জীবন যাত্রাও যেন নির্মম।

এমনি হয়ত চেহারা বদলে গেছে সত্যবন্ধুর।

এ সকলি তার অসামান্য উদারতার পরিণাম। কলকাতায় নিজেদের কত বড় বাড়ি। কতখানি জায়গা জুড়ে বাগান। বাপ মার মৃত্যুর পর সে এসব অনায়াসে ত্যাগ করে দিয়ে এসেছে। এক তৃতীয়াংশের সে মালিক। আপুষে ভাইদের কাছ থেকে যে টাকা পয়সা পাওয়া সম্ভব ছিল, সে দাবীও তার মনে কখনো রেখাপাত করে নি। একটু মন কষাকষি হয়েছিল বৌদিদের সঙ্গে। ভাইদের কাছে সে তা ব্যক্ত করেনি। নীরবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে প্রায় একবস্ত্রে। নিজে বিয়ে করেনি, করবার মত

সাহসও তার নেই। অতএব সে যে আর ওখানে ফিরে যাবে না, তা সে জানে। তবু তার দুঃখ নেই। এমন সন্ন্যাসীমনা মানুষ সংসারে বিরল। নইলে তার টাকা পয়সারই বা অভাব কি, চিকিৎসা পত্র জলবায়ু খাবারদাবার বা অসুবিধা হবে কেন? মাইনে যা পেয়েছে, তার একটি কপর্দকও জমেনি। ফুলদি অনেক বলেছেন, বুঝিয়েছেন যে কিছু কিছু সঞ্চয় করা উচিত। ভাল মন্দ সময় অসময় আছে, সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত হিতোপদেশ।—আমার আবার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স!

পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে নাকি একটু করুণা করেছিল সত্যবন্ধু। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, গরিবের মেয়ে। ফি দাখিল করতে পারে না। সত্যবন্ধু নাকি সাহায্য করেছিল। মেয়েটি জানালা গলিয়ে চিঠি দিয়েছিল তার দৈন্য ও অনুরোধের অবগুণ্ঠন তুলে। সত্যবন্ধু তারপর মাইনে পেয়েই নাকি কলেজে গিয়েছিল বৌদিদের না জানিয়ে। সেবার আর ঠিকঠাক মত বরাদ্দের টাকা বুঝি দিতে পারেনি সংসারে। বৌদিরা ওতে ওতে রইল। কেসটা আস্কারা করতেই হবে। ভাইরাও ইন্ধন জোগাল মাসিক বাজেটে এতবড় একটা ঘাটতি দেখে।

একদিন একখানা ধন্যবাদপত্র ধরা পড়ে গেল। সেই থেকেই সত্যবন্ধু গৃহত্যাগী। ফুলদি সমস্তই জানেন—কতক সত্য কতক মিথ্যা, কতক উগ্র রঙ চড়ান। মেয়েটির জন্য কি যেন কি কারণে একটু সমবেদনা হলেও, তিনি সত্যবন্ধুকে তিরস্কার করেছেন। নিজের কাছে কিছুদিন বেঁধেছেন। সেবা যত্ন করেছেন পরম প্রিয়জনের মত। তবু যেন সত্যবন্ধু একটু দূরে রয়ে গেছে। ব্যবধান রেখেছে স্নেহভাজন বিনীতের মত। ফুলদি আহত হয়েছেন।

এখন আবার তিনি ছুটে চলেছেন তারই উদ্দেশে সেবা ও সহানুভূতির অঞ্জলি নিয়ে। নিজের কাছেই এসব যেন বিসদৃশ ঠেকে ফুলদির।

সন্ধ্যায় একটু আগে মিঃ ডাস বলেন, অনেক কিছু তো ভাবলেন, এবার নামুন গাড়ি বদল করতে হবে। এদ্দূর যখন এসে পড়েছেন, তখন আর ভেবে লাভ কি?

সত্যি বেলা গেছে। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। দিগন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে রক্তিম রাগে। এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন গাছপালা কাঁটা জঙ্গল। তেমন ঠাস বুনানি লতাগুল্ম আগাছা আর নজরে পড়ে না। স্টেশন থেকে দেখা যায় ধূ-ধূ

প্রান্তর, কাঁকর, রাঙা মাটি, উঁচু নিচু অসমতল চাষের ক্ষেত। প্ল্যাটফর্মে বারো আনা সাঁওতাল যাত্রী। তাদের হাতে শিকারের অস্ত্র, নয়ত চাষের যন্ত্রপাতি ভাঙা টুকরি বাঁক ইত্যাদি।

একখানা ট্রেন এসে ইন করে প্ল্যাটফর্মে। ওরা দুজনে উঠে পড়েন। রাত দশটায় নামতে হয় নির্দিষ্ট স্টেশনে। একেবারে যেন বনবাস। নেড়া টুঁটো স্টেশন। নিকটে জনমানবের বসতির চিহ্ন নেই। টর্চ জ্বালিয়ে মিঃ ভাস দেখেন, কেবল মহুয়া গাছ আর এখানে ওখানে কালো পাথর।

নিকটে কোনো দোকান পসার আছে? একটু চা খাওয়া যাবে না?

সঙ্গের কুলীটি বলে, না হুজুর।

সিমসিম কতদূর?

এখান থেকে পঁচিশ মাইল—কাল সকালে বাস আসবে।

ফুলদি প্রশ্ন করেন, সারারাত কোথায় কাটাব?—তিনি গলার হার ছড়া ভাল করে আঁচল দিয়ে ঢাকেন।—আপনি এখানে এ অসময়ে নামলেন কেন? বোধ হয় ওয়েটিং রুমও নেই।

কুলীটি জবাব দেয়, আছে।

ফুলদি বলেন, বাঁচা গেল।

কিছুদূর এগিয়েই ওয়েটিং রুম। মোটমাট পাকাপোক্ত আরামদায়ক বন্দোবস্ত। মাইল পাঁচেক দূরে দু একটা খনি আছে। মাঝে মাঝে এক আধজন জাঁদরেল ব্যক্তি আসেন। তাঁদের সম্মানে এ ব্যবস্থা। ফুলদি যেন দোর বন্ধ করে প্রাণে বাঁচলেন।

মিঃ ভাস বলেন, আমার দায়িত্ব একরকম এড়ালাম, এখন আপনি নিরাপদ—কিন্তু আমার চা? সেটার দায়িত্ব তো আপনার।

হোল্ডঅলটা খুলে বিছানাটা ছড়িয়ে দেন ফুলদি। একটা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার ভাব ফুটে ওঠে তাঁর মুখে। খুব উজ্জ্বল আলো নয়। কিরোসিনের বাতি। মিঃ ভাসকে অনেক অল্প বয়স্ক মনে হয় তাঁর। নিজেকেও অমনি লাগে। এত জার্নির পর এ যেন এক অদ্ভুত অনুভূতি। নির্জন রাত্রির সান্নিধ্যের এ যেন মর্মভাঙা চাঞ্চল্য। ফুলদি বলেন, এ হচ্ছে মহুয়ার দেশ, চা নেই—খুঁজলে মধু আছে, অভাবে মদ। খাবেন?

আপনি তো নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন, আমি? বিছানা তো একটা।

প্রবাহে ছুটো টানা বড় দায়। বাতিটা নিবিয়ে দিন, দেখবেন একটাই যথেষ্ট। আর অস্থানে অসময়ে কোন মহিলাকে নামাবেন ?

কিছুক্ষণ মিঃ ডাস চুপ করে বসে কি যেন ভাবেন। তারপর সত্যি সত্যিই আলোটা নিবিয়ে দেন। তার আকণ্ঠ চায়ের তৃষ্ণা! ফুলদি বলছিলেন, অভাবে মদ!

বার

জানালার শার্সি দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে তুজনার মুখে। ফুলদি ধড়মড় করে উঠে বসেন। হঠাৎ একটা বিশ্রী বেয়াড়া দর্শন পুরুষ বলে মনে হয় মিঃ ডাসকে। কেমন হাড় ঠেলে উঠেছে গালের। বাটি বসেছে মুখে। কিন্তু একে নিয়েই আজকের পথ চলা। নিত্যকার কথা ভাবা যায় না। সে যেন ওঁর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া কর্তব্য। কি ঘৃণিত! কি কুৎসিত! এমনি কি নারী জীবনের তৃণভূমিতে পদচারণ করে পশু? যুগ যুগ ধরে এই কি অবক্ষয়? ফুলদির বুকে যেন ক্ষুরের চিহ্ন বাজে। রক্তাক্ত হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র সুবিস্তীর্ণ মনভূমি। রূপ হতাশা দৈহিক জ্বালায় কিছু সময় তিনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন।

সময় চলে যায়। তিনি বাধ্য হয়ে ডাকেন, মিঃ ডাস উঠুন।

মিঃ ডাস উঠে বসেন হোল্ডঅলের বিছানায়। চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করেন, কটা? বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ফুলদি কিছু বলেন না। তিনি আয়না চিরুণী দিয়ে নিজের বিস্রস্ত চুলগুলি আঁচড়ান।

বাইরের থেকে ঘুরে এসে মিঃ ডাসও নিজেকে একটু ফিট ফাট করে নেন। একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, তারপর সারা রাতটা কি ইজি চেয়ারে শুয়ে কাটালেন?

উপায় কি? ষোল আনা সুবিধার কায়েমী স্বত্বটা তো আপনাদেরই। যখন চা দিতে পারলাম না, তখন ক্ষমতার মধ্যের আরামটাও কি ছিনিয়ে নেওয়া ভাল?

ঠিক কিছু না বুঝেও একটু হাসেন মিঃ ডাস। সে হাসিতে আর কিছু নেই, শুধু অতৃপ্তি। ফুলদি ভাল করেই লক্ষ্য করেন। কেমন যেন তাঁর ভালোও লাগে—খেলাও বাড়ে মার্জারীর মত ইঁদুর নিয়ে খেলা।

কিছুক্ষণ বাদে ওঁরা বেরিয়ে পড়েন বাসের উদ্দেশ্যে।

একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরের ওপর দুজনে গিয়ে দাঁড়ান। কুলীটা জিনিস-পত্র নামিয়ে রাখে। গগল্‌স্‌ আঁটা এই সাহেব ও মহিলাকে দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা সেলাম জানায়। কেউ দেখায় মুরগী, কেউ দুধ, কেউ বা পাকা কলা।

মিঃ ডাস বলেন, ও সব দিয়ে করব কি, একটু চা খাওয়াতে পারিস কেউ?

অর্থ না বুঝে সকলে মাথা নাড়ে। ডাস একটা এক টাকার নোট বার করেন। এবার দু-এক জন এগিয়ে আসে। একটি যুবতী মেয়ে হাত পেতে নোটখানা নিয়ে আঁচলে বাঁধে। সে ভাঙা ভাঙা বাঙলা হিন্দি মিশিয়ে আমন্ত্রণ জানায় তাদের গাঁয়ে যেতে। ঐ, নিকটে ছোট্ট টিলাটার নিচে।

বাস তো এসে পড়বে না?

কুলীটা বলে, না হুজুর—লেট হোবে।

তবে চলো। ফুলদির কি ইচ্ছা?

চলুন। উচিত ছিল আপনার জন্য ফ্ল্যাস্কে চা আনা। সে তো আপনারই ত্রুটি। এ রকম গাইড নিয়ে কেউ পথ চলে না।

মাত্র কয়েকখানা ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর নিয়ে একখানা গ্রাম। ছেলে বুড়ো জড়িয়ে পঁচিশ ছাব্বিশ জনার বেশি হবে না। ঘরগুলোর ভিতর কি করে মানুষ যে থাকতে পারে ফুলদি বুঝে উঠতে পারেন না। স্থায়ী বসবাসের জন্য যেমন শক্ত খুঁটি-চাল-বাঁধন প্রয়োজন—তা নেই।

কুলীটা বলে যে এরা যাযাবর। এতকাল বনে জঙ্গলেই কাটিয়েছে লতাপাতার ডেরায়, এখন তবু ঘর বাঁধতে শিখেছে। কখনো বা নদীর তীরে এরা ফসল বোনে, কখন বা মহুয়ার মদ তৈরী ক'রে এদিক ওদিক চোরা গোপ্তা চালান দেয়। মাঝে মাঝে এদের ঘর বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় বান এসে।

নদী কোথায়? ফুলদি প্রশ্ন করেন।

একটা বিশুষ্ক বালুকার আস্তরণ দেখিয়ে দেওয়া হয় নদী রেখার মত। সর্পিল ছন্দে তা ওপর থেকে নিচের দিকে গড়িয়ে গেছে। জলহীন অগভীর লাল বালি। এই নাকি নদী! বর্ষা এলে গেরুয়া ঢল নামে। ধুয়ে মুছে নিয়ে

বার ফুলের চিহ্ন। উপড়ে পড়ে বড় বড় গাছ লতাগুল্ম। ভেসে গলে পাথরের চাঁই।

ফুলদির বিশ্বাস হয় না।

মিঃ ডাস বলেন, ভারতবর্ষের উঁচু ভূমিগুলিতে এত বড় ধ্বংস আর বুঝি নেই। ওঁরা বসে বসে গল্প গুজব করেন। নতুন ভাঁড়ে করে গরম দুধ কলা এবং চা নিয়ে আসে মেয়েটি।

মিঃ ডাস জিজ্ঞাসা করেন, ফুলদি কি এসব খাবেন?

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোষ তো দেখছি নে। খেতে আপত্তি হবে কেন?

ফুলদি দুধ ও কলা খাওয়ায় মেয়েটির দক্ষিণা বাড়ে বটে, কিন্তু সে যেন একটু তৃপ্তিও অনুভব করে মনে।

বেলা দুটো নাগাত ওঁরা বাস থেকে নামেন এক কঙ্করময় পাথুরে রাজ্যে। ঘণ্টা বাজিয়ে বাস চলে যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে। জন প্রাণী নেই, আর কোনো যাত্রী এখানে নামেনি—গাছ পালাও অল্প। সূর্যের আলোতে চারদিকে তাকিয়ে ফুলদি যেন অস্থির হয়ে পড়েন।—এই কি সিমসিম?

কনডাক্টর তো বলল।

আপনি কি বলেন?

আমি কি আর অস্বীকার করব!

এখন তবে ক্যাম্পে নিয়ে চলুন। পায় যে ফোস্কা পড়ার জোগাড়। কি ঝাঁঝাল রোদ্দুর?

সেই তো—একটা যদি ছাতি আনা হত?

কিছুটা পথ হাঁতড়ে, কিছুটা একজন রাখাল ছেলের সাহায্যে হদিশ করে, ওঁরা অর্ধ সিদ্ধ হয়ে এক ক্যাম্পে এসে ওঠেন। এটা নাকি এক উদ্বাস্তু ক্যাম্প। সত্যবন্ধু এর ইনচার্জ। ফুলদি ভাবেন, হাঁ্যা মানুষের বাস বসাবার মত একখানা জায়গা বটে! ভূদান যজ্ঞের জন্য এখানে অনায়াসে একখানা প্রথম শ্রেণীর আশ্রম গড়া যেত। দরিদ্রতম মালিকও বিনোবাজীকে নিরাশ করত না। অবস্থাপন্ন হলে তো কথাই নেই—লিখে দিত যত দূর এক নজরে দেখা যায়।

গোটা দুই পুরু ত্রিপলের ক্যাম্প। নিচে গোটা চারেক ভাজ করা। তার ওপর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর শয্যা এবং অফিস। চারদিকে কাগজ-পত্র

ছড়ান। একটা ভাঙা কুঁজা, আধভাঙা কাপ দিয়ে ঢাকা। কোনোদিন যে ঝাঁটা পড়েছে তার লক্ষণ নেই।

এইটাই নাকি হুজুরের আস্তানা! ভিতরে ঢুকে ফুলদির মনে হয়, যেন ঠিক ভূতের বাসা একখানা! একজন ইনচার্জের অবস্থা এই হলে যারা তার চার্জে আছে, তাদের কথা ভাবতেই পারেন না ফুলদি।

সত্যবন্ধু উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সে একটা ব্যথায় কাতর। ব্যথাটার উৎপত্তি যে কোথায়, তাই সে স্থির করতে চাইছে। পেটে, পাঁজরে, না হৃদপিণ্ডে সে সঠিক ধরতে পারছে না। এমনি যখন উৎপাত বাড়ে, রোজ সে গবেষণা করে। রোজই কিছু স্থির করতে পারে না। ডাক্তাররা কেউ বলেন প্লুরেসি, কেউ বলেন এ্যাসিডিটি। প্রথম প্রথম দু এক মাস সে নর্থ-পোল এবং সাউথ পোল ক'রে, এখন একেবারে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছে। তবে মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন সে একটু আধটুক সোডা খায়। এ তার দারোয়ান ভূদেব মোহান্তির প্রেসক্রিপসন। সতের বছর সোডা খেয়ে এখন সে নাকি দিব্যি ভাল হয়ে গেছে। আসল কথা রোগেরও নাকি একটা অন্তকাল আছে, সেটা না এলে নাকি কিছু হয় না। আরো এক আধটা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক কথা সে বলেছে, রোগ হলে একদল মরে, একদল ভাল হয়ে যায়—একদল চিরকাল ভোগে। ওর জন্য হতাশ হবার কিছু নেই।

কিন্তু সত্যবন্ধু হতাশ হয়েছে—চিরকাল এমনি ভোগার মত চরম দুর্ভাগ্য বুঝি কিছু নেই।

সত্যবন্ধু ফুলদির কাপড়ের খসখসানি শুনতে পায়। কিন্তু তাকে ব্যথায় অধীর করেছে অত্যন্ত। সে খানিকটা সোডা সংগোপনে হাতে ঢেলে নিয়ে বলে, সবিতার মা এখন যাও. ওপর থেকে স্যাংকসন না এলে, উপোষ করে মরে গেলেও আমি কিছু করতে পারব না। জানই তো আমার হাত পা বাঁধা। কাঁদলে কিছু হবে না। কান্না শুনে শুনে আমাদের কানে মরচে পড়ে গেছে।

সবিতার মা এখানে উপস্থিত নেই—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেন ঘূর্ণায়মান দৃশ্যের মত ফুলদির সুমুখ দিয়ে ঘুরে যায়।

কি খাচ্ছ সত্য? তোমার হাতে কি?

সোডাখানি ফেলে দিয়ে সত্য বলে, কে, পিসীমা?—সে পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।—হঠাৎ না জানিয়ে যে? বসুন আপনারা।

মিঃ ডাস বলেন, আগে এক গ্লাস জল দিতে বলুন—উঃ কি গরম।

এক্ষুনি দিচ্ছি—বসুন আপনি।—কুঁজোটা কাৎ করে সত্যবন্ধু চেঁচিয়ে ওঠে, মোহান্তি, মোহান্তি!

একবাণ্ডিল আধ পোড়া পাটের কাঠির মত মোহান্তি এসে হাজির হয়।—হুজুর!

জল কোথায়?

কাল চার আনা দিয়ে এক কুঁজো ঝর্ণার জল আনলাম, তা খেয়ে ফেললেন! রাগ করবেন না হুজুর, এ সরকারের পয়সা নয়, নিজের পয়সা, একটু বুঝে-সুঝে খরচা করতে হয়। ভবিষ্যতে...

তোমার আর বক্তৃতা দিতে হবে না, যাও জল নিয়ে এসো।

এখানের জলে চলবে?

যাও, না চালিয়ে আর উপায় কি? হপ্তার ভিতর তিন দিন তো তুমি আমাকে ঐ জলই খাওয়াও।

একটা কলাইকরা গ্লাসে জল নিয়ে আসে মোহান্তি—যেন লোহা ভিজান লোশন। মিঃ ডাস দেখে-শুনে খেতে ইতস্তত করেন। মোহান্তি বলে, ভয় পাবেন না হুজুর আমি নিজ হাতে এই মাত্তর কুঁয়ো থেকে তুলে এনেছি। এখানের জলে একটু আয়রণ বেশি, তাই অমনি রং।

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, মোহান্তির কথায় বিশ্বাস না করে উপায় কি? মিঃ ডাস চোখ কান বুজে গ্লাসটা খালি করেন।

উদ্বেগ ও উত্তেজনায় সত্যবন্ধুর ব্যথাটা চাপা পড়েছে। সে হৈ চৈ এবং অনেক সওয়াল করে মোহান্তিকে দিয়ে অসময়ে এঁদের জন্য রান্না চাপায়। চাকরি করতে এসে এ তাঁবেদারি তার ভাল লাগে না।

সে সত্যবন্ধুকে একান্তে ডেকে বলে, হুজুর এখন আর এটুকু বেলার জন্য হট-হুজ্জত না করে, সন্ধ্যের পর একবারে চাপান যাবে হাঁড়ি। দুটো মুলো ছাড়া এখন তো আর কিছু জোগাড় নেই। বরং সেরটাক দুধ এনে দিচ্ছি।

দুধ পাবে কোথায়?

কেন সেই যে রাখলাম।

সে তো আধ সের। তার থেকে কিছুটা তো আমাকে দিলে।

সে ,ছাড়া খানিকটা মোহান্তিও খেয়েছে। এখন বড় জোর পো-টাক আছে। তবু মোহান্তি বলে, কলকাতার মানুষ, একেবারে খাঁটি জিনিস

পেটে সইবে না। ওতে জল চিনি মেশালে দিব্যি এক সের হবে। ক্যাম্পের গাছে একটা পাকা পেঁপেও আছে। দেখুন একটি পয়সাও খরচা হল না—একেবারে জামাই ভোগ।

সকাল বেলা যে পেঁপেটা পাড়লে?

ও, হুজুরের সব লক্ষ্য আছে! এ না হলে এত বড় একটা ক্যাম্পের ইনচার্জ। হুজুরের জন্য আধখানা রয়েছে।

ও সব হবে না মোহান্তি, মুলো সিদ্ধ ভাতই চড়াও। না পারলে ডাক নিয়ে কেঞ্জপুর যাও। জেনো যেতে আসতে সাত মাইল।

মোহান্তি মনে মনে সত্যবন্ধুর সাত পুরুষ উদ্ধার ক'রে ভাত চড়াতে যায়। তারও সহ্য হয় না এই দোরোখা গোলামী।

কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে কুয়ো। মাঝখানে কয়েকটা বড় পাথর।

কুয়োর পাড়ে গিয়ে মিঃ ডাস বলেন, আমি স্নান করব না।

ফুলদি বলেন, আমার কিন্তু তা সহ্য হবে না।

সহ্য তো হবে না বললেন, কিন্তু শাড়ি তো নষ্ট হবে, আর বাথরুম কোথায়?

আপনি সরে যান, অগত্যা চোখ বুজুন, দেখবেন এখানে দিগন্ত জোড়া বাথরুম।

চোখ বুজে দেখব কি করে?—মিঃ ডাস সতৃষ্ণ নয়নে ফুলদির দিকে তাকান। যেন জবাবটা লেখা রয়েছে তাঁর বুকে।

জল তুলে দেব?

দিন। আমি বড্ড টায়ার্ড।

বালতি তিনেক জল তুলে দিয়ে মিঃ ডাস অদৃশ্য হন ধীর পদক্ষেপে। কি যে তিনি ভাবেন তা গুছিয়ে লেখা যায় না। তবে অনুমানে বোঝা যায় তিনি রসাপ্লুত হয়েছেন। হয়ত ভাবছেন, এখনো সময় আছে ফুলদির। এখনো তিনি মর্মভেদ করতে পারেন দর্শকদের। এমন রোলে তাঁকে নামাবার মত ভাগ্য কি মিঃ ডাসের হবে?

ফুলদি স্নান সেরে ফিরে এসে একটু প্রসাধন করেন। শাড়ি সেমিজ শুকাতে দেন বাইরে। মিঃ ডাসও প্রস্তুত। এখন আহার্য এলেই হয়।

সত্যবন্ধু মোহান্তিকে ডাকে। সে কাছে আসে না। শুধু দূর থেকে বলে, হুজুর। সাধে ওকে সত্যবন্ধু কথায় কথায় কেঞ্জপুর পাঠাতে চায়। এ ছাড়া আর মোহান্তির ওষুধ নেই। সত্য বিরক্ত হয়ে ওঠে। কুণ্ঠায় লজ্জায় সে সংকুচিত হয়ে থাকে।

ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন, তখন কি খাচ্ছিলে ?

কই. কিছু তো খাইনি।

ঐ যে সাদা সাদা কি একমুঠো হাতে দেখলাম। সোডা ধরেছ নাকি ?

না, না...ইয়ে...

ও হচ্ছে বিষ। একবার অভ্যেস হলে আর কিছুতে ধরবে না। তোমার অসুখটা কি ?

ঠিক ডাইগোনেসিস্ হয়নি—বলতে পারি নে।

অসুখ কি ঠিক জান না, অথচ খাচ্ছ সোডা !

মোহান্তি বললে যে তার সতের বছরের ব্যথা নাকি ভাল হয়েছে ঐ খেয়ে।

চমৎকার ব্যবস্থা ! যেমন ডাক্তার তেমনি রোগী। কি করে যে তোমরা ডিগ্রী পেয়েছ ইউনিভারসিটির ?

মিঃ ডাস হেসে ওঠেন। ফুলদিও না হেসে থাকতে পারেন না।

রাঁধতে রাঁধতে মোহান্ত সন্ধ্যা ঠেকিয়ে ছাড়ে। হাঁড়িতে দু জনার চাল না চড়িয়ে এক সঙ্গে পাঁচ জনারই চড়ায়। ধীরে ধীরে জ্বালতি ঠেলে আর বকর বকর করে। তার নাকি জীবন বেরিয়ে গেল এমন বাড়তি উৎপাতে। আজ ইনসপেক্টর, কাল কুটম্ব এ নাকি লেগে আছে ক্যাম্পে। এর জন্য সে তো একস্ট্রাটাইম পায় না, তবে সে বেহুদা খাটতে যাবে কেন ? যত সব...

সন্ধ্যার সময় আর কেউ খেতে বসে না। সন্ধ্যার পর ফুলদি ও মিঃ ডাস খেয়ে ওঠেন না-খাওয়ার মত করে। পাথরকুঁচো এবং কাঁকরে দাঁত ভাঙার জোগাড়।

ফুলদি বলেন, এ তোমরা খাও কি করে ? এ তো যত তাজা পাকস্থলীই থাকুক না কেন, তাকে ঘায়েল না করে ছাড়ে না। এখানে থাকলে তোমার রেহাই নেই সত্য। তুমি কালই আমার সঙ্গে যাবে।

সত্য মুখে কিছু না বলে হাসে।

সহকর্মী ডাক্তার বন্ধু এসে বলে, নমস্কার। ক্ষমা করবেন, এতক্ষণ একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই আসতে পারিনি। দেখছি চিঠি লিখে কাজ হয়েছে। আমিও বলি ওকে ধরে নিয়ে যান। ও এমনি যাবে না। ওকে ভূতে পেয়েছে।

কি সত্য কাল যাচ্ছ তো ? ফুলদি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকান।

সত্যবন্ধু চুপ করে থাকে।

কোনো জবাব দিচ্ছ না কেন ?

ডাক্তারবন্ধু বলে, তেমন কোনো অপ্রিয় প্রশ্ন এলে ও অমনি করেই থাকে—মনে হয় যেন নিতান্ত বিনীত, কিন্তু আসলে ও ভয়ানক শক্ত জেদি এবং দুর্বিনীত। নইলে এমন করে কেউ শরীরটা মাটি করে ?

মোহান্তি এসে ক্যাম্পের দুয়ারে দাঁড়িয়েছে। সে জ্বলছে তেলে বেগুনে। কোথায় খেয়ে-দেয়ে রেহাই করে দেবে—তা না, এখন গল্প ফেঁদে বসেছেন। এরপর তার বাসন মাজা, ডাক বাঁধা কত কি কাজ আছে।

সাধে সে জলের কুঁজোর গলাটা ভেঙেছে ! এমনি করে ধীরে ধীরে ওটাকে শেষ করতে পারলে অন্তত হপ্তাখানেক সে জল না এনে নিশ্চিন্ত। একটা ভাঙলে আর একটা সংগ্রহ করা তাও কতকটা মোহান্তির ইচ্ছা এবং অনুকম্পার ওপর নির্ভর।

ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি সত্য ?

এদিক কার ওপর ফেলে যাব, এত বড় একটা দায়িত্ব কে ঘাড়ে নেবে বলুন ?

ফুলদি বলেন, এ একেবারে ছেলেমানুষী কথা। একি তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি ? ওপরে লিখে জানাও লোক দেবে। রাম ছাড়াও এককালে রাজত্ব চলেছে।

তবু আমার একটা মরাল ডিউটি রয়েছে। এদের এখানে কারুর শরীর টিকছে না। ক্যাম্পটা এখান থেকে সরাতেই হবে। আমি প্রব্লেমটা নিয়ে যে ভাবে ফাইট করছি, নতুন কেউ এসে তা নাও করতে পারে।

ডাক্তার বলে, ছিল আড়াই শ, হয়েছে একশ। এদের প্রব্লেম এমনি করেই সলভ হবে—এই হচ্ছে মহামনীষী ম্যালথাসের থিওরী। অতিরিক্ত ফাইট করলে তুমিই খতম হবে, সে কথা কি ভেবে দেখেছ ? একটা মাত্রা আছে সব কাজের।

সত্য বলে, আমার মত একটা লোক মরলেই বা কি হয় !

ফুলদি ভাবেন, অনেক কিছু হয়। এ নিতান্ত অভিমানের কথা। তিনি তাঁর মনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে সত্যর মুখখানা ছাড়া কিছুই দেখতে পান না। যেন তাঁদের প্রাঙ্গণের একটা রৌদ্র দগ্ধ ডালিয়া ম্লান হয়ে গেছে ঝলসে। তাঁর মুখখানা নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

মিঃ দাস তা লক্ষ্য করে ভ্রু কোঁচকান। উঠে দাঁড়িয়ে একটু পায়চারি

করেন নির্লিপ্ত ভাবে। এখানে আলো থাকলেও বাইরে ঘোর অন্ধকার। এখানে কথার রেশ থাকলেও বাইরে নীরবতা। আজ তিনি ফুলদির সঙ্গী হলেও অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পান একটা পাহাড়ের মত পূর্ণচ্ছেদ মাঝ পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ফুলদি যতই বলুন, মহুয়ার দেশেও মিঃ ডাসের ভাগ্যে মধু জোটেনি—অভাবে মদ, সে ফেনোচ্ছল গেলাসটাও বুঝি তিনি পাবেন না। শত্রুর হাতে তাও ফুলদি তুলে দিতে বসেছেন!

মোহান্তি চীৎকার করে ওঠে, সাপ, সাপ!

সকলে আলো নিয়ে বেরিয়ে দেখে, একটা শুকনা লতা।

মোহান্তি মুখ লুকিয়ে একটু হেসে বলে, খেতে চলুন। বাপস্ ভয় পেয়েছিলাম, কি যে দেশ!

তের

কলকাতা ফিরে এসেছেন ফুলদি পরদিনই। সত্য আসেনি। তবে সে কথা দিয়েছে যে সপ্তাহ দুই বাদে এদিকের একটা বন্দোবস্ত করে ছুটি নেবে। ফুলদি তাকে সহজে ছাড়েননি। স্নেহ মায়া প্রীতি এমন কি কটাক্ষের আয়ুধ পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করেছেন। অসতর্কে দেখিয়েছেন মোহময় অভিমান।

ফুলদি বিজয়িনী হয়ে ফিরেছেন।

কিন্তু সেই অনুপাতে মিঃ ডাস ম্রিয়মান।

দেখলেন তো ছেলেমানুষের কেমন জিদ! কিন্তু যুক্তি তর্কের কাছে না হেরে উপায় আছে?

হুঁ। দেখলাম সব।

সত্যকে কেন যে আমি অত স্নেহ করি বুঝি নে। ওর তো আরো ভাই রয়েছে। আসলে ও চমৎকার লোক!

হুঁ।

স্যুটকেশ বিছানা পৌঁছে দিয়েই বিদায় হয়ে যান মিঃ ডাস। তাঁর অনেক কাজ জমে আছে—অনেক ইনটারেষ্টিং সব ইনফরমেশন।

ফুলদি বলেন, না মিঃ ডাস ধুলো। একটু পরেই না হয় ঝাড়বেন। চা খেয়ে যান এক কাপ। শরীরে বল পাবেন।

মিঃ ডাস অন্যদিন হলে এ আন্তরিকতা ত্যাগ করে নিশ্চয় যেতেন না। কিন্তু আজ এক রকম দোর গোড়া থেকেই উধাও হন।

ফুলদি ঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই অহল্যা এসে ঢিপ করে প্রণাম করে।

কে?

আমি অহল্যা ?

কালো বৌ ঠিক চাঁদা না দিলেও ট্যাক্সো দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্ত কারুর জোর জুলুমে সে রাজী হওয়ার মত মেয়ে নয়, মনের তাগিদেই সে স্বীকার করে নিয়েছে। একটা বেলার আহার ও বাসস্থানের দায়িত্ব যখন কেউ নিতে চাইল না। তখন কালো বৌ তা গ্রহণ করেছে ঝুঁকি নিয়ে। কারণ সে তার স্বামীটিকে বোলা আনা বিশ্বাস করে না। স্বামী বেচারীর দোষ নেই। সে গোবেচারীর মত ইতিউতি চায়। যা কিছু দোষ ঐ কালো বৌর কালো রঙের।

ফুলদির কাছে এসে কালো বৌ বলে, এই হাতে হাতে সপে দিলাম, এখন বুঝে নিন।

ফুলদি কিছু বুঝতে পারেন না। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন।

ঘরের ভিতর থেকে ধরাগলায় প্রশ্ন হয়, কি গো এসেছ ?

হ্যাঁ এসেছি—মরিনি।

কেমন আছ ?

দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট। তোমার একদশা না দেখে মরছি নে।

কদিন বাদে যদৃচ্ছা বেড়িয়ে এলে—শত কষ্ট হলেও আমি তো কিছু বলিনি। তবে এ সব কি উক্তি ?

অমন ন্যাকামি করছ কেন ? আগাম টাকা দিয়ে ক্ষেন্তিকে রেখে গেছি, তোমার তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। দেখছি তো সব ঠিকঠাক রয়েছে, যায় পিকদানীটা পর্যন্ত।

আমি কি কোনো অনুযোগ তুলেছি ?

এখন চুপ কর তো। তুমি কখন এলে অহল্যা ? সেদিন ওভাবে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন ? আবার কি ভেবে এলে ?

অহল্যা এতগুলো প্রশ্নের এক সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। বাড়িশুদ্ধ সবাই এসে ফুলদিকে ঘিরে ধরে। কনকদির স্বামী পর্যন্ত বাদ যান না। কনকদি এক সঙ্গে সবাইকে কথা বলতে বারণ করেন।

ভাল কথা—তুমিই বুঝিয়ে বল।—কনকদিব স্বামী ঋষিদাসবাবু মন্তব্য করেন।

কে যেন বলে, অর্ডার প্লিজ।

ফুলদি হেসে ঘরের ভিতর ঢুকে একটা শতরঞ্জি নিয়ে আসেন।—বসুন সবাই। কালো বৌ উঠে এসে এখানে বস।

কনকদি আদ্যপান্ত সব খুলে বলেন বেশ মনোজ্ঞ করে। সমাপ্ত বাক্যটি হচ্ছে তাঁর, এখন ওর একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন।

ফুলদি চট করে কোনো জবাব দিতে পারেন না। বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু সফলের আশা ছিল অন্য রকম। তাই উদ্দীপনার স্রোতে হঠাৎ ভাঁটার টান পড়ে। বুদ্ধিমতী কনকদি তা ঘুরাতে প্রয়াস পান।—আসল খবরই তো জিজ্ঞাসা করা হয়নি, সত্য কেমন আছে?

সে অসুস্থ—শীগগিরই এখানে আসছে। তার ভাল চিকিৎসার দরকার। অমন চেহারা একেবারে কালি হয়ে গেছে। তবু ছুটি নিতে চায় না।—আরো অনেক কিছু বলেন ফুলদি।

কনকদির স্বামী মন্তব্য করেন, এক জনার চিকিৎসা ও সেবার প্রয়োজন, আর এক জনার আশ্রয়ের—চমৎকার যোগাযোগ। আর আমাদের ভাবনার কিছু নেই। ফুলদিই ব্যবস্থা করতে পারবেন সব। শুনলে তো মেয়ে, তুমি কি একটি পুরুষ মানুষের যাবতীয় সেবা যত্ন ঘরকরনার ভার নিতে পারবে? সে কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ। বয়স হলেও তার কোনো সংসারী জ্ঞান নেই।

অহল্যা নিশ্চয় পারবে। এক জনার কেন, পাঁচ জনার সেবা যত্ন করতেও সে ভয় পায় না। এ বাড়ির বৌদের মত সে লেখা পড়া না জানলেও, এ সব কাজে সে দক্ষ। কোনো খাটুনিই তার গায় পায় লাগার নয়। অহল্যার মুখে একটা রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে। সে মৃদু মৃদু হাসে।

কি, কথা বলছ না যে?—ঋষিদাস বাবু বলেন, এখন তো লজ্জা করার সময় নয়। যা বলার তা বল।

অহল্যা বলে, পারব।

ফুলদি এসব মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। অহল্যার কাহিনী একটু নতুন হলেও তাঁর মনের তিক্ততা একেবারে নষ্ট হয় না। উপায় নেই বলেই এদের হাতের জল খাওয়া, সেবা নেওয়া।—তুমি কি চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারবে? খুব ভাল করে ভেবে চিন্তে উত্তর দাও।

চব্বিশ ঘণ্টা কেন, সারা জীবন অহল্যা দাসখত লিখে দিতে প্রস্তুত। তার চকিতে মনে পড়ে স্বামী সংসার বাপ মা এবং বন্যার কথা। থাকার মত তার আর কি অবশিষ্ট আছে? কোথাও ফিরে যাওয়ার কথা তার কাছে এখন স্বপ্ন। তার এমনি একটা আশ্রয় প্রয়োজন। নইলে ফুটপাথে তিষ্ঠান দায়। অহল্যা আবার বলে, পারব।

কিন্তু আমার ভাইপো যে বিয়ে করেনি, একা মানুষ—তোমারও যে বয়স অল্প।

এবার অহল্যা গোলাপ ফুলের মত আরক্ত হয়ে ওঠে। কি জবাব দেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। উপস্থিত অন্যান্য বাসিন্দারাও বিব্রত হয়ে পড়ে। সমস্যাটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

কনকদি ঋষিদাস বাবুর দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকান।—এবার কি বলবে বল না! আপিসে খুব তো বড় বড় ফাইল নিয়ে মাথা ঘামাও।

ওসব হিসেব এখন রেখে দিন ফুলদি—ঋষিদাসবাবু আরম্ভ করেন, যে যুগ পড়েছে তাতে ও-একটা প্রব্লেম নয়। প্রব্লেম হচ্ছে বেঁচে থাকা এবং পারলে অপরকে বাঁচান। ওরা কেউ এখন আর খোকাখুকু নয়। যে যার ভবিষ্যত সুখ সুবিধা আপদ বিপদ বুঝে চলতে পারবে। ভূত ভাবলেই ভূত, নইলে দেখবেন কিছু নয়।—তিনি এমনি কয়েকটা বসবাসের উদাহরণ দেখান।

ফুলদি বলেন, চট করে বাসা একখানা পাওয়া যাচ্ছে কোথায়। আমার তো একটি মাত্র কোঠা। এর ভিতর কি দুটি বাড়তি লোক পোষাবে?

এটা আরো বড় সমস্যা। তখনকার মত আলোচনা ওখানেই সমাপ্ত হতে চায়।

ফুলদি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কেন তিনি এই কটা দিন আগেও অহল্যার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন? এখন একটা সুবিধা পেয়েও তো তেমন কোনো ব্যবস্থা করতে পারছেন না। তাঁর মনের দিক দিয়েই কি সায় নেই? না, না এ অত্যন্ত লজ্জার কথা। তাঁর পক্ষে একটি রুগ্ন মানুষের দীর্ঘদিনের জন্য সম্পূর্ণ ভার নেওয়াও তো অসম্ভব। তবে অন্তরায়টা কি? আপাতত দেখা যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া পাওয়া।

অহল্যা ফুলদির মুখের দিকে বার বার তাকায়। তাঁর মুখের রৌদ্র মেঘের আলো ছায়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অহল্যারও মনের আশি আশা নিরাশায় ভবে ওঠে। দ্বন্দ্বে সংঘাতে সে যেন হাবুডুবু খায়। তবু উপায় নেই—বসে থাকতেই হবে। দাতা স্বীকার না করলে গৃহীতার বলার কি থাকতে পারে?

উৎপলা বলে, এ ব্যারাকে কি একখানা ঘর পাওয়া যাবে না?

মিতা সংগোপনে মন্তব্য করে, আইবুড়ো মেয়ের অত মাথা ব্যথা কেন?

উৎপলা একটা চিমটি কাটে।

সমস্যাটার কোনো মীমাংসা হচ্ছে না। বেলা কম হয়নি, এখন সকলের কাজ কর্মের একটা জোর মরশুম, তবু কেউ জায়গা ছাড়ে না। ফুলদি একটু অসুবিধা বোধ করলেও মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারেন না। বরং তাঁকে বলতে হয়, আপনারা বসুন, আমি স্নানটা সেরে আসি। এত বড় একটা ট্রেন জার্নির পর আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

তা যান—আমরাও উঠি। মিনতি বলে, আমার ঝোল বুঝি চচ্চড়ি হয়ে গেল।

কালো বৌর ঘরে হাঁকডাক শোনা যায়।—মা ভাত দিয়ে যাও—ইস্কুলের বেল পড়বে এক্ষুণি।

ঋষিদাস বাবুর বলতে গেলে একরকম লেট রেকর্ড নেই। হয়ত পাঁচ বছরে একদিন। একটু আগে এসে তিনি চট করে কাক স্নান করে নিয়েছেন, বলেন, ভাত দাও শীগগির। আজ আর রেহাই নেই।

কনকদি বলেন, এখন কি করা যায় বল তো?

আমিও তো তাই ভাবছি। দ্রুত কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দিয়ে ঋষিদাস বাবু জবাব দেন, লেট হওয়ার চাইতে একদিন ছুটি নেওয়া ভাল। আর যত রাজ্যের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদায় না করে, তুমি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ঘরে নিয়ে এসো! আজ কতগুলো জরুরী ডেসপ্যাচ ছিল আপিসে।

কনকদি একটু সপ্রতিভ হয়ে পড়েন। এরপর নিশ্চয় আরো মাত্রা চড়বে। আপিস কামাইর যাবতীয় ঝাল তাঁর ওপরই উঠবে আজ। তিনি তাড়াতাড়ি একটা আধফালি ইলিশের মুড়ো ঠেলে দেন স্বামীর পাতে।

একি, একি করলে? আমি বলিনি যে আপিস যাওয়ার মুখে কক্ষনো— ঋষিদাস বাবু লোলুপ নেত্রে মুড়ো আধফালির দিকে তাকান।

কনকদি বলেন, ও তো তোমার ভাগ্যে কখনো জোটে না। আজ যখন আপিস যাচ্ছ না, তখন খাও।

এ কথা পরম সত্য?

ঋষিদাসবাবু দেখেন, ছোট ছেলেটি এ্যাবাউট টার্ণ করে চলে যাচ্ছে।— রুণু, রুণু!

আর ওকে ডেকো না—ওরা নিত্য খাচ্ছে।

রোজ কি আনা হয়? ওকে ডাকো।

রুণু ততক্ষণে উঠান ছাড়িয়ে ঋষিতাদের ঘরে। অনেকদিন সে বুঝি ওদের ঘরের ছবিগুলো দেখেনি। বিশেষ করে পরম বৈষ্ণব চোখ বোজা বকটাকে। বিলের পাশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঋষিদাসবাবু অর্ধেকটা খেয়ে, বাকি আধখানা বাটি চাপা দেন।

ও কি আদিখ্যেতে?

দাঁতে সয় না করব কি? তিনি মুখ ধুয়ে বলেন, তোমার এত ঝামেলা, পারলে আমরাই ওকে রাখতাম। কি বলো?

কনকদি তাড়াতাড়ি বলেন, না, না আমাদের পেরে দরকার নেই। তুমি মনে মনে নিশ্চয় একটা কিছু ঠাহর করেছ, নইলে আজ কামাই দিতে না। সাধে আপিসে তোমার এত নাম!

ঋষিদাসবাবু জামা জুতো পরতে পরতে বলেন, এখন আফিসের সুনাম বাড়িতে রাখতে পারলে হয়—মনে মনে তো একটা মতলব এঁটেছি। দেখি কতদূর কি করে উঠতে পারি। আমি না ফেরা অবধি তুমি অহল্যাকে বুঝিয়ে রেখো।

আপিসে তুমি অনেককেই চাকরী করে দিয়েছ, আর এই সামান্য কাজটা কি পারবে না? নিশ্চয় পারবে। আমার মন যেন তাই বলছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ হচ্ছে স্রেফ মেয়ে ঘটিত ব্যাপার—নইলে পরোয়া করতাম না। এক্ষুনি কথা দিয়ে যেতাম। দেখ অহল্যা আবার সে দিনের মত পালিয়ে না যায়। যত চাষাভূষা নিয়ে তোমার কারবার।

কোথায় যাচ্ছ?

দশ হাত কাপড়ে যাদের কাছা নেই, তাদের কাছে এখন বলব না।

ঋষিদাসবাবু বেরিয়ে যাওয়া মাত্র কনকদি ছুটে অহল্যার খোঁজে যান। তাঁর মনে আশঙ্কা। মেয়েটা নিতান্ত চঞ্চল মতি। এতক্ষণে কি করেছে কে জানে!

আজ অহল্যা পালায়নি। সে ঠায় ফুলদির বারান্দায় বসে রয়েছে। সে এই দুটো রাত এখানে কাটিয়ে এদের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। এরা মরে গেলেও এখনো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এরা শুকিয়ে গেলেও অন্তঃসলিলা। ফল্গুধারার মত এদের বুকের নিচে দরদ মমতা কর্তব্য বেঁচে রয়েছে। এরা একেবারে অহল্যাকে তাড়িয়ে দিতে পারবেনা দূর দূর ক'রে। ফুটপাথের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তার মন থেকে এখনো মুছে যায়নি। পটল

এখনো জলজল করছে তার চোখের সুমুখে। একটি ক্ষত চিহ্নও সে ভুলে যায়নি। অতএব এই জায়গাটাই সবলে আঁকড়ে থাকতে হবে। শাড়ি নয়, মন দিয়ে বেঁধে নিজেকে বাঁচতে হবে। এখনো তার জীবনে বন্যা থামেনি। তার শ্বশুর তাকে বেঁধেছিল একটা শক্ত গাছের সঙ্গে। এত বড় বন্যায়ও সেটা ছিল সতেজে দাঁড়িয়ে। এবারের আশ্রয়টা যে বড় নড়বড়ে। সুযোগ সুবিধা এলে এটাকেই জীবন রসে বলীয়ান করে নিতে হবে। অহল্যা তা পারবে।

কনকদি ও ফুলদি একই সময় ডাকেন, এসো অহল্যা খাবে।

দুজনের চোখাচোখি হতেই উভয়ে হেঁসে ফেলেন।

কনকদি বলেন, দুজনার রান্নার ওপর আপনি আবার ঝামেলা করতে যাবেন কেন? ওকে আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

ফুলদি জবাব দেন, নিতে চান ভাল—একেবারেই নিয়ে যান না! জানেনই তো আমার ঘরের বুড়োটির মেজাজ। আমার হাড় মাস কালি হয়ে গেল।

কনকদি হেসে অহল্যাকে নিয়ে যান বটে, কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখেন ফুলদির প্রস্তাবটি খুব মুখোরোচক নয়।

খেতে বসিয়ে অহল্যাকে সব বুঝিয়ে বলেন কনকদি। ভাবার্থ উনি যখন বেরিয়েছেন একটা কিছু করে আসবেনই। তুমি কিছু চিন্তা করো না।

অহল্যা পরিষ্কার কিছু বুঝতে না পেরে, হাবুডুবু খায়। সারা বিকাল-বেলাটা সে অস্বস্তি কাটাতে পারে না। বাইরে বেরিয়ে তার জন্য কি করতে চান ঋষিদাসবাবু? এখানে কি অহল্যার স্থান হবে না? একটা বিদ্যুৎ রেখার মত সত্যবন্ধুর রূপরেখা তার মনের আকাশে দাগ কেটে যায়। সে একটা বিশ্বাস ছেড়ে বারান্দায় বসে থাকে।

বেলা শেষ হয়ে আসে। দিনান্তের ছায়া পড়ে দালান কোঠা জানালায়। শান্তিপ্রিয় মিত্র ও ইলা বৌদি বাগানে জল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু একটা মাত্র ঝারি। তাই হাসাহাসি হয় কে আগে তাঁর বাগানের তৃষ্ণা মেটাবেন। শান্তিপ্রিয় মিত্র প্রথম ঝারিটা দখল করেন। কিন্তু তিনি আগেই ইলা বৌদির বাগানের পিপাসা মিটিয়ে দেন।

আর কি জল লাগবে?

না।—ইলা বৌদি সলজ্জ মুখে বলে, হয়েছে।

ঠিক এমনটি না হলেও—অনুরূপ খেলা চলত শিবুর সঙ্গে অহল্যার। এখানে ঐ বাবুটি প্রধান, সেখানে ছিল অহল্যা।

সে একদিন গেছে। অহল্যা বিমর্ষমুখে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে।

ঋষিদাস বাবু এখনো ফেরেন না কেন? সাতটা বাজে প্রায়।

ফুলদি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শেষ বেলার দিকে। তিনি চোখে মুখে যখন জল দিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ালেন তখন সন্ধ্যে হতে আর বাকি নেই। এখনো চা হয়নি, চুল বাঁধা বাকি—সন্ধ্যা প্রদীপও জ্বালাতে হবে। তিনি ডাকেন, ক্ষেন্তি ক্ষেন্তি!

তাঁর স্বামীটি প্রশ্ন করেন, এ দুদিন খুব রাত জেগেছ নাকি?

জলের কেটলিটা হাতে করে তিনি জবাব দেন, হ্যাঁ নাচের বায়না ছিল কি না।

সে কথা জানতে চাইছি নে, পেটের অবস্থা কেমন, আজ কি রাবড়ি সইবে? এনে রেখেছি যা হয় বুঝে-সুঝে কর।

ফুলদি ও কথায় কান না দিয়ে কনকদির উনানের কাছে যান। জিজ্ঞাসা করেন, অহল্যা কি চলে গেছে?

না, সে যাবে কোথায়? উনি অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। ঐ তো বসে রয়েছে। ওঠো না অহল্যা। চায়ের জলটা একটু গরম করে দাও।

দরকার নেই। তুমি কি চা খাও অহল্যা?

না মা।

ফুলদি আর অনুরোধ করেন না। কোনো কথাও বলেন না। কিন্তু অহল্যার মা সম্বোধনটা তাঁর মনে একটা অদ্ভুত অনুরণন তোলে। তিনি চায়ের জল গরম ক'রে ঘরে গিয়ে চা তৈরী করেন। ভুল হয়েছে জল মাপতে। এত চা কে খাবে? আজ মিঃ ডাসও তো আসেন নি। তিনি ফিরে গিয়ে অহল্যাকে ডেকে আনেন।—তুমি চুল বাঁধতে জানো?

জানি।

তবে চাটুকু খেয়ে নাও।

অহল্যা আর আপত্তি জানায় না। কনকদি স্মিত মুখে দূর থেকে চেয়ে দেখেন।

চুল বাঁধতে বাঁধতে আরো খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন ফুলদি।—তোমার মা কোথায়, কেমন আছে?

ঠিক জানি নে। এক আত্মীয় বাড়ি ছিল। শুনেছিলাম ম্যালেরিয়া ধরেছে। শোকে দুঃখে এখন কি যে হয়েছে বলতে পারিনি।

এমনি সময় ঋষিদাস বাবু এসে পড়েন।

সব ঠিক করে এলাম। বাড়িওয়ালার ঐ যে দক্ষিণমুখো বড় কোঠাটা তালামারা খালি পড়ে আছে, সেইটে। ভাড়া দু টাকা বেশি। এই যে চাবি, এখন অহল্যা বহাল—কেমন, ঠিক তো?

এর মধ্যেই বাড়ি শুদ্ধ সবাই এসে পড়েছে। কনকদির মুখখানা গৌরবে উদ্ভাসিত।

ফুলদি বলেন, আমার আর আপত্তি কি—একখানা ঘর ভাড়া পাওয়াই যা সমস্যা ছিল!

চৌদ্দ

ফুলদির আশ্রয়েই অহল্যা রয়ে যায়। ঘরখানা ঝাড়-পোছ করতে হবে। সামান্য একটু সংসার হলেও তা সাজাতে অযুতকোটি জিনিসের প্রয়োজন। সত্যবন্ধু মামুলী কটি বস্ত্র ছাড়া কিছুই সঙ্গে আনবে না। একটা তোলা উনন, কতগুলো কৌটা, দু চারটা শিশি বোতল—এমনি অনেক কিছু সংগ্রহ করতে হবে। কোনোটা চেয়ে, কোনোটা বা কিনে।

তালা খোলা মাত্র একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ আসে ঘরের ভিতর থেকে। ফুলদি নাকে আঁচল চেপে অহল্যাকে সব নির্দেশ দিয়ে সরে যান। কি নোংরা! কত কাল ধরে যে এ সব জমেছে, তা ওঁরা জানেন না। পরিষ্কার করা কি মানুষের কাজ!

জল এবং ঝাঁটার সাহায্যে অহল্যা তা করে। সময় একটু বেশি লাগে বটে, কিন্তু বেশ ঝকঝকে তকতকে হয় ঘরখানা। সঙ্গে সঙ্গে সুমুখের উঠান-টুকুরও জঞ্জাল সরিয়ে ফেলে অহল্যা। আর পাঁচ ঘরের যা কিছু আবর্জনা ওখানেই জমা হত এতদিন।

অন্যান্য ঘরের পেশাদার ঝিরা একটু চোখ পাকিয়ে দেখে।—ক্ষেন্তি যেতে যেতে বলে, তোমার কি মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই? জমাদার ডাকতে বল।

এই সামান্যের জন্যে! অহল্যা বিস্মিত হয়।

কিছুক্ষণ বাদে পুষ্পি এসে বলল, বাঃ—সুন্দর তো করেছ? আমি ভেবেছিলাম রাঙা মুলো। দাও দাও বালতি দুটো দাও, আমি একবার জল এনে দি। তুমি একটু জিরিয়ে নাও। একেবারে হাঁপিয়ে গেছ দেখছি।—সে জল নিয়ে আসে। চারিপাশের দেয়ালগুলো ঘষে ঘষে ধোয়। এবার চুন-কাম করলে একেবারে ঝকঝক করবে চিনে বাসনের মত।

এ কাজ জানা ছিল না অহল্যার। সে শিখে রাখে। বড় ভাল লাগে তার এই মুখরা কর্মনিপুণা মেয়েটাকে।

বিকালের দিকে ঘরের ভিতরটা চুনকাম করে দিয়ে যায় রাজমিস্ত্রী প্রহ্লাদ। পরদিন সকাল বেলা ঘরের ভিতরটা দেখে অহল্যা আহ্লাদে গদগদ। সার্থক হয়েছে তার পরিশ্রম। সে তখনি মেজেটা মুছে চুনের দাগগুলো তুলে ফেলে।

দেখে-শুনে বাড়ির সবাইর মন কেমন করে যেন। ঋষিদাসবাবু এবং ফুলদিও সে হিসাব থেকে বাদ যান না। মাত্র দুটো টাকা বাড়তি দিয়ে এত বড় একটা দক্ষিণ খোলা কোঠা এ বাজারে দুষ্প্রাপ্য।

ফুলদি ভাবেন, বদলাবদলি করলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত সমালোচনার ভয়ে তা মুখে আনতে পারেন না।

। অহল্যা এ কদিন ফুলদির ঘরেই খাবে। তাই সে-ঘরের কাজকর্মে সাহায্য করে, এ ঘরে এসে দুটো একটা জিনিস গোছায়। কয়লা ভাঙার জন্য পাথর জোগাড় হয়েছে, কিন্তু একটা ভারী লোহা বা হাতুড়ি চাই। পুষ্পি তা সংগ্রহ করে দেয়। বলে, এই দিয়ে সত্যবাবুর এবার তুমি দাঁত ভেঙো—একেবারে কথা শোনে না!

অহল্যা ঈষৎ চোখ রাঙিয়ে পুষ্পির দিকে তাকায়। পুষ্পি খিল খিল করে হাসে। বড্ড ফাজিল মেয়ে তো! কেউ শুনলে কি বলবে?

পুষ্পি চলে যায়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে অহল্যা। পুষ্পির মন্তব্যটা বারবার মনে পড়ে তার। জীবনে কত বার অহল্যা কত লোকের দাঁত ভাঙতে চেয়েছে—পদ্ম, শিবু কেউ বাদ যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দাঁতই ভেঙেছে। আর নয়, ও অহংকারের খেলা আর নয়!

কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে চিঠি লেখেন ফুলদি। একখানা তক্তাপোশ কিনতে হবে, কিছু টাকা অগ্রিমও দিতে হবে বাড়িয়ালাকে। সে কঠিন ব্যক্তি। একটু কথার নড়চড় হলে এসে চেঁচামিচি জুড়ে দেবে। তখন আর মুখ দেখান যাবে না লজ্জায়। ইচ্ছা করলে ফুলদিও যে এ টাকা না চালিয়ে দিতে পারেন তা নয়। তিনি এই সুযোগে সত্যকে পরীক্ষা করে নিতে চান।

অহল্যা এক এক সময় ভাবে, সে চাকরী পেল বটে—কিন্তু তার মাইনে তো ঠিক হল না। হবে, সবই হবে। অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। সে সত্য-বন্ধুর রূপের অনেক ব্যাখ্যা শুনেছে, গুণের পরিচয় কি পাবে না? কাছে এলে

নিশ্চয় পাবে। অমন সুন্দর মানুষ নির্গুণ হতে পারেন না কিছুতেই।' অহল্যা মনে মনেই প্রশ্নের জাল সৃষ্টি করে, আবার মনে মনেই তা অপসরণ করে। সে বদ্ধ জলার মত স্তব্ধ গতিহীন হয়ে থাকতে পারে না।

চিঠির জবাব না এসে একেবারে টাকা এসে পৌছায়।

ফুলরাণী দেবী কার নাম? মনিঅর্ডার—পঞ্চাশ টাকা।

ফুলদি বলেন, এই যে, এদিকে এসো।

দুপুর বেলা। অহল্যা নতুন ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিল। বড্ড গরম। সিমেন্টের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় সে ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। পুষ্পি গিয়ে তাকে ঠেলে তোলে।—ওঠো, ওঠো।

কি?

তোমার বাবু টাকা পাঠিয়েছে।

আমার বাবু!—কিছুই বুঝতে পারেনা অহল্যা।

হ্যাঁ গো—শীগগির যাও, পিওন ডাকছে। দেরী হলে চলে যাবে।

আমার আবার বাবু কে?

কেন, সত্যদার নাম শোননি?—পুষ্পি গম্ভীর হয়ে বলে, যার তুমি চাকরী কর, সে তোমার বাবু। ওঠো, যাও শীগগির। না গেলে তোমার ফুলদি বকবেন।

অহল্যার সব কিছু জানা নেই। তবু ষোল আনা বিশ্বাস হচ্ছে না। একেবারে যে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেবে, তাও সাহসে কুলায় না। সে উঠে দাঁড়ায়। দুষ্টু হাসি হেসে চকিতে সরে যায় পুষ্পি।

অহল্যা সিঁড়িতে পা দিতে ইতস্তত করে।

পুষ্পি এসে এবার আঁচল ধরে টান দেয়।—সুন্দরবাবু বলে অত উতলা হয়ো না ভাই।

রাগে অহল্যা আঁচল ছিনিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ছাই ভস্ম কত কি যে ভাবে!

বেলা প্রায় চারটা বাজে। রোদ ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। বাড়ির দু একটি করে ছেলেমেয়ে নামছে উঠানে খেলতে। অহল্যা উঠে কাপড় চোপড় সামলে কলতলার দিকে যায়। চোখে জল দেবে।

ফুলদি ডাকেন, অহল্যা, অহল্যা।

যাই মা।—সে তাড়াতাড়ি এসে হাজির হয়। মিঃ জান ফুলদির সুমুখে

বসে। অহল্যা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকায়। তার মনটা যেন কেমন করে ওঠে!

একটু চায়ের ব্যবস্থা কর। যাও ঘরের ভিতর সব আছে।

একে আবার কোথায় পেলেন?

আমরা যেদিন সিমসিম রওনা হয়ে গেছি; তারপর দিন নাকি ও এখানে এসেছে।

ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ এ্যাণ্ড সারপ্রাইজিং!—অহল্যার চলার ভঙ্গীর দিকে মিঃ ডাস চেয়ে থাকেন।—সত্যি এমন একখানা ফিগার পাওয়া মুস্কিল। যে এ্যাঙ্গেল থেকে সট নেওয়া যাবে, সেই এ্যাঙ্গল থেকে চমৎকার উঠবে! এখন একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে গলার স্বরটি কেমন।

অনুগ্রহ করে ওটি করতে যাবেন না—অহল্যা এখন এ বাড়ির ঝি।

অত লোক নিন্দার ভয় করলে বড় কিছু করা চলে না। সিনেমা হল এক বিরাট জগৎ। এখানে ঘরে বাইরে সাধক এবং কল্যাণকামীর অন্ত নেই। সমাজকে ঢেলে সাজাই হল তাঁদের সাধনা। লোক লজ্জার ভয় করলে তো তাঁরা সিদ্ধিতে পৌছতে পারবেন না।

আপনিও বুঝি সেই সাধকদের একজন?

যা মনে করেন আপনি—আমি কিছু বলব না। অহং ভাব ভাল নয়।

ফুলদি উঠে গিয়ে চায়ের কাপ, চা, চিনি ইত্যাদি যোগাড় করে আনেন।—দেখুন আর যা-ই করুন বাড়ির ঝি-টির ওপর নজর দেবেন না। কারণ প্রয়োজনের সময় একটি ভাল ঝি মেলান দুষ্কর। ভাঙানি দিলে কেলেঙ্কারী হবে।

ওর কি ফিউচার গড়ে তুলতে আপনি বাধা দিতে চান? ভেরি স্যাড, ভেরি হার্ট রেণ্ডিং!—মিঃ ডাস বিমর্ষ মুখে বসে থাকেন।

এই কদিন বাদে এলেন—আর কি আপনার কথা নেই?

ছিল এবং আজো আছে। কিন্তু ফুলদির তেমন আগ্রহ কোথায়? তিনি যেমন এক দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইছেন নির্দিষ্ট ঠিকানা ছাড়িয়ে, তেমনি চাইছেন মিঃ ডাস। জোর করে কিছু হচ্ছে না, হচ্ছে যেন স্বভাবের ইঙ্গিত। এ যেন পয়েণ্ট, কাউণ্টার পয়েণ্ট। এ যেন এ্যাকসনের রি-এ্যাকসন!

অহল্যা চায়ের জল গরম করে নিয়ে আসে। ফুলদি ধীরে ধীরে চা তৈরী করে দেন। মিঃ ডাস খেতে খেতে ভাবেন, ফুলদির সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক অহল্যার সঙ্গে তা হবার কোনো আশঙ্কা নেই। এই সরলা ঝিটিকে এ ডা

থেকে উদ্ধার করতেই হবে। সাহস করে জীবনে তিনি কিছু করেন নি। এ সমাজে এত সুলভ মেয়ে থাকতে, তিনি একটা শিস টেনেও কারুকে অতিষ্ঠ করে দেখেন নি। এবার দুঃসাহস করে একে মুক্তির আলো দেখাতেই হবে। তিনি অনেকক্ষণ বসে বসে চার পেয়ালা শেষ করেন।

চায়ের বাসন পত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে অহল্যা চলে যায়।

ওর কত মাইনে ঠিক হল?

সত্য এসে যা দেয়—এই দশ, বারো।

অবাক করলেন! অহল্যা একটা প্রতিভা। এতে কি তার পোষাবে?

যখন ফুটপাথে পড়েছিল, তখন আপনি ছিলেন কোথায়? ঘরে না উঠলে বুঝি বার করে নিতে জুত লাগে না? প্রতিভা, আরো কত প্রতিভা যান না, দেখুন গিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে এখানে ওখানে।

ফুলদি যা-ই বলুন, মিঃ ডাস আর কোনো জবাব না দিয়ে সংকল্পে অটুট থাকেন। ফুলদিকে নমস্কার করে দোরের দিকে পা বাড়ান।

এক সময় পুষ্পিকে একান্তে পেয়ে আগ্রহে কাছে বসায় অহল্যা। জিজ্ঞাসা করে মিঃ ডাসের আনুপূর্বিক পরিচয়।—লোকটি কেমন গা?

খুবই ভাল। ওঁর সঙ্গেই তো ফুলপিসী সিমসিম গিয়েছিলেন সত্যদাকে আনতে। ওঁকে দিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই।—আরো অনেক কথা বলে পুষ্পি, তবু কিছুটা সন্দেহ থেকে যায় অহল্যার মনে। ভাবে আজ নয়; আর একদিন জিজ্ঞাসা করবে খুঁটিয়ে।

পরদিন মিঃ ডাস ইস্তিরি করা সার্ট ও পায়জামার ভাঁজ ভাঙেন গুনগুন করতে করতে। তাঁর এক পরিচিত বন্ধু নাকি হালে প্রযোজক এবং পরিচালক হয়েছেন—নাম রণেন রায়। একখানা বই তোলার বিজ্ঞাপন দিয়েই তিনি নাকি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন বাজারে। বইখানার টাইটেল দেওয়া হয়েছে—হৈ হৈ ছন্দ।

মিঃ ডাসের ধারণা রণেন নিশ্চয় সাইন করবেন, কারণ যিনি নামকরণেই এমন মৌলিকতা দেখাতে পারেন, স্যুটিংয়ে তিনি কি যে না-দেখাবেন তাই কল্পনা করা যায় না। এঁকে যদি ভাল করে বোঝান যায়, তা হলে নির্ঘাত কাজ হবে।

এ মাসের বাড়ি ভাড়া আদায় হয়নি। যা কিছু হাতে পুঁজি ছিল তা খরচ হয়ে গেছে কয়েক ঘণ্টার জার্নিতে। কি লাভ হয়েছে একটুখানি প্রথম

শ্রেণীতে চেপে? যার জন্ম এ অর্থ ধ্বংস তাঁর মনে তো কোনো রোম্যান্টিক ভাব জাগল না!

তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করে মুদী দোকানদারের কাছ থেকে গোটা তিনেক টাকা ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। প্রথম হেঁটে, তারপর সেকেণ্ডক্লাশে, তারপর ফার্স্ট ক্লাশে, অবশেষে বেবি ট্যাক্সিতে করে মিঃ ডাস গন্তব্যে পৌঁছান।

গেটে কোনো দারওয়ান নেই। প্রকাণ্ড পাঁচতলা বাড়ি। জগাখিঁচুড়ি ভাড়াটে। মিঃ ডাস ভাবেন, ট্যাক্সি ভাড়া পাঁচ সিকে বৃথাই গেল। তিনি ঠিকানা খুঁজে পাঁচ তলার লিফটে ওঠেন।

তাজ্জব প্রোডাকসন।

একখানা সম্পূর্ণ ফ্ল্যাটই ভাড়া নিয়েছেন বন্ধু রণেন রায়। দরজা, জানালা, দেয়ালে নানা স্কেচ আঁকা হয়েছে হৈ হৈ ছন্দের। বইখানা এখনো মুক্তি প্রতীক্ষায় বটে, কিন্তু যেন উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে . নায়িকা অগুণতি আগন্তুকের দৃষ্টি পথে। মিঃ ডাস বিস্ময় শ্রদ্ধায় ও ঈর্ষায় চেয়ে চেয়ে দেখেন।

একখানা ব্রেন বটে রণেনের।

এমনি মাথা কি মিঃ ডাসের ছিল না? তিনি অভিমানে কালচার করেন নি। যাকগে সে সব বিগত কথা!

কাকে চাই?

মিঃ রায়কে।—একখানা কার্ড বার করেন মিঃ ডাস।

গেটকিপার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, ম্যানেজার সাহেবাকো সাথ? এখন দেখা হবে না। ওসব এখন রাখুন।

তিনি আমার ক্লাশ মেট।

আসুন স্যার। কার্ড লাগবে না। আমার সঙ্গেই চলুন। কিছু মনে করবেন না—দিবারাত্র জ্বালাতনে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ভিতরে ঢুকে মিঃ ডাস অবাক—তাজ্জব প্রোডাকসনই বটে! দুটো কিউ হয়েছে যুবক যুবতীর। চোস্ত সাজসজ্জা—সুর্মা কাজল চন্দন হাওয়াই, টাই। তার ভিতরে রয়েছে বুড়ো বুড়ি ছেলে মেয়ে। এরা নিঃসন্দেহে সব অভিনয় পাগল নয়। ভিতরে একটা জবর গলদ রয়েছে। কিউ দুটো শামুকের গতিতে এগোচ্ছে। এর পিছনে পড়লে আজকার দিন এখানেই কাবার। বদলি খাড়া রেখে কতবার যে বাইরে যেতে হবে ঠিক-ঠিকানা নেই। মিঃ ডাস সকরুণ চোখে তাকান।

আপনি ঘাবড়াবেন না। আমার সঙ্গে এগিয়ে আসুন।—গেটকিপার তিন চারটি সুবেশা তরুণীকে ঈষৎ ঠেলে সরিয়ে দেয়। সুর্মা আঁকা বিলোল কটাক্ষগুলো অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে! কিন্তু কোনো উপায় নেই। লাইনের শেষ প্রান্তে এসে মিঃ ডাসকে একটা সেলাম জানায় গেটকিপার, এবং এমন করুণ নয়নে তাকায় যে তার তুলনা হয় না।—তবে আসি স্যার!

কি চাই আপনার? কিউ ভেঙে এলেন যে? এই বেয়ারা!—কলিং বেল ঘন ঘন বেজে ওঠে।

কিছু সময়ের জন্য লাইন ছুটো থামে। একটু যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে পিছনের ভ্যানিটি ব্যাগ পায়জামা এবং ধুতি প্যাণ্ট। বেয়ারা ওরফে গেটকিপার ছুটে যায়।

আরে বস্ বস্, তুই এমন হ্যাঙলা হয়ে গেছিস! আধ মিনিট অপেক্ষা কর।

বোঝা যায় যে রণেন রায় ঠিকই চিনেছেন। মিঃ ডাস আশ্বস্ত হয়ে একটা সোফায় কাৎ হয়ে পড়েন। যেন সমুদ্র মন্থনের পরিশ্রম হয়েছে।

তোকে না কলেজে আমরা হাড়গিলে বলে ক্ষেপাতাম? কিন্তু তখন তুই এতটা হ্যাঙলা ছিলি নে। চোখে মুখে দিব্যি একটা জৌলুস ছিল।

উত্তরে মিঃ ডাস কি যেন বলতে যান। সেই সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

দাঁড়া আধ মিনিট। আধ মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট কেটে যায়, তারপর আধ ঘণ্টা, অবশেষে পুরো একটি ঘণ্টা। রণেন টেলিফোন ছেড়ে ফাইল ধরেন, ফাইল ছেড়ে ফটো। লাইন আর শেষ হয় না। আজ কয়েকটা রোলের জন্য আর্টিষ্ট সিলেক্ট করতেই হবে, নইলে স্যুটিং বন্ধ। কিন্তু কিছুতেই তা এত পরিশ্রম করেও পারা যাচ্ছে না।

একটা উত্তর দিতে যান মিঃ ডাস।

রণেন বললেন, আধ মিনিট···

আবার ঘণ্টা খানেক গত হয়। মিঃ ডাস মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর নায়িকা ঠিক হয়েছে?

নায়িকা,—একটা চাকর পর্যন্ত ঠিক হয়নি, তুই বলছিস নায়িকা! যার মুখখানা হয়ত দরদে ভরপুর, অশ্রু টলোটলো—তার গলাটা হয়ত হেঁড়ে। যার হয়ত চেহারা কাঠ খোট্টা, তার হয়ত ভয়েস অদ্ভুত ইমোসানাল। আর বলিসনি ভাই, একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি।

ধৈর্য হারালে তো চলবে না।

না, না, আমি ইম্‌পেসেন্ট হবার পাত্র নই। একটু কাছে এগিয়ে আয় বলছি। এলাইন ছাড়া রাতারাতি সাইন্ করার মত কোনো পথ নেই রে।

তা যা বলেছিস!

দেখ এ লাইনে টাকার অভাব নেই, অভাব আর্টিষ্টের। ছোটখাটো রোলের জন্য ভাবিনে—ভাবনা হচ্ছে নায়িকার জন্য। নায়ক আমি নিজে। সেই ভাবেই বইখানা সাজান। বিখ্যাত সাহিত্যিকা সরোজিনী রায়ের স্বামী নাকি একজন জাঁদরেল আই, সি, এস। এই জন্যই নাকি ছুটি নিয়ে কলকাতা এসেছেন। ওরে আজকাল তদ্বির ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া কিচ্ছু হয় না।

টাকা পয়সার অবস্থা কেমন?

সে জন্য তুই ভাবিস নে।—রণেন রায় লাখ পাঁচেকের হিসেব দেন। বড় বড় পার্টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। স্যুটিং আরম্ভ করলেই তা হাতে আসবে।

তবে আর ভাবনা কি?

ঐ যে বললাম নায়িকার। নায়কের তো গুটি দুই লভ সিন ছাড়া কিছু নেই।

আমার খোঁজে একটি নায়িকা আছে। তার দেহের ছন্দই হচ্ছে হৈ হৈ।

কি খাবি? চা, কোকো, না হরলিকস?

কোনোটাতে আপত্তি নেই।

তখনকার মত লাইন দুটোকে হটিয়ে দেওয়া হয়। আজ আর সময় হবে না ম্যানেজারের—জরুরী একটা পরামর্শে তিনি ব্যস্ত। হয়ত এক্ষুণি বার হতে হবে তাঁকে। সকলের মুখ চুন হয়ে যায়—বিশেষ করে মেয়েদের। কেউ কেউ প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে দু তিনটা পোজের ফটো তুলিয়ে এনেছে। কেউ বা ধার কর্জ জাবিন করে শাড়ি।

সবাই জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসব?

বেয়ারা বলে, আমি তো জানিনে।

ধীরে ধীরে আর্টিষ্টের দল মিলিয়ে যায়। ওদের ক্লান্ত পদক্ষেপ শোনা যায় সিঁড়ি পথে।

রণেন রায় একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বয়স কত?

বাইশ তেইশ।

দেখতে কেমন?

বার বার বলব?

বল—শুনতে ভাল লাগছে। এ যেন একখানা ক্লাসিক গান। কতদিন

থেকে আশা করে বসে আছি। আমার টাকার অভাব হবে না—অভাব ছিল নায়িকার।

মঃ ডাস কোকো কাপ শেষ করে বললেন, তার দেহে ছন্দই হচ্ছে হৈ হৈ।

চমৎকার! একখানা ফটো এনেছিস?

তুলতে হবে। আজই একটা ক্যামেরা নিয়ে চল।

ওরা তাড়াতাড়ি একটা দামি ক্যামেরা সংগ্রহ করে নিচে নামে। গাড়িতে উঠে ব্যারাক বাড়ির দিকে রওনা হয়। এমন সময় একটি সুন্দরী মেয়ে এসে দরজা ধরে ডাকে, ম্যানেজার বাবু!

মেয়েটির ঔদ্ধত্য এবং নির্লজ্জতা ওঁদের অবাক করে।—কি চাই তোমার?

আমাকে একটি বার চান্স্ দিন—নায়িকা না করুন, ঝিতেও আপত্তি নেই। আজ প্রায় দেড় মাস ঘুরছি।

আচ্ছা কাল এসো। বলে মোটরে ষ্টার্ট দেন রণেন রায়।

ওঁরা ব্যারাক বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখেন যে, মোটর আর এগুবে না। সুমুখে একখানা ট্যাক্সি পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। সত্যবন্ধু সবে নামছে।

মিঃ ডাস বলেন, রণেন ব্যাক কর, ব্যাক কর!

পনের

ক্লান্ত সত্যবন্ধু গাড়িখানা দেখলেও মিঃ ভাসকে লক্ষ্য করে না। আর রণেনকে তো মোটেই চেনে না সে। বাড়ির ভিতর ঢুকে ডাকে, পিসীমা!

ফুলদি বেরিয়ে আসেন।—এসেছ? তোমার জিনিসপত্র?

গাড়িতে। বলেই সত্যবন্ধু বারান্দায় বসে পড়ে।—উঃ আর পারিনে। কি যে কষ্ট এতটা পথ আসা।

একজন কুলীর দরকার। নইলে ট্র্যাঙ্ক সুটকেশ কে নামিয়ে আনবে? সত্যবন্ধু জানে এ বাড়িতে চাকর নেই। উচিত ছিল তারই একজন লোক সংগ্রহ করে আনা। সত্যর ঐ অবস্থা দেখে ফুলদি তাকে আর কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেন। ড্রাইভারটা ডাকতে থাকে। বাবু! বাবু!

পিসীমা এই টাকা কটা ওকে দিয়ে দেন। একটি বার মিটারটা দেখে নেবেন অনুগ্রহ করে। বোধ হয় চার টাকা চার আনা উঠেছে।

ফুলদি মিটার দেখে ড্রাইভারের পাওনা চুকিয়ে দেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা করবেন লটবহরের?

অহল্যা এগিয়ে আসে। বুকে জড়িয়ে জিনিসগুলো নামিয়ে নিয়ে যায়। একটু আশ্চর্য হয় বাড়ির স্ত্রীলোকেরা। যে দু একটি পেশাদার ঝি ছিল, তারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। ক্ষেন্তি আর চুপ করে থাকতে পারে না। একান্তে বলে, মদ্দা মাগী!

ট্র্যাঙ্কটা ভারি। পুষ্পি ছুটে এসে একটা হাতল ধরে।—সাবধান, পায় পড়বে তোমার।

ওরা দুজনে ট্র্যাঙ্কটা ধরাধরি করে এনে ঘরের মধ্যে রেখে হাঁপাতে থাকে।—বাপরে! এত ভারি কেন অহল্যাদি?

জানব কি করে? এখন সরো বিরক্ত করো না।

বারে বিরক্ত করলাম বুঝি এতক্ষণ? আমি নইলে ওটাকে এত দূর টেনে আনা জুটত না।—পুপ্পি দু একটা জিনিস অহল্যার সঙ্গে গোছাতে গোছাতে বলে, ওটা অত ভারি কেন জানো?

অহল্যা পুপ্পির মুখের দিকে তাকায়। তার বড় বড় চোখ দুটো প্রশ্নে ভরে ওঠে।

গিলে খাবে নাকি আমাকে? ওর ভেতর তোমার জন্য মোটা মোটা গয়না এনেছেন বাবু।—পুপ্পি হিঃ হিঃ করে হাসে।

অহল্যা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। আজ যা ঠাট্টা একদিন তা সত্য ছিল ওর জীবনে।

ঘরের ভিতর থেকে লাঠি ঠক ঠক করে বেরিয়ে আসেন বৃদ্ধ ফুলদির স্বামী।—সত্য নাকি? কেমন আছ?

সত্য পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, ভাল না।

এমন সময় বুড়োর কোমরের কাপড়খানা প্রায় খুলে পড়ে যাওয়ার জোগাড়। ফুলদি ছুটে এসে তা সামলাতে সাহায্য করেন। মনে মনে বিরক্ত হন অত্যন্ত। এমন ভাবে উঠে আসার অর্থ কি? ডাকলে সত্যও তো কাছে যেতে পারত।

তুমি অসুস্থ—এখানে এসে ভুল করেছ। বৃদ্ধ বলেন, তোমার উচিত ছিল কোথাও চেঞ্জে যাওয়া। আমার এমন স্বাস্থ্য এখানে এসে পড়ে গেল। আসলে কিচ্ছু খেতে পাইনে। ক্ষীর তো পাবেই না—রাবড়ির সের পাঁচ টাকা। স্রেফ মিল্ক পাউডার আর ময়দা। আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, তোমার ফুলদিটিও কি আর তেমনি আছেন? শরীর না থাকলে বাপ মেজাজও থাকে না। দিন রাত্তির কেবল খিটখিট। তাই বলি, এখানে এসে তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করনি।

ফুলদির বিরক্তি আরো বাড়ে।—তুমি এখন মহাভারত বন্ধ কর তো। চলো সত্য তোমার ঘরে। চলো, বিশ্রাম করে নাইতে যাবে।

সত্যর হাত ধরে ফুলদি আকর্ষণ করেন। বুড়ো সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তিহীন

নন। তাঁর প্রাণ বিহঙ্গের যেন ডানা ছিঁড়ে যেতে চায়। তিনি যেন ব্যথায় অস্থির হয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন।

ফুলদি বলেন, সত্য তোমার ঘরখানাও যেমন চমৎকার, তেমনি একটি ঝিও পেয়েছি কর্মঠ।

তা তো দেখতেই পেলাম!—সত্য একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসে। অহল্যার তা চোখে পড়ে। সে ঘরের বৌর মত' একটুখানি আঁচল মাথার ওপর তুলে দেয়। দিয়ে কান পেতে থাকে।

তুমি কি ঠাট্টা করছ?

না পিসীমা। সে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখখানা ভরে তুলতে চেষ্টা করে। না, ঠাট্টা করব কেন? কিন্তু ও শোবে কোথায়? ঘর তো একখানা!

কেন বারান্দায়?

শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় কি অতটুকু খোলা জায়গায় বাস করা সম্ভব। যদি হিট নাইট কোল্ডপ্রুফ হয় মন্দ কি?

একটা ত্রিপল কিনে পর্দা টাঙিয়ে দেবে। এতদিন তাঁবুতে কাটিয়ে এলে তবু দেখছি কিছু শিখে এলে না। কত আর ত্রিপলের দাম।

সে জন্য ভাবছি নে। ভাবছি দুষ্টু লোকে হয়ত বলবে ড্রপসিন।

ফুলদি এক চোট হাসেন।—বলুক আজকাল তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তিনিই উপলব্ধি করে দেখেন, তাঁরই যেন অনেক কিছু এসে যাবে। মুখ দিয়ে তিনি বলে ফেলে দিয়েছেন এখন তো আর প্রত্যাহার করারও উপায় নেই। একদিন না একদিন পর্দা আসবেই। তার আগে সত্যবন্ধু নিশ্চয় অনুমতি নিতে আসবে। তখন না হয় নিষেধ করবেন ফুলদি। সামান্য ঝিকে উচিত নয় অতটা আস্কারা দিয়ে বাড়ান।

সত্যবন্ধু বলে, ঘরখানা সত্যি মনের মত।

আগে হলে ফুলদি হয়ত মন্তব্য করতেন, মানুষটিও। কিন্তু এখন তা করেন না। তাঁর অবদমিত প্রবৃত্তি অন্যের মাধ্যমে যা বিকাশ পাচ্ছিল, তা দমন করেন। একবার ভাবেন, ভুল হয়েছে অহল্যাকে স্থান দেওয়া। আবার ভাবেন, না, না—কেউ না কেউ আসতই। জায়গা খালি থাকত না। তবে যা কিছু দোষ হয়েছে ও যুবতী এবং রূপবতী বলে। কিন্তু এখন আর উপায় নেই, এখানেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে গেছে, তিনি কথা ফিরিয়ে নেবেন কোন লজ্জায়?

অহল্যা আর একটু ঘোমটা টেনে দিয়েছিল।

বড্ড বিসদৃশ দেখাচ্ছে। সত্যবন্ধু ওদিকে ভাল করে তাকায় না। বেলা দুপুর প্রায়। হাওয়া নেই। সে ঘামছে। একটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে চেষ্টা করছে বাতাস করতে।

ফুলদির চমক ভাঙে। ওকি, পাখা কোথায় অহল্যা?

সে তো আনা হয়নি।—কুণ্ঠিত অহল্যা জবাব দেয়।

সত্যবন্ধু কান খাড়া করে। এ যেন,তারের ঝংকার।

কেন মনে করে দাওনি? এত জিনিস আনা হল, একি আর হত না। এমন করলে তো চলবে না।—ফুলদি বলেন, যাও কোনো ঘর থেকে চেয়ে নিয়ে এসো। আমার ঘরে যেও না।

অহল্যা কুণ্ঠা ও লজ্জার জালে যেন জড়িয়ে পড়ছিল ক্রমে ক্রমে। সে সুবিধা পেয়ে ছুটে পালায়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে পুষ্পি তাদের বারান্দায় খেলছে।

ভাই পুষ্পি একখানা পাখা দিবি?

দেব। কিন্তু লজেঞ্চ খাওয়াবে?

পয়সা কোথায় পাব?

কেন মাইনে পাবে না? তুমি কি বিনি মাইনের ঝি? বলো, তা হলে লজেঞ্চ চাইব,না।

একে দুপুরের রোদ্দুর। তাতে অহল্যা আরো রাঙা হয়ে ওঠে।

ওর অবস্থা দেখে পুষ্পির করুণা হয়। সে তাদের ঘর থেকে একখানা পাখা এনে দেয় তাড়াতাড়ি।—কে চাইছে?

ফুলদি।

না অহল্যাদি তোমার বাবুটি ঘামাচ্ছেন নিশ্চয়।

এই অন্তর্যামী মেয়েটার কথায় অহল্যাও ঘামিয়ে ওঠে।

অহল্যা ঘরের ভিতর ঢুকে জোরে জোরে বাতাস করতে থাকে। ফুলদির পিঠের কাপড় একটু অসম্বৃত হয়ে পড়ে। গায় ব্লাউজ নেই। সত্য আসার আগে স্নানে চলেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করেই গোছান না।

সত্য ভাল ছেলে। সে ওদিকে ফিরেও তাকায় না। সটান চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে।—আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই পিসীমা। জীবনটা মনে হয় বোঝা। ধোপার গাধার মত এ আর টেনে লাভ কি?

এ কি অলুক্ষণে কথা!—ফুলদি কৃত্রিম ক্রোধে চোখ ছুটো বিস্ফারিত করেন। নয়ন তারায় তাঁর বিদ্যুৎ শিখা।

আর অকৃত্রিম মর্ম-বেদনায় হাতের পাখাটা একটু শ্লথ হয়ে পড়ে অহল্যার। চোখে তাঁর জলভরা কালো মেঘের ছায়া। এক্ষুনি হয়ত ঝরে পড়বে। সত্য চেয়ে দেখে এ রূপ অপূর্ব। অহল্যার গলা শুনে সে সচকিত হয়েছিল—এখন যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়। সিমসিমের দগ্ধ প্রান্তরের ছবি এখনো মন থেকে মোছেনি সত্যবন্ধুর। কিন্তু সেখানে এ কি সজলতার আবির্ভাব!

পাখাটা আমার হাতে দিয়ে তুমি আমাদের উনানে চারটি ভাত চড়াও গিয়ে। ছুটো আলু সেদ্ধ দিও। আর একটা ডিম।

ও আমার সইবে না।

তবে বেগুন দিও ছুটো—কচি ঝিঙেও দিতে পার। যাও তাড়াতাড়ি, আর দাঁড়িও না।

অহল্যা চলে যায়। সত্যবন্ধুর মনে হয় এ ঘরের উজ্জ্বল আলোটাই যেন নিভল। কে এই নারী? কার এ স্ত্রী? কেনই বা এ অচিন্তনীয় যোগাযোগ? তার দু মাসের ছুটি। দিন কটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়। সত্যবন্ধুর মনে পড়ে পাশের বাড়ির মেয়েটির কথা। আর দারিদ্র্যের অবগুণ্ঠন তুলতে যাওয়া নয়। বড় জ্বালা ঘোমটা খোলায়। একবার সে দাগা পেয়েছে যথেষ্ট। তবু মনের সংগোপনে কৌতূহল এসে দানা বাঁধে। কোথায় ওর বাড়ি ঘর? কেন ও ভেঙে এল সহরে? ফুলদির কাছে উপযাচক হয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সত্যর সংকোচে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকে। সে চোখ মেলে না।

অহল্যা ফিরে এসে বলে, মা, বাবু আপনাকে ডাকছেন।

কেন?

চান করতে যেতে বলছেন। দেরী হলে মাথা ধরবে নাকি।

ফুলদি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তবু তিনি সামলে নিয়ে হেসে বলেন, আমি তাঁর মত অথর্ব হয়নি। বলগে আমার মাথা ধরবে না। যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না।

পদ্ম ফুলের কলির মত চোখ ছুটো বোজা। এখনো হয়ত সুস্থ হতে পারেন নি।

একে রোগা শরীর, তাতে গাড়ির ধকল। এক সঙ্গে ছুটো চোট সামলান দায়। তাই শরীর মন দুই নরম হয়ে পড়েছে। বড় মানুষের ছেলে! জীবনে

হয়ত একটুকুও দুঃখের বাতাস গায় লাগেনি। সেই জন্যই হয়ত একটা নেতিয়ে পড়েছেন। অহল্যাদের অবস্থাও কম ছিল না। তবু সে ছিল চাষীর ঘরের মেয়ে—রোদে জলে তার হাড় পাকা। আর এ হচ্ছে আঙুর দানা। তুলোর ভিতর রাখতে না পারলে আর বুঝি ইজ্জত রইল না। একে একে অহল্যার সব গেছে। যা পেয়েছে তাও ভঙুর। তবু যে-টা প্রাপ্ত সত্য—সেইটাকে সে সবলে আঁকড়ে থাকবে। বুকের রক্ত দিয়ে এই দুর্বলকে সবল সতেজ করে তুলবে। এ ভাঙা বন্দর থেকে এবার নোঙর ছিঁড়লে আর রক্ষা নেই—মহাসমুদ্রে বিলীন!

আবার কিছুক্ষণ বাদে অহল্যা ঘুরে আসে। তার মুখ ভার। কি যেন একটা অসুবিধা হয়েছে। অথচ কিছু বলার উপায় নেই সত্যবন্ধুর সুমুখে।

কি, আবার শকুনি এসেছ যে? ভাত হয়েছে নাকি?

না—অল্প একটু দেরী আছে।

তবে তুমি যাও, নামাও গে। এখানে তোমার কোনো কাজ নেই। তার আগে দু বালতি জল পাম্প করে দাও টিউব-ওয়েল থেকে। এই বারান্দায় নিয়ে এসো। সত্য এখানে বসেই স্নান করবে।

ভাত পোড়া লাগবে। আপনি না গেলে বাবু আমাকে এতে দেবেন না। যা তা বলছেন।

ফুলদি রাগে গড়গড় করতে করতে পাখাটা নিয়ে উঠে যান। ওদিকে একটা হট্টগোল শোনা যায়।

সত্যর সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে তখন অবগাহন করছে স্মৃতির জলে। বহু দূরের নয়, বহু দিনের নয়—এখনো যেন ভিজাভিজা লাগছে।

অহল্যা দু বালতি জল নিয়ে আসে।

পাশের বাড়ির সেই মেয়েটি যেন চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে। হিংসা নয়, দ্বেষ নয় তবু যেন চেয়ে চেয়ে দেখছে। অত বড় দুটো বালতি সে বোঝাই করে না আনতে পারলেও, সেও জল আনতে জানে। তার ডানা দুটো আরো সরু, তা বলে ছিঁড়ে যেত না।

বাবু উঠুন—চান করবেন?

সত্য উঠে বসে। চোখ মেলে। অহল্যার আবডালে অরুন্ধতী অদৃশ্য হয়ে যায়।

চোখের চশমা খুলে রেখে সত্যবন্ধু একটা চাবির রিং বার করে। মাত্র

ঠিকানা—

গোটা পাঁচেক চাবি। চকচকে রিংয়ের সঙ্গে একটা চকচকে চেইন ঝুলান।— ট্র্যাঙ্কটা খোলো তো!

এই প্রথম আদেশ। অহল্যার হাত কাঁপতে থাকে। সে চাবি নিয়ে তক্তাপোশের তলায় ঢোকে। দু একটা বাক্স তাদের বাড়িতেও ছিল। কিন্তু এমন কিরিং বিরিং চাবি নয়। সে খানিক যুদ্ধ করে হিমসিম খেয়ে আঁচলে মুখ মোছে।

সত্যবন্ধু জিজ্ঞাসা করে, খুলেছ?

অহল্যা কোনো জবাব দিতে পারে না। সে একটার পর একটা চাবি পালটায়।

ফুলদি ঝগড়া তর্ক সেরে এসে বলেন, কি এখনো যে স্নান করতে যাওনি?

কাপড় জামা কোথায়? আপনার অহল্যা তো বাক্স খুলতে পারছে না।

অহল্যার মাথাটা যেন কাটা যায়। সে ভাবে, এর চাইতে মরণ ছিল ভাল।

এসো চাবিটা দেখিয়ে দিই।

এবার বাক্স খোলার শব্দ হয় একটা কট্ করে।

ফুলদি মন্তব্য করেন, এই তো পেরেছে। এমনি করে শিখিয়ে বুঝিয়ে নিলে সব পারবে। ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এখনো এখানের সব কিছু সরল হয়নি।

সত্যবন্ধু বলে, আমিও তো তথৈবচ।

সে জন্য ভাবতে হবে না। আমরা রয়েছি কি জন্য?

একটা শিশি পড়ার শব্দ হয়। এত সাবধান হয়েও অহল্যা হাত ঠিক রাখতে পারে না। এ এক দুর্ভাগ্য বটে।

ভাঙলে বুঝি?—সত্যবন্ধু উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। ফুলদিও ম্রিয়মান হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি মেদস্ফীত দেহখানা তক্তাপোশের নিচে নিতে পারেন না।

না।

যাক্। এখন হুশিয়ার হয়ে শিশিগুলো নামিয়ে রাখো। এবার টুথ পেষ্ট আর ব্রাসটা আগে দাও। তারপর সোপ কেসটা। না, সোপ কেসটাই আগে নামাও।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল মাত্র একবার। কিন্তু এ যে বারবার! ভগবান অহল্যাকে বাঁচাও। অহল্যার হৃদপিণ্ড অতিক্রুত নাচতে থাকে। এখন সে যে কতগুলো শিশি বোতল ভেঙে ফেলবে, কে জানে!

ইংরেজী নাম বুঝতে পারছে না, বাঙলায় বলো।

আপনি বলুন।

আগে সাবানের বাক্সটা দাও।

এই যে।

এবার দাঁত মাজার বুরুশ—সেই কুচি কুচি, তারপর—ফুলদিও হেসে ভেঙে পড়েন। টুথ পেষ্টের বাঙলা তর্জমা করতে পারেন না।

সত্যবন্ধু নিচে নেমে বলে, তুমি সরো।

অরুন্ধতী সুযোগ বুঝে আবার আসে, বলে, আমাকে ডাকলে তো এত বেগ পেতে হত না!

সত্যবন্ধুর মুখ ধুয়ে স্নান সারতে বেশ খানিকটা সময় কেটে যায়। হাতে হাতে কাপড় গামছা এগিয়ে দেয় অহল্যা। একটু লজ্জা লজ্জা করে। তবু উপায় নেই। জল এনে দেয় আরো দু বালতি। সত্যবন্ধু ভাবে এমন স্নান সে কত দিন করেনি! কিন্তু মোহান্তি প্রতি মাসে বলে না-বলে বকশিশ আদায় করেছে অন্তত পঁচিশ টাকা।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সত্যবন্ধু প্রশ্ন করে, তোমার বাড়ি কোথায়?

ফুলদি স্নান করতে গেছেন। একা একা কথা বলতে লজ্জা করে। অহল্যা চুপ করে থাকে। যেন সত্যর প্রশ্ন কানে যায়নি।

বলবে না?

কেন সে বলবে না? কিন্তু মুখ দিয়ে যে বাক্য সরে না অহল্যার।

এক জায়গায় থাকলে তো কথা না বললে কাজ চলবে না!

তাও জানে অহল্যা। কিন্তু পরিচিত শিবুর সঙ্গেও একদিন এমনি কথা বলতে পারেনি। এ তার স্বভাবের এক দোষ। এর ওপর হাত নেই মানুষের।

ফুলদি স্নান সেরে পরিপাটি হয়ে আসেন।—চলো খেতে।

একটু হেসে অহল্যার দিকে চেয়ে সত্য চলে যায়। এবার অহল্যা ভাবে, হঠাৎ সূর্যটা যেন মেঘে ঢাকা পড়ল। তাই ঘরটা গেল অন্ধকার হয়ে।

কি জিজ্ঞাসা করছিলে ওর কাছে?

ওর বাড়ি ঘরের পরিচয়। কিন্তু ওকি বোবা? হ্যাঁ, বোবা নইলে আমার ভাগ্যে জুটবে কেন? বিধাতা খোলের আন্দাজে নৈচেটি ঠিকই তৈরী করে রাখেন।—একটু বিষাদের সুর বেজে ওঠে সত্যর কণ্ঠে।

ফুলদি ত্বরায় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? টাকা পয়সা দিয়ে লোক রেখে যদি মনের মত না হয়, তবে শিকড় গাড়ার আগেই তুলে ফেওয়া ভাল।

না, মা—আমি তা বলিনি।

এমন মোহান্তিকে যে একদিনের জন্য তেজপুর পর্যন্ত পাঠাতে পারেনি—শুধু শাসিয়েছে—ফুলদির কথায় সে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলদির ওপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে পড়ে। এঁরা না ভেবে চিন্তে হট্ করে এমন গুরু দণ্ডও দিতে পারেন! এঁদের রূপ কি মাকালের ঐশ্বর্য? না ভিতরে ভিতরে জ্বলছে প্রচ্ছন্ন বহ্নি?

অহল্যা পিছন পিছন এসে ওঠে।

বেশ বড় একখানা হাতের কাজকরা উলের আসন ওঁজ বাক্স থেকে নামিয়েছেন ফুলদি। রূপোর মত চকচকে থালায় পরিবেশন করেছেন ভাত। জলে কর্পূরের মৃদু গন্ধ। ফুলের মত গুটি কয়েক ছোট বাটিতে ব্যঞ্জন। তবু একটু গম্ভীর মুখে খেতে থাকে সত্য।

ওকি অমন করে খাচ্ছ কেন? মাছ নেই, মুখে বুঝি ভাল লাগছে না?

আপনি কি আমাদের ক্যাম্পের খাওয়া দেখেন নি? বারমাসই তো আমরা সেদ্ধ পোড়া খাই। সে তুলনায় এ তো রাজভোগ।

তবে বুঝি রান্না ভাল হয়নি। একটু যত্ন নিয়ে রাঁধতে হয় মেয়ে পরের ঘরে কাজ করলে!

আমি তো—

চুপ করো। একে না একটু আগে তুমি বোবা বলেছিলে—এখন দেখছ? এরপর খৈ ফুটবে। এখনো পালক গজায়নি, গজালে না জানি কি পাখি হবে!

এত করে ওকে বলার কোনো অর্থ হয় না। মোহান্তির হাতের রান্না খাওয়ার পর ভূ-ভারতে কি কারুর রান্না খারাপ লাগতে পারে? আদপে আমারই হয়েছে অরুচি।

অনেক চিন্তা করে ফুলদি বোঝেন, এ অরুচি মুখের নয়, নিতান্তই মনের। সত্যর যেন কি হয়েছে!

ষোল

সন্ধ্যার পূর্বেই অহল্যা নিজের উনানে আঁচ দেয়। আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে সংসার করা চলে না। তাতে অনেক জ্বালা, অনেক অন্তরায়। ফুলদির অসমতল ব্যবহারের সঠিক কারণ সে বুঝে উঠতে পারে না। আঁচ দিয়ে সে সংসারের টুকিটাকি কাজ সারে। বারান্দার কোন্ দিকে বসে রাঁধলে বাবুর অসুবিধা কম হবে, তা স্থির করে। সংগ্রহ করে রাখে চা মিল্ক পাউডার চিনি চামচ।

কিন্তু উনানে আঁচ ওঠে না। কি যেন গণ্ডগোল হয়েছে কয়লা এবং ঘুঁটে সাজাতে। অহল্যা একেবারে যে আঁচ দিতে জানে না তা নয়। কয়েকবার সে চেষ্টা করে বিফল হয়ে ভাবতে থাকে। কেউকে যে জিজ্ঞাসা করবে, তাও লজ্জায় বাধে।

অসুস্থ সত্যবন্ধু একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে উঠে দেখে যে বেলা গেছে। সে মুখে চোখে জল দিয়ে বলে, অহল্যা একটু স্বর্ণসিন্দুর মেড়ে দেবে? তুমি না পার, আমাকে সব যোগাড় করে দাও। কিন্তু আমিও কি পারব?— সে একটু ভেবে বলে, না হয় পিসীমাকেই ডাকো।

এর পরই হয়ত বাবু চা চাইবেন। অহল্যা মনে মনে যেন দুঃস্বপ্ন দেখে। তবু সে একটু গলা ঝেড়ে বলে, কেনে আমিও পারব। মাকে ডাকার দরকার হবে না।

কেনে উক্তিটা শুনে সত্যবন্ধুর ভক্তি চটে যায়। সে বলে, তুমি যতই পার, তবু একবার অভিজ্ঞ মানুষকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া ভাল। এখন বিকেল-বেলা, বোধ হয় আমার একটু বায়ু ক্ষেপেছে—তুমি কি বলতে পারবে এ সময় কি অনুপান খাটবে?

চালের জল আর মধু। বাবা তো তাই দিয়ে খেত। এ হচ্ছে মাণিক কবরেজের বিধেন।

অহল্যার কথাবার্তা যেমনই হক, ও একেবারে তুচ্ছ করার মত নয়। মাথাটা টনটন করছে, শরীরটা চাইছে ভেঙে পড়তে—তবু সত্যবন্ধুর মনে হয়, এমন অভিজ্ঞতার স্পর্শ এবং দেখা পেলে বুঝি বেঁচে ওঠাও আশ্চর্য নয়। সে তো সত্যি সত্যি মরতে চায় না। এ পৃথিবীর আলো বাতাস উত্তাপ ছেড়ে সে যদি চলে যেতেই চাইত, তবে আর প্রবীণ কবিরাজ দেখিয়ে এতগুলো ওষুধ কিনে এনেছে কেন? এ ব্যয় সে কলকাতা পা দিয়েই করেছে।

এতদিন ক্যাম্পের চিকিৎসা দেখে ডাক্তারীর ওপর তার আর আস্থা নেই। কারুর অনুরোধের প্রতিক্রিয়া নয়—প্রবৃত্তির দুর্লঙ্ঘ্য আকূতি। সে সত্যই বাঁচতে চায়। তবু মাঝে মাঝে সে যে ভিন্ন কথা বলে, হা হুতাশ করে, তার কারণ, সে মনে মনে বড় ভীরু, বড় অসহায়, বড় দুর্বল।

অরুন্ধতী এসে বলে, অনেক ভেবে দেখলাম, যদিও তোমার কাছেকাছে পাশেপাশে আছি, তবুও আজ তোমাতে আমাতে অতলান্ত ব্যবধান। তুমি পুরুষ হলেও কুণ্ডলতা। যদি কারুকে আশ্রয় করে বাঁচাতে পারো তাতেই আমার আনন্দ। ওগো তাই কর, তাই কর।

ঘরের ভিতর সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে।

সত্যবন্ধু চোখের চশমাটা খুলে চোখ মোছে। চশমাটাও মোছে। কদিন যেন এটাকে পরিষ্কার করা হয়নি।

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলে তাই বিরক্ত করতে আসিনি। এখন শরীরটা নিশ্চয়ই ঝরঝরে ঠেকছে—কি বলো? ফুলদি কাছে এসে দাঁড়ান।

সত্য বিরক্ত হয়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। কঠিন কথা বলায় সে তেমন অভ্যস্ত নয়।

চা খেয়েছ?

না।

কেন? অহল্যা—

আমি এখন একটু স্বর্ণসিন্দুর খাব।

ও!

ঐ সামান্য একটি কথা বলে ফুলদি চুপ করে যান। কিন্তু তার মর্মার্থ অনেক গভীর। সত্যবন্ধু একটু চিন্তা করে বলে, আমি না খেলে কি হয়,

আপনি তো খাবেন! গরিবের ঘরে গৃহ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন নিশ্চয়। অহল্যা—

ফুলদি ভিজা চুলেই ঢিলা খোপা বেঁধেছেন। পরেছেন একখানা কালো মখমলের পাড়ের মিহি শাড়ি, দেহে তার চেয়েও মিহি একটা ব্লাউজ। সূক্ষ্ম হলদে সুতোর কাজগুলো ঝকঝক করছে। পায় ঘন আলতা। অন্ধকার হয়ে এসেছে, তবু দেখাচ্ছে সব।

ভাড়া বাড়িতে যদিও বা এটুকু আপ্যায়ন পাই, নিজের হলে তো কথাই নেই—তখন বৌ আসবে, পিসীমাকে হয়ত চিনবেই না। সেইজন্যই এখন যা পাচ্ছি তা অগ্রাহ্য করব না।

এখন আর অরুন্ধতী আসে না। সে জানে সত্যবন্ধুর জীবনে সে এখন মৃতা। সন্ধ্যার আঁধারে যেমন দিনান্তের সোনা। অর্থহীন, শুধু একটা ব্যথা।

সত্যবন্ধু আবার ডাকে, অহল্যা!

একটা আলো নিয়ে আসে পুষ্পি।—অহল্যাদি আসছে।

সত্যবন্ধু বলে, আর এসেছে! এতক্ষণে একটু স্বর্ণসিন্দুর দিতে পারল না!

কেন কখন তো সে দিয়ে গেছে। সত্যদা আপনি কি পুরু লেন্সেও দেখতে পান না?—স্বর্ণসিন্দুরের খলটা ও জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় পুষ্পি।

চা?

অমন করে ম্লে বলছেন? আমি কি আপনার অহল্যা?

সত্যিই এতটা উষ্মা প্রকাশ করা অশোভন হয়েছে। সত্যবন্ধু বলে, ছিঃ ছিঃ সেকথা কি আমি বলেছি! তুমি বড্ড ভাল মেয়ে। একটু তাড়াতাড়ি আনতে বল।

আপনি কি ভাসুর? বারান্দায় এগিয়ে বলুন না! এ তো দশ বিশ ক্রোশ পথ নয় যে ট্রেনে যেতে হবে?

ফুলদি গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন। এবার পুষ্পির তাঁর দিকে নজর পড়ে। সে ছুটে হাওয়া।

অহল্যা ঘরে ঢোকে। নিজের উনানে আবার আঁচ দিয়েছে পুষ্পির সাহায্যে। কিন্তু তা এখনো ভাল করে ধরেনি। অন্য ঘর থেকে আনতে হয়েছে জল গরম করে। দুটি মুড়িও ভেজে এনেছে নুন ঝাল আদার কুচি ছিটিয়ে। বেশ একটা আমেজি গন্ধও আসছে পেঁয়াজের।

সত্যবন্ধু মনে মনে সন্তুষ্ট হয়।—নিন পিসীমা।

তুমি তো খাবে না?

না। কিন্তু গন্ধে খেতে ইচ্ছে করছে।

কুপথ্যের ওপর রোগীর অমনি লোভ হয়। এ দমন করা ছাড়া উপায় নেই।

সেই তো! শুধু ব্রহ্মচর্য—কথায় কথায় সংযম। কিন্তু আমরা বাঁচব কদিন!

এক মুঠো মুড়ি মুখে দিয়েছেন ফুলদি। তিনি না চিবিয়ে থামেন। সত্যিই তো, বাঁচব কদিন! এ যে নিষ্ঠুর খেদোক্তি! সত্যর কিবা বয়স—সে যদি একথা বলে, তবে ফুলদির তো আর কিছুই বক্তব্য থাকে না! এমন গরম ভঙুর মুড়িগুলোও তিনি যেন দাঁত দিয়ে পিষতে পারেন না। তাঁর কানে যেন ঝিঁঝির ডাকের মত বাজতে থাকে, আর কদিন!

কেমন লাগছে পিসীমা?—নোলায় জল এসেছে সত্যবন্ধুর। সে প্রশ্ন করে, নিশ্চয় সার্টিফিকেট পেতে পারে অহল্যা, কি বলেন?

ফুলদি মনে মনে আবার স্বস্থানে ফিরে আসেন। জবাব দেন, আমার হাত জোড়া, তুমি লিখে দাও যে মুনকটা হয়েছে।

তা হলে ফেল করেছে অহল্যা? আদা ঝাল সুগন্ধ সবই বৃথা! ভেরি স্যাড।

অহল্যা সম্যক কিছু বুঝতে না পারলেও, এটুকু বোঝে যে ফুলদির মন্তব্য কিছুতেই সত্য নয়। সে ইংরেজী না জানলেও নুনকটা করার মত তার হাত নয়। কিন্তু মুস্কিল, কি করে প্রমাণ করাবে? সে বেরিয়ে বারান্দায় চলে যায়।

পিসীমা তবে তো একে পারমানেন্ট করা চলে না!—সত্য হাসে।

অহল্যা ভাবে, তুলে দেবে নাকি?

ফুলদি বলেন, তুমি তো জানো না, ও পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াত। এ বাড়ির সবাইর অনুরোধে ওকে রাখা। তোমার যদি পছন্দসই না হয়, এখনো সময় আছে, যা অভিরুচি করতে পার। ইওর সুইট উইল—কটি চকচকে দাঁত বেরিয়ে পড়ে হাসির ঢেউতে। তিনি ধীরে ধীরে পেয়ালাটায় চুমুক দেন।

অহল্যা মনে মনে বলে, তার মা বেঁচে আছে কি নেই তা এখন সে জানে না। ফুলদির কোলে মা বলেই সে আশ্রয় নিয়েছে। এখন ফুলদি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ঠাকুর! ঠাকুর! অহল্যা হাতের কাছের অপ্রয়োজনীয় কাজগুলোই করতে থাকে।

কলতলা আসতে যেতে এ ঘরের সুমুখ দিয়ে পথ। একটা থালি বালতি নিয়ে পুম্পি এসে দাঁড়ায়।—কি গো বৌ ঠাকরুন, সব কাজ হাতে হাতে করে দিলাম; চা থাক, ছুটি মুড়ি দিয়েও তো আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে না?

অহল্যা বলে, মুড়ি তো নেই ভাই।

ঐ যে কড়াতে রয়েছে। ও বুঝি তুমি থাবে? থাও ভাই, তোমার বাবুর জিনিস তুমি থাবে, বাবু শুকবেন, আমি কে?

একেবারে এত কটা মুড়ি রয়েছে কড়াইতে লেগে। ও কি কারুকে দেওয়া যায়! অহল্যা চুপচাপ বসে থাকে।

বালতিটা রেখে পুম্পি বারান্দায় ওঠে।—কি এখন কথা বলছ না যে বৌ ঠাকরুন? সে কুড়িয়ে কাছিয়ে মুড়ি কটা মুখে দিয়ে বলে, কি চমৎকার যে হয়েছে অহল্যাদি। সত্যি আর একদিন পেট ভরে থাইও।

সে স্বাধীনতা অহল্যার নেই। তবু বলে, আচ্ছা! থাওয়াব।

ফুলদি বলেন, এখন আমি তবে উঠি—ওঁকে একটু দেখে আসি।

সত্যবন্ধু কোনো জবাব দেয় না।

আরো থানিক আবোল-তাবোল বকে পুম্পি চলে যায়। এই মেয়েটার পাগলা উক্তিগুলো বড্ড ঝাল-কুটা তবু শুনতে মন্দ লাগে না। কোনো ভিত্তি নেই, কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যঞ্জনা! ওকে এসব কে শেখাল? কেউই শিখাই নি। এ ওর নিজস্ব প্রতিভা।

রিষ্টওয়াচ্‌টা দেখে সত্যবন্ধু আবার শুয়ে পড়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে তাকে আবার একটা ওষুধ খেতে হবে। এবার অনুপান পানের রস আর মধু।

পান কি আছে অহল্যা?

না।

কাল বাজারের সময় মনে করে দিও—ওষুধ খেতে লাগবে।

অহল্যা মাথা নাড়িয়ে বলে, আচ্ছা।

মধু কি আছে?

ছেলেমানুষি প্রশ্ন। অহল্যার একটু হাসি পায়। সাধারণ ঘুঁটে কয়লা চাল ডালের মত এসব কি কেউ আগে-ভাগে সংগ্রহ করে রাখে?

কখন খেতে হবে ওষুধ তাই জিজ্ঞাসা করে অহল্যা।

এই একটু বাদে।

তবে কাল এনে আজকার কাজ চলবে কি করে? ভাতের হাঁড়িটা উনানে

চাপিয়ে' অহল্যা উঠানে নামে। এ বাড়িটাই এই একটা সুবিধা—থাকলে কেউ না বলে না। পল্লীগাঁয়ের মত আদানপ্রদান চলে। প্রথম ফুলদির ঘরেই যাওয়া উচিত, কিন্তু অহল্যার তা সাহসে কুলায় না। সে অনেক বিবেচনা করে কালো-বৌর ঘরে যায়।

বৌদি! তুমি তো পান খাও, একটা পান দেবে?

এত গরজ যে? আমার হাত জোড়া। তুমি সেজে নাও। দেখ আবার চুন বেশি দিও না, নতুন মানুষের মুখ পুড়ে যাবে।—ভাতের মাড় গালতে গালতে একটু হাসে কালোবৌ।

আমি শুধু একটা গোটা পান চাই, ওষুধে লাগবে।

একটা কেন, দুটো নাও। কিন্তু কারুকে যেন আবার গুন-জ্ঞান করো না।

মধু আছে?

তা আর জমতে দেয় না ভাই—পাশের কোঠায় দেখ।

অহল্যার তত পরিচিত নয় পাশের বৌটি। সে একটু ইতস্তত করে।

আচ্ছা আমিই বলে দিচ্ছি। কালোবৌ একটু মুখ বাড়িয়ে বলে, ও সুমি তোর কি মধু আছে?

আমার মধু! কে চাইছে? কার এমন সাহস?

অহল্যাবাবু দূতী পাঠিয়েছেন। একটু ওষুধ খাবেন, দিতে পারিস?

তাই বল। দূতীকে এখানে পাঠিয়ে দে।

পান দুটো নিয়ে সলজ্জ হাসি হাসতে হাসতে অহল্যা গিয়ে পাশের কোঠায় ওঠে।

মধু নেবে যে কিছু এনেছ?

তবে খলটা নিয়ে আসি, কি একটা শিশি।

না এই শিশিটাই নিয়ে যাও। একেবারে গোটা ধরা আছে। সময় মত আর এক শিশি এনে দিলেই চলবে। এখনো আমার ঘরে কিছুটা আছে। কচি ছেলের ওষুধপত্রে আর কত লাগে। ওঁর কেবল বাড়তি আনার অভ্যাস। তা মধু তো ঠিক অনুপানেই লাগবে, না মুখে ছোঁয়াবে?

কোনো জবাব না দিয়ে অহল্যা নেমে আসে।

তার বাবুকে নিয়ে শুধু পুষ্পি নয় সবাই ঠাট্টা মসকরা করে। এর কারণ কি? বাবু তো কারুর ঘরে এসে অবধি যান নি। কেবল যা একটু গিয়েছেন ফুলদির ঘরে। তাও একান্ত ভদ্রতার খাতিরে। তবু এ শর নিক্ষেপ কেন?

বোধ হয় রূপ।

উঠানটুকু পেরিয়ে আসতে কত রকম ভাবের ইন্দ্রধনু যে বর্ণালী ছড়ায় অহল্যার মনে! এতকাল অভাব দারিদ্র্যের কালো মেঘে তো এ বর্ণ বিস্তার সে দেখেনি। এ ভাল, না মন্দ সে বুঝতে পারে না। সে শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁটে। উঠানটুকু শেষ হয়। আসে এ্যাসবেষ্টোর ছাউনি। তার অন্তরালে মিলিয়ে যায় রঙিন রেখাগুলো।

ঘরে ঢুকে অহল্যার মনে হয় যে বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন সে কি করবে? ঘুমন্ত রোগীকে কি ডাকা উচিত? না ডাকলেও তো ওষুধ খাওয়া হবে না। আবার ডাকলে হয়ত রুষ্টও হতে পারেন। সে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে। ওদিকে আঁচ জ্বলে যাচ্ছে। সে একটু শব্দ করে মধুর শিশিটা রাখে। আলোটা কমায় বাড়ায় মিছামিছি।

ওষুধ না হয় খেলেন না। ভাত তো খাবেন। কিন্তু কি দিয়ে? কোনো নির্দেশই তো নেওয়া গেল না। সমস্যা ক্রমে বাড়ে।

সত্যবন্ধু ঠিক ঘুমে নয়—ঘোরে। একা একা ক্যাম্পের জীবন যাপন করে সে এ ঘোর অভ্যাস করেছে। কিছু না ভেবে নিজেকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। চোখ মেললেই শুধু অভাব অভিযোগ অনাহার অর্ধাহারের প্যানপ্যানানি। শুধু কঙ্কালসার মানুষের নগ্ন প্রার্থনা। কিছু সে করতে পারবে না, তবু তার মাংস টানা।

আর ঘোর অভ্যাস করতে হয়েছে নিজেকে হতাশার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। এ ঠিক মুক্তি নয়। ভীরু বিপর্যস্ত শশকের মত মাথা গোঁজা। সুখ-সুপ্তি তার জীবন থেকে অনেকদিন বিদায় নিয়েছে। এ ঘোর আফিংয়েব নেশা।

অহল্যা দু জনের আন্দাজ চাল চড়িয়েছে। একা একা আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের দিকে কান খাড়া করে। কিন্তু সত্য-বন্ধুর কোনো সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত মানুষও তো এমন নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকতে পারে না। সেও তো একটু নড়ে চড়ে। অহল্যার ভয় হয়।

এতদিন কোনো নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ছিল না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাবুডুবু খেয়েছে অনেক। যদিও বা একটু জুটল, তাও যেন টিমান। সে উনানে আবার কয়লা দিয়ে বাতাস করে। আঁচ ওঠে জ্বলন্ত। তার মুখখানা প্রভাদীপ্ত হয়ে ওঠে। মনটাও।

কি ভেবে সে যেন পুষ্পিকে ডাকতে যায়।

ও ভাই পুস্পি !

চুপ, ভাই অহল্যাদি—মা পড়তে বলেছে মন দিয়ে। একটু দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।

পুস্পির মা আবার কি ভাববে, অহল্যা চলে আসে দ্রুতপদে। ভাতের হাঁড়িটাও ঢাকা হয়নি ভাল করে। সে হাঁড়িটা ঢেকে গোটা কয়েক আলু কুটে নেয়। একেবারে উনান বসিয়ে না রেখে একটু নিরামিষ ডালনা রেঁধে রাখবে।

কি জন্ত ডাকছ অহল্যাদি ?

ওষুধ না খেয়ে বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাই নাকি ? এত বড় কথা? বড্ড সাহস তো তোমার বাবুর।—পুস্পি ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে। পা টিপে টিপে এগোয়। একটা চিমটি কাটে গিয়ে সত্যর পায়।

সত্য ধড়মড় করে উঠে বসে।

ওষুধ খাবে কে ?

সত্য হাত ঘড়িটা দেখে বলে, ঠিক তো—কিন্তু এখন যে আর সময় নেই।

পুস্পি জিজ্ঞাসা করে, কেন, কি হল ?

ভাত খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আর রাত করা উচিত নয়। তাহলে নাকি পরিপাক হবে না। ভাতই দাও অহল্যা। ডিউটিটা সেরে ফেলি।

অহল্যা তাড়াতাড়ি ডালনা নামায়। তাড়াতাড়িই ঠাঁই পিঁড়ি করে দেয় নিপুণ গৃহিণীর মত। ভাতের থালা সুমুখে দিয়ে একখানা পাখা নিয়ে অপেক্ষা করে।

সত্যবন্ধু বলে, এখন আমার খাওয়া হবে না। পেটটা যেন চিনচিন করছে। এখন ঢেকে রাখো, পরে দেখা যাবে।

অহল্যা কথা মত কাজ করে। কিন্তু সত্যবন্ধুর আর খাওয়া হয়নি। অহল্যার রাতটাও কেটেছে উপোষী।

সত্যবন্ধুর এই সুদীর্ঘ সময়টা কেটেছে তন্দ্রায় ও ঘোরে। ভোরবেলা সে বিছানা ছেড়ে উঠেই বলে, আঁচ দাও, বাজারের ব্যাগ দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে—বল তো এখন কি করি ?

অহল্যার শরীরটাও দুর্বল বোধ হচ্ছে। তবু সে সস্নেহে জবাব দেয়, আপনাকে কিছু করতে হবেনি। আগে মুখ ধুয়ে আসুন। তারপর সব বলে দিচ্ছি আমি।

সত্যবন্ধু বলে, যাক বাঁচালে তুমি।

সতের

ফুলদির রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি।

শুয়ে শুয়ে তিনি পরিক্রমা করছিলেন জীবনের দিক চক্রবেখা। কি দিলাম, কি পেলাম এ সংসারে? হিসাব নিকাশে তাঁর কোনো উদ্বৃত্ত অংক নেই। শুধু দেনা। কিন্তু তিনিও তো আর পাঁচ জনার মত মূলধন বিনিয়োগ করেছেন যতটা করা যায়। জীবন যৌবন দুর্লভ রূপ কিছুই বাদ যায়নি সে হিসাব থেকে।

পাব না, কেন দেব—এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন। রাত গভীর হয়েছে। বাড়িটা সুপ্ত। তিনি বারান্দায় বেরিয়ে আসতে চান। আঁচলে টান পড়ে।

কোথাও যাও?

গলায় দড়ি দিতে। অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও।

রাত গোটা দশেকের সময় তিনি একবার নিঃশব্দে বার হতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যেন তাঁব অঙ্গের বোঝা প্রেতাত্মাটি তাঁকে ছাড়েনি। অঙ্গের নয় জীবনের শ্বাস রোধ করা ফাঁস। তখন তিনি কিছু জবাব দেননি। নীরবে শুধু ছটফট করেছেন। এখন আর জবাবটা তিনি না দিয়ে পারলেন না।

ইচ্ছা ছিল সত্যকে একবার দেখে আসতে। রুগ্ন মানুষ। এসেছে তাঁরই ভরসায়। তিনি যে কতখানি শুভানুধ্যায়ী এখনো বুঝতে পারেনি সত্যবন্ধু। তাঁকে শুধু মৌখিক নয়—কার্যে বুঝিয়ে দেওয়ার মত সুবিধাও পান নি তিনি। প্রধান ও প্রথম অন্তরায় তাঁর সঙ্গের প্রেতাত্মাটি। ইচ্ছা করলে তিনি নির্লজ্জের মত চেঁচামেচিও জুড়ে দিতে পারেন।

দ্বিতীয় অন্তরায় অহল্যা। কিছু সে বলেনি। কিন্তু প্রবেশের দুয়ারগুলোতে যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়াচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে যেন একটা দাবী খাড়া করছে। অথচ অহল্যা দাসী, আর তিনি হচ্ছেন ঠাকুরাণী। আবার এ চাকুরীতে অহল্যাকে বহালও করেছেন স্বয়ং ফুলদি। এ এক পরিহাস।

পরিহাস নয়—প্রবৃত্তি। কি যেন চিরন্তন অভ্রংলিহ সত্য আছে অহল্যার পিছনে। কিন্তু ফুলদির তা নেই। দুর্বলের হাতের অস্ত্রও যে সময় সময় কি বলিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়!

ফুলদি বলেন, আঁচল ছাড়ো।

যেখানেই যাও একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।

মরার পর কোথায় যাব? প্রেতিনী হয়ে তোমারই তো ঘাড় মটকাতে আসব প্রথম। শীগগির আঁচল ছাড়ো।—একটা ঝটকা দিয়ে দ্রুত পদে বেরিয়ে পড়েন ফুলদি।

এখনো সত্যের ঘরে বাতি জ্বলছে। অহল্যা বোধ হয় সজাগ। তিনি কোথায় যাবেন? বাড়ির বড় গেটটা খোলা। তিনি এগিয়ে যান। সুমুখের পথটা নির্জন। কিন্তু দিনের দাহ যেন এখনো কমেনি। সূর্যাস্তের শেষ শিখা এখনো যেন ইট পাথরের বুকে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে জ্বলছে। তাঁর ভিতরও কি অমনি একটা শিখার প্রদাহ চলছে?

ফুলদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। সুমুখে অনেকখানি খোলা জায়গা। ওঁর মনে হয় ওঁর জীবনের ভবিষ্যত যেন দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত। পিছনে ঘিঁঞ্জি ইট শুরকী লোহার বাধা—অবশ্য তিনি টক্কর খেতে খেতেই এগিয়ে এসেছেন। ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তাঁর দেহ। সুমুখে দেখা যাচ্ছে উন্মুক্ত স্বাধীনতা—উন্মুক্ত দিগন্ত। তিনি চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেই পারেন।

আবার ফুলদি এগিয়ে যান খানিকটা।

এতকাল তিনি ভুল করেছেন। অকারণে তিনি ক্ষত করিয়েছেন তাঁর সুকুমার ফলের গুচ্ছগুলো। শুধু দংশন করেছে দানবে। আজ তাঁর বলার কিছু থাকত না যদি সত্যিই তাঁকে খেয়ে ফেলতে পারত। নখে দাঁতে ক্ষত করে কেবল উত্তাপ বাড়িয়েছে, নিবৃত্তি আনতে পারে নি—শুধু পলতেটা উসকেছে, দিতে পারেনি মন্ত্রপূত ঘৃত।

তাই প্রশান্তি আসেনি—একটা জীবন দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে অহরহ।

আবার ফুলদি এগিয়ে যান খানিকটা পথ। এবার রাস্তায় এসে পড়েন।

পায় স্যাণ্ডেল নেই, তবু তাঁর খেয়াল হয় না। তিনি সত্যবন্ধুর কথা ভুলে যান। আর ভোলা আশ্চর্য নয়—কারণ এ মুহূর্তে জগতই তাঁর কাছে মিথ্যা। পৃথিবীতে তাঁর কোনো বন্ধু ছিল না, আজো নেই। সবই মিথ্যা। সবই আলেয়া!

সুমুখে একটা ভাঙা মন্দির। বয়সের চাপে ভাঙেনি। ভেঙেছে শিশু বটের বর্ধিষ্ণু শিকড়ে। ফেটে গেছে ভিত্। সংকুচিত হয়ে যেন মুখ লুকিয়েছে বিগ্রহ। এমনি কি ফাটল ধরান যায় না তাঁর সমস্ত সংস্কারে? যা কিছু প্রচলিত নীতি তা-ই তো সত্য নয়। যদি সত্য হত, তবে দুঃখ হবে কেন? কেন জ্বলবেন হুতাশনে ফুলদি?

পাব না, শুধু দিয়ে যাব—এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

ফুলদি পিচের রাস্তায় এসে পড়েন। দু একখানা শাকসব্জি তরিতরকারী বোঝাই ঠেলা যাচ্ছে। এক আধখানা ডাব বোঝাই গ্রাম্য গরুর গাড়ি। নিশানি লণ্ঠন কখন যেন নিবে গেছে। বয়েলগুলো চলছে ঢিমিয়ে।

ফুলদি পূবদিকে বাঁক ঘুরে দেখেন রাস্তার আলোগুলো এইমাত্র নিবল। কিন্তু রাত্রির ঘোর এখনো কাটেনি। তাঁর মনের উত্তেজনার মত এখনো চারদিক থমথমে। তিনি ঐ ঘোলাটে ভাবের ভিতর দিয়েই পাড়ি জমান। কোন্ কুলের বৌ, কি অবস্থায় তিনি বেরিয়ে এসেছেন, সে কথা মনে দাগ কাটে না। শুধু হাঁটতে হবে এই পর্যন্তই তিনি জানেন। শুধু জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে এই পর্যন্তই তিনি বোঝেন।

ভোরের হাওয়া দিচ্ছে ঠাণ্ডা। তিনি একটু একটু করে সুস্থ হন। সূর্যের আলো দেখা যায় রাঙা—তাঁর দৃষ্টি সহজ হয়ে আসে। কল্পনায় মানুষ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে চলে যেতে পারে—দিগন্ত তো তার বাড়ির আঙিনা, কিন্তু বাস্তবে সে শুধু পিচের পথেই আসতে পারে।

ফুলদির লজ্জা হয়।

এ পথটা তাঁর চেনা। শুধু তাই নয়। এ পথের দুটি একটি বাসিন্দাকেও তিনি চেনেন। এই যেমন মিঃ ডাসকে। ফুলদির পায় জুতা নেই, গায় জামা নেই, মাথায় নেই চিরুণী। যদি সত্যি সত্যি কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! তিনি আর সুমুখে পা বাড়াতে পারেন না। রাত্রের বিপ্লবিনী দিনের আলোতে ব্রততীর মত নুয়ে পড়েন। কালো মখমল পাড়ের মিহি শাড়ি খানাই পরনে। তিনি আঁচলখানা আষ্টেপৃষ্টে লেপটে দেন তাড়াতাড়ি। এবার ঘুরে দাঁড়ান। ফিরে যাবেন বাড়ি।

গুড মর্নিং।

কে? মিঃ ডাস?

হ্যাঁ ফুলদি। কেমন আছেন?

ভাল। কদিন যে আপনার পাত্তা নেই? আজকাল থাকেন কোথায়? —একটু বিব্রত হয়ে পড়েন ফুলদি। যে ভাবে প্রশ্ন করা উচিত ছিল, তা যেন ঠিক হয়নি।

আমি তো মাত্র কটা বেলা যাইনি, তাকেই কদিন করলেন? এমন হিসেবে ভুল করলে আমাকে যে কত কি বলতেন—অনুযোগের কি আর শেষ ছিল! যাক! মিঃ ডাসের মনে হয় ফুলদি যেন তাঁরই খোঁজে ব্যাকুল হয়ে এসেছেন। ফুলদির ইতিপূর্বের ব্যবহারে যে মেঘ জমেছিল মিঃ ডাসের মনে তা হঠাৎ কেটে যায়। এবার তিনি লক্ষ্য করেন যেটুকু সাজ-গোছ করে একজন ভদ্রমহিলার কোথাও বার হওয়া উচিত, তা যেন হন নি ফুলদি। এ ভাবে আসার হেতু কি? না অন্য কোথাও রাত কাটিয়ে এসেছেন তিনি? হঠাৎ পথে দেখা আর বলবেন কি! মিঃ ডাস একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকান।

ওকি, ও ভাবে হাঁ করে রইলেন কেন? কত চা জলখাবার খেয়েছেন এখন একটু আপ্যায়ন নেই!

আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

যাহান্নামে। যখন বাধা দিলেন, তখন একটু চা খাওয়ান।

আপনার জুতো জামা?

এ প্রশ্ন করার আপনার অধিকার নেই।

কেন?

কখনো কারুকে কিছু দিয়ে দেখেছেন? যে দিতে পারে, সেই শুধু এ প্রশ্ন করতে পারে।

কখনো কিছু চেয়ে দেখেছেন?

এই তো মুখ ফুটে চা খেতে চাইলাম, আপনি শুধু এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন। —ফুলদি হেসে বলেন, পথে দাঁড়িয়ে আর কথা হয় না। বাড়ি চলুন।

মিঃ ডাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুলদি হেঁটে চলেন। কিছু দূর এগিয়ে একটা পোড়ো বাড়ি। আস্তর উঠে গিয়ে ইটগুলো যেন কঙ্কালের মত দাঁত বার করে রয়েছে। ভেঙে গেছে যৌবনের কার্নিশ। শ্যাওলায় জঞ্জালে জংলা গাছে ভূতের বাসা

বলে মনে হয়। দু একটা অশ্বত্থ এবং বটও বেশ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। লোহার পাইপগুলো গেছে ক্ষয়ে। ড্রেন নর্দমা বন্ধ। বাড়ির সুমুখের গুটি কয়েক ঘরে পশ্চিমা ভাড়াটে। একজন কামার, একজন গোয়ালা, বাকিটি সন্থ সপরিবারে এসেছে। এখনো কোনো কাজ পায়নি। আশা নিকটের যে কোনো একটা কারখানায় স্বামী স্ত্রী বাল-বাচ্চা সমেত রঙরুট হয়ে যাবে। গোয়ালা ভরসা দিয়েছে, এ কলকাত্তা সহর—হরিহরছত্তরের মেলার সামিল, যে যা চাইবে সে তা পাবে। অগর একটু উমেদারী করতে হবে।

স্বামী বলেছে, জী সরকার।

স্ত্রী গোয়াল পরিষ্কার করে চাপাটি বানিয়ে খাইয়েছে।

এখনো নাকি গোয়ালা সম্পূর্ণ তুষ্ট নয়। সে আরো চায় অনেক কিছু।

ফুলদি এবং মিঃ ডাসকে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কর্মকার হাতুড়ি ছাড়ে, গোয়ালা 'চারপাইয়া'—সন্থ আগন্তুক ভাড়াটেরা ছাড়ে ঘর।—ভাস্ সাব্!—প্রথম সেলাম দেয় গোয়ালা। তারপর অন্ত সবাই।

খুব সম্মান তো আপনার।

ঐ পর্যন্তই। কিন্তু একটি পয়সা ভাড়া আদায় নেই। ঐ গয়েলা বেটা হচ্ছে পয়লা নম্বর শয়তান। ওর বুদ্ধিতেই সবাই চলে। সুমুখের ঘর কখানায় ও ইচ্ছামত ভাড়াটে বসায়, ইচ্ছামত তোলে। পনর বচ্ছর ধরে এই কাণ্ড। এখনো আমি কিছু বলছি নে, শুধু দেখছি কত বাড় বাড়ে।

ফুলদি কখনো এ বাড়ির ভিতরে ঢোকেন নি। কাছে এসেও দেখেন নি যে কত নোংরা! ভিতরে পা বাড়াতে তাঁর গা ঘিনঘিন করতে থাকে। এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, অগত্যা তিনি চোখ কান বুঁজে ভগবানের নাম স্মরণ করেন।

সিংহ দুয়ারই বলতে হবে। এক কালে দুটো নাকি তাক লাগান সিংহ ছিল দরজার দু পাশে। এখন সিংহ তো দূর, দরজাই প্রায় লোপাট ভাড়াটে-কটির দৌলতে। যতটুকু ভাঙে, তার একটু বেশিই ভেঙে-চুরে জ্বালানি হয়। এ যে কার ইঙ্গিত মিঃ ডাস বোঝেন, কিন্তু এখনো তিনি ধৈর্যচ্যুত হচ্ছেন না। হিন্দু ধর্মের নির্যাসটুকু তিনি নাকি অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছেন।

অন্দর মহলটা স্যাঁতসেঁতে হলেও পরিষ্কার। এত গাছপালা কিন্তু একটি পাতাও পড়ে নেই। গুটি কয়েক টব আছে। ভেঙে গাছগুলো শিকড় গেড়েছে আসল মাটিতে। দু একটা বেশ বড় হয়েছে। ফলে মুকুলে সমৃদ্ধ হবে শীগগিরই।

ফুলদি এগিয়ে দেখেন একটাতে ফুলও ফুটেছে। একটু থামেন তিনি। আবার তাঁকে ভাবিয়ে তোলে তুচ্ছ গাছটা। তুচ্ছ নয়—যেন নব যুবতী। পুষ্পে গন্ধে ধন্যা। তাঁরও ধন্য হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোন পথে?

এখন যে আর সময়ও নেই।

ফুলদি নিজের মনেই জবাব দেন, ওরে আছে। এ জীবনের বর্ণ গন্ধ এখনো তো তাঁর কাছে অর্থহীন নয়। তবে বেলাটা বিকাল। যা করতে হয় একটু তাড়াতাড়িই করা ভাল।

একটু দূরে আমার কতটুকু প্রজাপত্তনে জমি আছে। তাইতে মাসিক কিছু আয় হয়। নইলে এরা তো মেরে ফেলে দিত আমায়। ওকি, অত পিছিয়ে পড়লেন যে? একটু পা চালিয়ে আসুন।

ঐটেই আমার দোষ মিঃ ডাস। তাই সমান তালে এগুতে পারলাম না। কি যে ভাবি কিছুই বুঝিনে। শুধু পা ফেলতে দেরী হয়।—একটা চত্বর পেরিয়ে ফুলদি এগিয়ে আসেন।

মিঃ ডাস বলেন, সুবিধা পেয়ে আপনাকে খুব বলে নিলাম। কিন্তু আমিও কি সমান তালে চলতে পেরেছি? এই দেখুন না আমার বন্ধু রণেন কত কি করল, আমি কি তা পেরেছি? এ গেল প্রতিষ্ঠার এবং বৈষয়িক দিক—অন্য দিকটাও তো আমার শূন্য। এক এক সময় ভাবি লগ্ন এলো না। কিন্তু জীবনের পাঁজিটাই তো খুলে দেখিনি।

ভুল করেছেন।

হয়ত করিনি—এই আমার ট্রেজেডি।

আমি মানতে রাজী নই।

আপনার প্রব্লেম আলাদা।

না মিঃ ডাস—উহুঁ। মোটের ওপর সব মানুষের প্রব্লেমই এক—সমাধানও এক। কেবল ভিন্ন শ্লেটে ভিন্ন ভাষায় অঙ্ক লেখা হয় এই যা তফাৎ। আমি আপনিই জগতের প্রতিভূ। বিশ্বাস করেন?

করি। কিন্তু তবু যেন কি বাকি থেকে যায়।

যা থাকে তা হয়ত চার আনা। বার আনার রহস্য আমাদের কাছে আর রহস্য নয়। কিন্তু আলস্যের অন্ধকারে এখনো আমরা ঘুমাচ্ছি। সমস্ত [illegible] ব্যবস্থাকে কি ঢেলে সাজা যায় না?

[illegible]—খুব, যায়। আপনি আমিই তা পারি।—দুয়ারের তালা

খোলার শব্দে তারপরের কয়েকটা কথা শোনা যায় না। কিন্তু দুজনে একত্র হয়েই দরজার চৌকাঠ পার হন। দুজনেই কি যেন উত্তাপ অনুভব করেন ভিতরে ভিতরে। মিঃ ডাস ফুলদির শাদা মাঠা সজ্জার দিকে একবার উজ্জ্বল চোখে চেয়ে দেখেন। ফুলদি দেখেন বলিষ্ঠ দেহ প্রৌঢ়কে।

মিঃ ডাস বলেন, বসুন।

বাইরে প'ড়ো বাড়ি—কিন্তু ভিতরটা অত ভাঙা-চোরা নয়। এখনো মনুষ্যবাসের যোগ্য। চুনকাম নেই অনেক জায়গাতেই, কিন্তু পুরান কার্পেট টাঙিয়ে তা ঢেকে রাখা হয়েছে। কয়েকখানা ভারী গালিচা রয়েছে সাবেকী। কয়েকটা বড় বড় আলমারী—এটা হল ঘর। এর এপাশে-ওপাশে দু পাঁচটা কোঠা আছে। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ নেই। মিঃ ডাস ইলেকট্রিক ফ্যানটা চালিয়ে দিতে ফুলদি ভাবেন ডাইান পাখা ঝাপটাচ্ছে নাকি? তাঁর মুখটা একটু শুকিয়ে যায়।

এবার আলো জ্বেলে দেন মিঃ ডাস। ফুলদি দেখেন অসংখ্য জিনিস-পত্র গোছগাছ ফিট-ফাট। অয়েল পেন্টিং, হরিণের চামড়া, মিনাকরা পিতলের টেবিল। বড়বড় হাতা, বিরাট বিরাট ডেকচি-কড়াই ইত্যাদি। কোথাও ঝুল ময়লা নেই এতটুকু। ইলেকট্রিক হিটার, গ্ল্যাস লাইট কয়েকটা বড় বড় বাল্‌ব দেখা যাচ্ছে একটা র‍্যাকে। এ যেন কোন্ প্যাণ্ডেল সাজাবার সমারোহ, কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। তবু আশা মরেনি এখনো।

ফুলদি বলেন, আপনার ভিতরটা যে এত পরিষ্কার তা বার থেকে কেউ ধারণা করতে পারবে না। কিন্তু এত সব জিনিস দিয়ে আপনি কি করেন? আপনি কি ডেকরেটর?

পুরান জিনিস যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলাম একদিন কাজে লাগবে কিন্তু তা লাগল না। তা বলে ভাড়া খাটাতে যাব কেন? ডেকরেটর অর্থে তো আমি ঐ বুঝি।

যদি বলি শিল্পী—রূপ সজ্জাকর।

সে প্রতিভাও আমাতে নেই। থাকলে একটি প্রতিমা কায়ক্লেশে সাজাতে পারতাম। আপনি বসুন, একটু চা করে আনি। আমার হাতের চা কি আপনার পছন্দ হবে?

পুরুষের হাতের তৈরী চা বোধহয় কখনো খাইনি। নিয়ে আসুন টেষ্ট করে দেখি।

এ কথাটা মিথ্যা। হোটেলে রেঁস্তোরায় পথে প্রবাসে—

তারা হয় বাবুর্চি, নয় খানসামা।

আমাদের দুর্নাম আছে আপনাদের নাকি যুগ যুগ ধরে বন্দিনী করে রেখেছি—ব্যবহার করছি ভূ সম্পত্তির মত কিন্তু আপনারা যখন সুযোগ পাচ্ছেন তখন কি বাবুর্চি খানসামার চাইতে বেশি ভাবছেন আমাদেরকে? সরল মনে সুস্থ চিত্তে জবাবটা দিন।

ফুলদি এক স্তবক শিউলি ফুলের মত হেসে ওঠেন।

হিটার থাকতেও হিটার জলে না। প্ল্যাগ থাকতেও তাতে কারেণ্ট পাস করে না। ঘরের পেয়ালা এবং বাইরের চা দিয়ে ফুলদিকে আপ্যায়ন করতে হয়।

ফুলদি বলেন, সত্যি আপনার দক্ষতা অদ্ভুত!

ঠাট্টা করছেন? করুন! এমনি করেই কাটল জীবনটা।

এখনো অনেক বাকি। তার চেয়ে আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি, শুনবেন?

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মিঃ ডাস একটু ঝুঁকে পড়ে অনুরোধ করেন, বলুন?

এ সব বেচে দিন। যত সব পুরান জঞ্জাল।

তারপর?—মিঃ ডাসের চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

তারপর যা করতে হয় আমি বলে দেব।

মিঃ ডাস যেন সমুদ্রে ডুবে যান। এগুলো নাকি পুরান জঞ্জাল? তিনি তো এতকাল ধরে এই আঁকড়ে পড়ে আছেন। একজন সেকালের ল্যাণ্ড লর্ড। এ সমস্ত কি রেসের বাজির মত একদিনে উড়িয়ে দেওয়া যায়? রিফিউজি মহিলা কি বলছেন?

হয়ত পারা যায়। কিন্তু তেমনি ঘোড়া চাই। তেমনি নেশা লাগা চাই চোখে।

সেদিন অনেক কথা বলার থাকলেও আর বলা হয় না।

আঠার

ফুলদিকে একটা রিক্সা করে মিঃ ডাসই এগিয়ে দিয়ে যান। অনেক কিছু কৌতূহল, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা জমা থেকে যায়। তিনি ফুলদির কথায় অভিভূত। ঠিক কিছু গ্রহণ করা যায় না অথচ বর্জন করাও কঠিন। বারবার তিনি ফুলদির মাথা থেকে পা পর্যন্ত চেয়ে দেখেন। তারপর নেশার ঘোরে সদর দরজা থেকে বিদায় হন।

ব্যারাক বাড়ির অনেকেই দৃশ্যটা দেখে। ফুলদিকে সন্দেহ করার কিছু নেই। তবু কারুর যেন ভাল লাগে না। তাঁর দাম্পত্য জীবন যে সুখের নয় তা সবাই জানে। এর জন্য সহানুভূতিও আছে সকলের। তবু সবাই ভ্রূ কোঁচকায়। ফুলদি তা গ্রাহ্য করেন না। সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ওঠেন।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে?—বিছানার ওপর থেকে প্রশ্ন হয়।—এমন কাজ কি কোনো গেরস্ত বৌ করে? কি দুঃসাহস! কি ঘেন্নার কথা?

আমি তোমার বৌ নই।—ফুলদি শাড়ি গামছা কাঁধে ফেলেন। এলান চুলে সুগন্ধি তেল মাখেন আঙুলের চিরুণী খেলিয়ে। একটা চিকন ব্লাউজ খুঁজে নেন আলনা থেকে।

বৃদ্ধ এবার একটু এগিয়ে প্রশ্ন করেন, তবে তুমি আমার কি?

কিছু নই। চুপ করে থাক।

ইয়ার্কি পেয়েছ, আমি চুপ করে সইব আর তুমি যা তা করবে? তোমার বিয়েতে আমার দু হাজার টাকা দণ্ড হয়েছে। তোমার বাবা কান মলে আদায় করে নিয়েছেন। দেখবে চিঠি পত্তর আর আবদারের ফর্দ? আমার মেয়ে পরমা সুন্দরী, আমি হচ্ছি গরিব—আপনি একজন পাকা চাকুরে। এখন তুমি বলছ, তুমি নাকি আমার বৌ নয়। তবে সম্পর্কটা কি শুনি?

যেমন জট পাকানো, তেমনি পরিষ্কার—আমি তোমার শাস্ত্র সম্মত বেশ্যা। —ফুলদি স্নান করতে চলে যান।

বৃদ্ধ বিনা তামাকে টিকের আগুনে যেন জ্বলতে থাকেন।

ফুলদি কলতলা গেলে এক একজন এক এক ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। রাত থাকতে কোথায় গিয়েছিলেন? কারুর অসুখ-বিসুখ নাকি? না কলোনি থেকে আপনার কেউ সংবাদ পাঠিয়েছিল যেতে?

সে সব কিছু নয়।—ফুলদি পেটি কোটটা আঁটতে আঁটতে বলেন, একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম লেকের দিকে।

কালো বৌ মন্তব্য করে, ঐ ভাবে!

আমাদের ওপর আর ছেলে ছোকরারা চোখ দেবে না—সে ভয় তোদের। তোরা সামলে চললেই হল।

বলা যায় না ফুলদি। টাইফয়েড্ নিউমোনিয়া শুধু বয়স দেখে হয় না। যদি তা হয়ও সে বয়স আপনার কাটেনি।

তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। একটা কিছু হক। কেওড়াতলা গিয়ে বাঁচি।—ফুলদি হাসেন। শাড়িখানা কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে পরেন।

কেন যেন কালোবৌর এ হাসি ভাল লাগে না। কি ভেবে যেন তার মনটা নরম হয়ে পড়ে।

নিজের ঘরের রান্নার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফুলদি সত্যবন্ধুর বারান্দায় গিয়ে ওঠেন।—কেমন আছ আজ?

সত্য উত্তর দেয়, দেখে আপনার কি মনে হয়? বসুন ঘরে এসে।

বেশ ফ্রেস্-ই তো দেখাচ্ছে। চা খেয়েছ?

আপনি খাবেন? অহল্যা ফুলদিকে চা তৈরী করে দাও। হালুয়া পরেটা কি আছে?

অহল্যা জবাব দেয়, আছে।

তুমি কি ওগুলো গিলেছ? তোমার না পেটের ট্রাবল?

একটু খেলাম আজ। মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা ভাল। নইলে তো এ জীবন থেকে উঠে যাবে ও-পাট। যাক আপনি নাকি হারিয়ে গিয়েছিলেন?—সত্য পান, খেয়েছে। মুখখানা টকটক করছে রাঙা গোলাপের মত।

এ সব কথা তোমায় বললে কে?

পিসেমশাই ডেকে অনেক দুঃখ করলেন। মিছেমিছি আপনি ওঁকে রাগান কেন? আপনি নাকি দুপুর রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। অবশ্যি দুপুর রাতটা ওঁর বাড়াবাড়ি, আমি তা বুঝেছি। কিন্তু উনি আর কদিন, ওঁকে আর দুঃখ দিয়ে লাভ কি?

অহল্যা কান পেতে থাকে। কথাটা বাড়িশুদ্ধ রটে গেছে, এখন আসল কারণটা জানতে চায় সবাই। কিন্তু ভাল করে শুনতে পায় না অহল্যা। তাকে তাড়াতাড়ি খাবার ও চা নিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়।

সত্যবন্ধু বলে, তুমি ওগুলো রেখে এখান থেকে যাও।

দুজনে পাশাপাশি বসে। ফুলদির মুখখানা থমথমে। অহল্যা আহত হয়ে ফিরে আসে।

পিসীমা খান।

খেতে তো হবেই। পেটটার জন্যই তো যত সব দাসখৎ।—ফুলদি চা ও পরেটা খেয়ে ডিস্ পেয়ালা নামিয়ে রাখেন।

সত্য হেসে বলে, রাত দুপুরের কথা আমরা বিশ্বাস করিনি।

কিন্তু সত্যি কথা।—গলার স্বর গাঢ় করে ফুলদি জবাব দেন।

অহল্যা চমকে ওঠে।

আর তোমরা যা-ই বল না কেন শয়তানকে বেঁচে থাকতে থাকতেই সাজা দেওয়া উচিত। মরার পর হাতিদান পালকিদান করে লাভ নেই।

নিজের চরিত্র সম্বন্ধে কোনো মহিলা যে এমন কঠিত ইঙ্গিত করতে পারেন, তা সত্যবন্ধুর জানা ছিল না। তাকে ভাবিয়ে তোলেন ফুলদি। এতদিন সত্যবন্ধু দেখেছে অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু, এবার দেখল মৃত্যুর নতুন রূপ। এর জ্বালাও তো কম নয়। এর দহনও তো দারুণ। সত্যবন্ধু অনেকক্ষণ ফুলদির মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাঁর চোখ কান রূপের দিকে সত্যর দৃষ্টি নয়—দৃষ্টি কোথায় যেন অনেক গভীরে। এমনি ক্যাম্পে বসেও সত্যবন্ধু চেয়ে থাকত। অনেক তথ্যই সঞ্চিত ছিল জঞ্জালের নিচে। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

পিসীমা একটা কমপ্রোমাইজ করেই চলা উচিত।

এতদিন করে কি পেয়েছি?

তা তো আমি বলতে পারিনে।—একটু ঘাবড়ে যায় সত্যবন্ধু।

সন্ধি বলো, কমপ্রোমাইজ বলো দুর্বলতার লক্ষণ নয় কি?

হ্যাঁ একথা সেকালে সত্যি। কিন্তু দুর্বলের বাঁচার আর উপায় কি বলুন তো?

বেঁচেই বা লাভ কি? জলে জ্বালিয়ে যাওয়া কি ভাল নয়? কমপ্রোমাইজের তো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে, একবার উলটোটার এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখ না খানিক।

সত্যবন্ধু হ্যাঁ না কিছু বলতে পারে না। পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে সে শুধু চেয়ে থাকে।

একটা কি যেন নিতে অহল্যা ঘরে ঢুকবে—সে থতমত করে। বড় করুণ দেখায় তার মুখখানা। ফুলদি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করেন, কি চাই? এ বেলা কি রাঁধবে?

বুটের ডাল আর মাংস।

ধন্য। সকালে হালুয়া পরেটা, দুপুরে আর পোলাউটা বাদ দিচ্ছ কেন?

আমার তো কোনো দোষ নেই।—সে সকাতরে সত্যবন্ধুর দিকে তাকায়।

সত্যবন্ধু কিন্তু মৃদু মৃদু হাসে। মুখে কিছু বলে না। অহল্যার মুখখানা আরো ছোট হয়ে যায়। কিছু বলার মত সে আর ভাষা খুঁজে পায় না।

বাজার কে করেছে?

এবার সত্য জবাব দেয়, আমি।

এত কুপথ্যের লোভ! পেটে সইবে না।

সত্যবন্ধু অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলে, আমারও তো কমপ্রোমাইজ করে চলতে ভাল লাগে না। যার রোগ সারবে না, তাকে মরতে দেওয়াই ভাল।

তুমি অবুঝ, গোড়াতেই ভুল করেছ। এখনো তোমার আশা রয়েছে অনেক। যাক—যাকে রেখেছ তাকে বসিয়ে না খাইয়ে বাজার হাটে পাঠাও। সে-ই সব বুঝে-সুঝে করতে পারবে। কুপথ্য হলে তখন তাকেই ধরা যাবে।

ওকে বাজারে পাঠালে কি ভাল দেখাবে?

কত মহিলারাই আজকাল বাজার করছেন—ও তো ছাড়।

তাঁরা ভ্যানিটি ব্যাগ আর জুতো পরে যান, তাঁদের মর্যাদা আলাদা। ওকে পাঠালে নিন্দা হবে।

তবে ভ্যানিটি ব্যাগ আর জুতো কিনে দিও, নইলে কুপথ্য করে মরে যাবে।

কি যে বলছেন আপনি!—সত্যবন্ধু সংকুচিত হয়ে পড়ে।

যে রাঁধবে তারই বাজার করা উচিত—এতে লজ্জার কিছু নেই। তুমি যখন কিছু বোঝ না, ওর ওপরই নির্ভর করতে হবে। তুমি পারবে না মেয়ে?

অহল্যা সরল মনে মাথা নাড়ে।—হুঁ।

কুন্দ ঝি কলতলা গিয়ে মনে মনে গড়গড় করে, এ ছুঁড়ি আমাদের জাত মারবে।—সে আর একটি পেশাদার ঝিকে ডেকে বলে, অহল্যার জন্য জুতো জামা আসছে। রবাটের জুতো—নইলে নাকি তাঁর পায় কাঁদা লাগবে। মাগী আবদার ধরেছে, বাবু রাজি হয়েছেন। কালে কালে কত কি যে দেখতে হবে।

তাই নাকি? মুয়ে আগুন! মুয়ে আগুন!

ফুলদি ঘুরেফিরে ঘর এবং বারান্দা দেখেন।—এখানে তেলের শিশিটা রেখেছ কেন? ওভাবে পেয়ালাটা রাখলে যে ভেঙে যাবে।—অকারণে এমনি হাজারটা খুঁত ধরতে থাকেন ফুলদি। অহল্যা রাঁধবে, না জিনিসপত্র গোছাবে! সে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সত্যবন্ধু ঠিক কিছু বোঝে না। সে দ্বিধা দ্বন্দ্বে প'ড়ে ফুলদির কথাই অনেক সময় সায় টেনে যায়।—ও নতুন মানুষ ধীরে ধীরে সব পারবে।

অহল্যার ভিতরে ভিতরে রাগ হয়। এ কাজে ওর এই হাতেখড়ি বটে, কিন্তু খুঁত ধরার মত করেছে কি? ফুলদির পুরান সংসারের তুলনায় তারখানা কি বেশি পরিপাটি নয়? দোষ ধরলে সোনাকেও পিতল বলে নাজেহাল করা যায়। এ এক অগ্নিপরীক্ষা। ওকে চুপ করেই সইতে হবে। হায়রে বাবুটি যদি সোনা পিতলের তফাৎটা বুঝতেন! এভাবে কি চাকরি করা যাবে?

ফুলদি বলেন, মানুষ নতুন হলেও অন্তত চা-টা তৈরী করতে জানা উচিত ছিল। কনকদির সাত বছরের মেয়েটাও পারে।

ও-ও পারবে।

ন'তে না হলে নব্বইতেও আশা নেই।—ফুলদি আঁচল ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর ঢোকেন। ধীরে ধীরে বলেন, তুমি কি মাকাল ফল দেখনি?

সত্যবন্ধু হেসে বলে, অনেক দেখেছি।

অহল্যার গরম মসলা বাটা বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু ও তা নয় পিসীমা।

অহল্যার আবার হাত চলতে থাকে।

সত্যবন্ধুর হঠাৎ মুখখানায় কে যেন কালির পোছ দিয়ে দেয়।

ওকি? অমন করছ যে?

কিছু নয়।—সত্যবন্ধু দাঁতে দাঁত চেপে বসে থাকে।

বুঝতে পেরেছি তোমার ব্যথা উঠেছে। যা তা খাবে, হবে না! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।

অহল্যা একখানা পাখা নিয়ে ছুটে আসে। বড় বড় পোখরাজের দানার মত ঘাম দিয়েছে সত্যবন্ধুর কপালে। অহল্যা বাতাস করতে থাকে।

ফুলদি বলেন, তুমিই যত নষ্টের গোড়া। তুমি বাধা দিলে সত্য আর কিছুতে এসব কুপথ্য করতে সাহস পেত না। পাখাটা আমার হাতে দিয়ে নিজের কাজে যাও দেখি। ঘরে আগুন দিয়ে তারপর জল ঢালা।

যে শক্তিতে নারী পুরুষকে নিষেধ করতে পারে সে শক্তি অহল্যার নেই। তাই ইচ্ছা থাকলেও সে তখন প্রতিবাদ করতে পারেনি। সত্যবন্ধু যা খুশি খেয়েছে। যে প্রতিষ্ঠা থাকলে অন্যায়কে অনায়াসে গলা চেপে ধরা যায়, তা-ও অহল্যার নেই। তাই ফুলদি যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছেন। অহল্যা বারান্দায় চলে আসে। চারদিকে রান্নার জিনিস ছড়ান। বুটের ডাল হয়েছে। এখন মাংস চাপাতে হবে। কিন্তু কার জন্য? তার ইচ্ছা করে সব কিছু নর্দমায় ঢেলে দিতে। অহল্যা ভেবে দেখে সে অধিকারও তো তার নেই। অতএব সে রাঁধে। ঘরের ভিতর বাবু কেমন করছেন সে কথাও সে আর চিন্তা করে দেখে না। বাটালীর কাজ কাঠ-কাটা—পরিকল্পনার অধিকার তার তো নেই!

খানিকটা ক্ষার জাতীয় ওষুধ খাওয়ায় সত্যবন্ধুর ব্যথাটা কমে। ফুলদি নিজের ঘরের দিকে চলে যাবেন, বারান্দায় পা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এখনো ও-গুলো নিয়ে যে বসে রয়েছে, ওগুলো গিলবে কে?

সত্যবন্ধু বলে, থাক্ থাক্ আমি না খাই, অহল্যা তো খাবে।

অহল্যা মনে মনে বলে, উপায় কি! চাকরি করতে হলে শুধু খাওয়া নয়, বাধ্য হয়ে সব কিছুই হজমও করতে হবে।

কিছু সময় বাদে রান্না নামিয়ে যাবতীয় জিনিস ঘরে নিয়ে আসে অহল্যা। পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে তক্তাপোশের নিচে। জল ঢেলে ধুয়ে মুছে বারান্দাটা মুক্ত করে। দুপুর রোদের তেজে খাঁ খাঁ করে বারান্দাটা। পুষ্পি দূর থেকে সব লক্ষ্য করে। সে ছুটে এসে বলে, সত্যদা কোথায়?

ভিতরে।

খেয়ে দেয়ে দিব্যি আরামে চোখ বুঁজেছেন নিশ্চয়।

না। জেগে রয়েছেন শরীর ভাল নয়। এখনো খাওয়া হয়নি।

না হক—আমার ঝগড়া আছে।

যাও ভেতরে গিয়ে কর ভাই। আমাকে জায়গাটা ভাল করে মুক্ত করতে দাও। সরো গো, সরো। বড্ড রোদের তাত।—এতক্ষণ পর্যন্ত অহল্যা কিছু মুখে দেয়নি, সেকথাটা আর বলতে পারে না। সকাল বেলা যখন চা জল খাবার খাবে তখন তো এসে পড়লেন ফুলদি।

সত্যদা!

এসেছিস? একটু হাওয়া করনা ভাই পুল্পি। অহল্যার তো হাত জোড়া।

অহল্যা লজ্জায় দাঁতে জিভ কাটে।—এক্ষুনি আসছি বাবু।

না, না তোমাকে আসতে হবে না। তুমি কাজ-কাম সেরে স্নান করে খেয়ে এসো। পুল্পি ক্ষীবের মত মেয়ে, ও আমার কথা শুনবে।

তবু কি নিষেধ শোনা যায়, না যাওয়া যায় স্নান সারতে? হাতের কাজ শেষ না করেই অহল্যা এসে পাখা ধরে।

ওকি অহল্যাদি, তুমি দেখছি সত্যদার মাথাটি আর একটু খাবে! লোক রেখেছেন কিন্তু তার সুখ-সুবিধে দেখার মুরদ নেই। বসে বসে কেবল সেবা চাই! বড় লোকের ছেলে কেবল নিতে জানেন, দিতে জানেন না।

সত্য জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ঝাল-বুড়ী?

এখনো জিজ্ঞেস করছেন! দেখে-শুনে একটু কিছু বোঝারও ক্ষমতা নেই! এমনি করে কি আলদা একটা সংসার করা চলে? দেখ অহল্যাদি, দেখ কেমন বোকার মত চেয়ে রয়েছে।

সত্যবন্ধু সস্নেহে হাসে—আমি তো বোকা, এখন বুঝিয়ে বলো বুদ্ধির বুড়ী।

এ সব সংলাপ শুনে অহল্যা অবাক হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

দেখেছ রোদের তেজে অহল্যাদি ডালিম রাঙা হয়েছে। ফেটে গেলে তখন মজা বুঝবে। আমরা কেউ আসব না একটি দানাও কুড়িয়ে দিতে।

তা আমায় কি করতে হবে?

একটা ত্রেপল কিনে এনে পর্দা টাঙিয়ে দিতে পার না?

তুইও কম লাল হস নি। আয় তোকেই আগে হাওয়া করি। ঝাল

বুড়ীর এত পাকা কথা !—সত্যবন্ধু স্মিত মুখে পাখাখানা কেড়ে নিয়ে এক জনের জায়গায় দু জনাকেই হাওয়া করে।

পুষ্প বলে, এখন তোমরা ঠাণ্ডা হও—আমার বাসন মাজতে হবে এক পাঁজা, মা বসে রয়েছে, যাই ভাই অহল্যাদি।

অহল্যা জবাব দিতে পারে না। তার মাথার আঁচল উড়ে গিয়ে ঢিলে খোপাটা বেরিয়ে পড়েছে, সে তা দু হাতে সামলায়।

সত্যবন্ধু অবস্থাটা বুঝতে পেরে পাখা বন্ধ করে। কি যেন একটু ভেবে দেখে। এ সময় অরুন্ধতীর একটিবার, হয়ত আসা উচিত ছিল। কিন্তু সে লক্ষ্মী মেয়ে, তাই আর আসে না। সম্ভাবনার বাইরে সে আর হাত বাড়ায় না। বারান্দায় টুকিটাকি কাজ কর্মের শব্দ হয়। একটি ছায়া একবার ঘরে আসে, আবার বোধহয় চলে যায়। শাড়ির আড়ালে স্পষ্ট কারুকে দেখে না সত্যবন্ধু। অস্পষ্ট একটি যেন কর্মমুখর ঐকতান বাজে। অরুন্ধতী ও অহল্যা, একটি কেরাণী জীবনের যা কিছু কামনা যেন এক হয়ে যায়। সত্যবন্ধু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে বসে।

বাবু কি খাবেন?

জানি নে।

অহল্যা মুস্কিলে পড়ে। সে হাতের কাছের গোছান জিনিসগুলো আবার গোছায়। একটু বাদে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনি না বললে আমি বুঝব কি করে বলুন তো?

এই তো সুন্দর কথা বলছ, কাল ভেবেছিলাম বোবা না কি। আজ দেখছি যেমন তুমি বোবা নও, তেমনি প্যাড়া গেঁয়ে ভূতও নও। একটু চেষ্টা করলে তুমি দু দিনে আমাদের মত কথাবার্তা রপ্ত করে নিতে পারবে। কি পারবে না?

অহল্যা চুপ করে থাকে। নিচের দিকে চেয়ে কি যেন নাড়ে হাতের আঙ্গুল দিয়ে। মনে মনে ভাবে, বাবুর ভাল লাগলে ওকে পারতেই হবে জীবন পণ করে। কিন্তু চাকরিটা কি ওর স্থায়ী হবে? যদি না হয় তবে কেন এ চেষ্টা যত্ন? কত বিফলতার ভিতর দিয়ে আর সাঁতার কাটা যায়?

কি চুপ করে রইলে যে? পারবে না?

পারব।

মুখ কালো করে যে জবাব দিলে?

অহল্যা হাসে। কিন্তু টপ করে এক ফোঁটা চোখের জ. . ভয়ে পড়ে। সে চট করে মুখ ফেরায়। তারপর বেরিয়ে যায় বাইরে।

দুপুরের রোদ—খোলা মেলা একটা উঠান। তারপর দূরে কতগুলো ঘন বিন্যস্ত গাছপালার পাতা ও শাখাপ্রশাখা। তারপর কি অহল্যাদের দেশের বাড়ি? অহল্যা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আরো অনেকক্ষণ! ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি খাবেন?

দুধ বার্লি।

সত্যি?

হ্যাঁ অহল্যা।

তাই জ্বাল দিয়ে দিচ্ছি। স্নান করে আসুন। রোগীর কুপথ্য ভাল নয়।

সত্যবন্ধুর খাওয়া হলে অহল্যা চুপি চুপি পুষ্পির কাছে যায়।—তোমার সত্যদা ডাইকছে—না, না ডেকেছে। এখন চলো দেখি।

তুমি দেখি শুদ্ধ কথা বলতে সুরু করেছ—এ হল কি?

তোমাদের সাথে থাকব, না শিখে করি কি বলত?

ঐ তো ভুল হল—সাথে নয় সঙ্গে বলবে। নইলে লোকে বলবে পাড়াগাঁয়ে ভূত।

আচ্ছা ভাই তুমি এমনি করে বুঝিয়ে দিও। আমার চাল চলন কথা কি খুব খারাপ, তোমাদের কি ভাল লাগে না?

কে বললে? এর মধ্যেই তো সত্যদা মজেছে, তাই ফুলপিসী রাগ রাগ।

অহল্যা আর ঘাটায় না এই কিশোরী নাগিনীকে। ওর জিভ দিয়ে হয়ত আরো গরল বার হবে। পুষ্পির হাত ধরে অহল্যা ভিতরে নিয়ে যায়। বসতে দেয় একখানা আসন টেনে এনে। জল দেয় এক গ্লাস।

এ সব কি?

বুটের ডাল আর মাংস রেঁধেছি—একটু চেখে যাও ভাত দিয়ে।

আমি যে খেয়ে এসেছি এই মাত্তর।

তাতে হয়েছে কি? তোমার মত বয়সে আমরা কতবার যে খেয়েছি!

দূর!

সত্যবন্ধু বলে, এ লজ্জা তো তোমার শোভা পায় না পুষ্পময়ী। বসো, একটু চেখে দেখ না!

অহল্যা বলে, তুমি অমন করলে আমিও খাব না কিন্তু।

পুল্পি বসে পড়ে।—তোমারটাও বেড়ে নাও।

তোমার জিভের আন্দাজে অহল্যা কি ঝাল দিতে পেরেছে?—সত্যবন্ধু কটাক্ষ করে।

পুল্পি বলে, অহল্যাদি কি আমার মুখ চেয়ে বেঁধেছে! হয়েছে মিষ্টি রান্না—তুমি যা ভালবাস।

দু জনেই খায় বটে—কিন্তু সত্য লক্ষ্য করে, অহল্যা যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। হয়ত গরমে ঘামে সে কেমন হয়ে পড়েছে।

সে দিনই সন্ধ্যা বেলা পর্দা আসে। ফুলদি কট্‌মটিয়ে তাকান। একটি বারও তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করল না! তিনি স্থির করেন ওদের ভাল মন্দ সুনাম দুর্নামে তিনি আর নাক গলাবেন না। ওরা মরুক!

উনিশ

কিন্তু স্নেহ এবং মমতা এমন জিনিস যে সন্ধ্যার একটু পরেই ফুলদিকে সত্যর ঘরের দিকে পা বাড়াতে হয়। তিনি চুপিচুপি সিঁড়িতে পা দিয়ে কান পেতে থাকেন। ভিতরে' কথা হচ্ছে—বাইরেব থেকে তা শোনা যাচ্ছে না। মাঝখানে খাড়া হয়েছে নতুন উপসর্গ। এ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? কেউ দেখলে বলবে কি? একটা সাড়া দিয়ে ফুলদি ভিতরে ঢুকে পড়েন।

কেমন আছ সত্য? কি খেয়েছ?

ভালই আছি। দুধ বালি খেয়েছি। কাল ভাত খাব। এই [illegible]ুন না পর্দা কিনে নিয়ে এলাম।

এটা ভাল থাকা নয়—অত্যাচার। দু দিন বাদে হাঁটাহাঁটি কবলেই হত!

অহল্যা মনে মনে ভাবে, এবার তার পালা। সে ওখান থেকে সরে আসবে বলে পা বাড়ায়।

তুমিও তো বারণ করতে পারতে।

সত্যবন্ধু হেসে বলে, দরকারটা তো ওরই বেশি। একদিন রোদে ভাজা-ভাজা হয়েই তা বুঝেছে। দুপুর বেলা যদি ওর অবস্থাটা দেখতেন!

একি কথা বললেন বাবু! অহল্যা মাথা হেঁট করে থাকে। সে তো কোনো অনুরোধ জানায় নি। বরং নিষেধই করেছিল।

তোমারও বাপু দোষ আছে সত্য। তুমি নিষেধ শোনার পাত্র নও। দুদিন বাদে পর্দা টাঙালে হত কি? এখানে এসেছ একটু বিশ্রাম করে ভাল হতে, তা না অনাবশ্যক ছুটোছুটি। শেষ পর্যন্ত এর জন্য কিন্তু নিন্দার ভাগী হব আমি।

অহল্যা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। সে ওখান থেকে চলে আসে। এবং একেবারে বাইরে বেরিয়ে যায়।

এখন ফুলদি ও সত্যবন্ধু একা। ঘরের আলোটাও তেমন বাড়ান নয়। অহল্যা বেরিয়ে যেতে, ফুলদির মনে হয় সবই যেন তাঁর আয়ত্তে এল। এই অস্থায়ী ভাড়াটে ঘরখানা নিয়েই যেন তাঁর লড়াই। কত চড়াই উতরাই ভেঙে তিনি সত্যকে নিয়ে এখানে এসেছেন? এত দুঃখ কষ্টের আহরণ যেন হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। পর্দাটা টাঙিয়ে মন্দ হয়নি! সত্যবন্ধু শুয়ে। তিনি চুপ করে পাশে বসে থাকেন। বেশ কিছুটা সময় কেটে যায়। বেশ কিছুটা ঘনীভূত মুহূর্ত। কেউ কথা না বললেও ভাল লাগে—যেমন ভাল লাগে হিংস্র মার্জারীর শিকার নিয়ে বসে থাকতে। নড়লে থাবা, নইলে চুপচাপ।

ফুলদি সত্যবন্ধুর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দেন। আলতো ভাবে সিঁথিতে আঙুল চালান সস্নেহে।—চুলগুলো তোমার ভারি মোলায়েম।

টিকটিক করে ঘড়ির শব্দ হয়। কাঁটা দুটো বোধহয় আধ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আসে। ঘরখানা আগের মতই নিস্তব্ধ নিরালা। সত্যবন্ধুও।

কি কথা হচ্ছিল তখন অহল্যার সঙ্গে?

সত্যবন্ধু তখন তন্দ্রার ঘোরে। সে কোনো জবাব দেয় না। ফুলদির প্রশ্ন তার কানে যায় না। সে অহল্যার মুখে তার ইতিবৃত্ত শুনেছে আনুপূর্বিক। শৈশব, কৈশোর, বিবাহ বন্ধ্যা কিছুই বাদ দেয় নি। অহল্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে। সত্য শুনেছে শুয়ে শুয়ে। কখনো অশ্রু কখনো হাসি। কখনো তৃষ্ণাদীর্ণ পৃথ্বী, কখনো প্লাবন। শুনতে শুনতে আবার ঘোর এসেছে সত্যবন্ধুর। অহল্যা এখন পূর্ণ যৌবনা।—স্বামী তার পঙ্গু। প্রকারান্তরে এখন স্বামিত্বটা সত্যর ঘাড়েই পৌঁছাতে চায়। সত্যবন্ধুর কোন লোভ নেই, লিপ্সা নেই—তবু কেন যেন মমতা হয়। শুধু মমতা নয়, একটা অপূর্ব করুণা জন্মে অহল্যার জন্য। এ প্রভুত্ব নয়—মনুষ্যত্ব। কিন্তু এই পথেই শনির পদ সঞ্চার। এই পথেই কুসুমে কীটের অনুপ্রবেশ। সত্যবন্ধু অহল্যার রূপের ভিতরে আহুতি দেখতে পায়। সে ভয়ে ভয়ে মনে মনে দূরে সরে থাকে।

ফুলদি প্রশ্ন করেন, কি, বললে না—এতক্ষণ কি কথা হচ্ছিল তোমাদের ভিতর?

সত্যর কানে ফুলদির প্রশ্ন যায় না। তাই সে জবাবও দেয় না। একটু একটু করে সময় কেটে যেতে থাকে নিঃশব্দে। শুধু ঘড়িটার শব্দ আসে

কানে। সংযত গতিতে নিয়মিত ধুকপুকানি। যেন কালের মুমূর্ষু আক্ষেপ।

কোনো উত্তর না পেলেও ফুলদির মন্দ লাগে না। এভাবে একান্তে চুপচাপ কাটিয়ে দিতে। সত্যর রূপেও তিনি একটা আহুতি লক্ষ্য করেন। সত্য ভয় পেয়েছিল কিন্তু ফুলদি নির্ভয়। সত্য বয়সের তক্তাটার এ প্রান্তে, ফুলদি অপর প্রান্তে।, সত্যব অবচেতন মনে আশার দীপ, ফুলদির মনে হতাশা। সেই জন্যই আহুতির গ্রাসকে তিনি নির্ভয়ে অভিনন্দন জানাতে চান।

কিন্তু সত্য কথা বলে না।

সিঁথিতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে হাত থেমে আসে। সময়টার ধুক-পুকানি তখনো থামেনি। ফুলদি এক সময় ভাবেন, অসহ্য এ মৃত্যু যন্ত্রণা। এর থেকে কি মুক্তি নেই? কতক্ষণ এ জ্বালা আর সহ্য করা যায়? আশ্চর্য! তিনি আসার আগে যে এত কথা বলছিল, সেও যেন এখন মৃত। চিরটা জীবন ফুলদি শব পাহাবা দিয়ে এলেন। দারুণ এ অভিশাপ তাঁর নারী জীবনে। তিনি যা কিছু পেলেন মরা নয়ত তার সমগোত্রীয়। তিনি সত্যবন্ধুকে একটা নাড়া দিয়ে বলেন, এখন যা-ই বল পর্দাটা কিনে ভাল করনি।

কেন?—সত্যবন্ধু উঠে বসে। সে ভাবে রহস্য।

এতগুলো লোকের বাড়ি।

দিনে তুলে রাখব, রাত্রে ফেলে দেব। আপনাদের আসা-যাওয়ার অসুবিধা হবে না।

যখন রোদের আঁচে অহল্যা গলবে?

তখন তো আপনারাই বলবেন, পর্দা ফেল, পর্দা ফেল। আপনারা কেন, ঐ কচি মেয়ে পুষ্পিই বলেছে—তাই তো এ হাঙ্গামা। নইলে—সত্যবন্ধু বিরক্ত হয়ে বলে, এত কথাকথি হলে এ বাড়িতে আমার আর থাকা পোষাবে না। প্রথমদিন আমি যা বলেছিলাম, আপনি তা খণ্ডন করে-ছিলেন—আর আজ বেমালুম সব ভুলে উলটে চার্জ করছেন আমাকে।

না, না তোমাকে কিছু বলা হচ্ছে না। আসল কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না।

আসল নকল সবই বুঝি পিসীমা, শুধু মুখে কিছু বলি নে।

ফুলদি মনে মনে বলেন, মিথ্যা, মিথ্যা কথা। কোনো পুরুষেই আজ পর্যন্ত নারীর ব্যথার উক্তি তলিয়ে বোঝেনি। তারা শুধু এই বিশেষণটাই দিয়ে খালাস যে, নারী হচ্ছে সর্বংসহা। কিছু সইবেন না ফুলদি। স্নেহ-ভাজনকেও তিনি রেহাই দেবেন না।

কেন তাঁকে না জিজ্ঞাসা করে অন্তরাল্ সৃষ্টি?

প্রথমদিন একটা ভুল নির্দেশ দিয়েছিলাম, আজ বুঝতে পারছি হাত পুড়বে, তাই বলছি, ওটা এনেছ—ফেলো না। আমি গুরুজন হয়ে আর বেশি কি বলব?—ফুলদি বেরিয়ে যান।

অহল্যা এসে পর্দাটা তোলে। সত্যবন্ধুর গ্লানিতে বুক ভরে যায়। সে ভাবে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া মন্দ নয়। এখানে নাটক, সেখানে বাস্তব। অভিনয়ের চাইতে প্রত্যক্ষ মৃত্যুকে যেন সইতে পারা যায়। অহল্যা ঘরে ঢুকে কি প্রশ্ন করে, তার জন্য আড়ষ্ট হয়ে থাকে সত্যবন্ধু। ছিঃ ছিঃ পিসীমা এমনও কাণ্ড করলেন। অহল্যা ঝি হলেও তার কাছে মুখ দেখান দায়।

একখানা ঝাঁটা নিয়ে অহল্যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানা ঝাড় দেয়। শুকনা কাপড় জামা গুছিয়ে ব্র্যাকেটে টাঙিয়ে রাখে। সন্তর্পনে কাঁচের গ্লাস বাটি সাজায়। তার মমতার স্পর্শ লাগে যেন প্রতিটি জিনিসে। বসে বসে সত্যবন্ধু সমস্ত লক্ষ্য করে। ধীরে ধীরে তার মন যেন কখন ভরে ওঠে স্নেহ ও মমতায়। গ্লানি যায় ধুয়ে মুছে।

সত্যবন্ধুর ক্যাম্পেও এই আয় ছিল। কিন্তু সেখানে ছিল একটা ভাঙা কাপ ও ভাঙা কুঁজো। আর জরাজীর্ণ একটা বিছানা। এখানে হয়েছে একটি সাজানো গোছান সংসার। আয় বাড়েনি, কিন্তু শ্রী ফিরেছে অদ্ভুত। সেখানে গৃহ দেবতা ছিল শনি—ওরফে মোহাস্তি? আর এখানে যেন লক্ষ্মী। সত্যবন্ধু অহল্যার কাজ কাম চোখ ভরে দেখে। মনে হয় এ নারীর সবটুকু দেহ মন কে যেন সেবা দিয়ে গড়েছে। শুধু তাই নয়—ওপরে প্রলেপ দিয়েছে শ্রদ্ধার। তেমন শিক্ষা দীক্ষা না থাকলেও এমন মহৎ গুণের যে অধিকারিণী সে হচ্ছে গরিয়সী নারী। চর্চায় আয়ত্ত হয় বিদ্যা, কিন্তু এ জন্ম বিভূতি।

অহল্যা সত্যবন্ধুর বিছানা বিছায়, বালিশ সাজায় ঝেড়ে-ঝুড়ে। আরো কত কি যে সে করে তার ইয়ত্তা নেই। সত্যবন্ধুর জীবনে এমন সুযোগ আসেনি ঘরোয়া কাজ দেখার। সে একটা ছন্দ অনুভব করে—যে ছন্দ

আসলে ভুলছে অহল্যা, ঢেউ এসে লাগছে সত্যবন্ধুর মনের কিনারায়। সে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

দশটা বাজে। নিকটের মিল থেকে শব্দ হয় ঢং ঢং করে।

বাবু এখন কি একটু দুধ বার্লি খাবেন? গরম করে আনব?

আনো।

ওষুধ?

দাও!

কোনটা আগে দেব?

যেটা তোমার খুশি।

অহল্যা হেসে ফেলে। একি ছেলেমানুষি উত্তর!

সত্যবন্ধু এ হাসির অর্থ বোঝে না। সে চেয়ে থাকে অহল্যার মুখের দিকে। নিষ্কলুষ নির্ভরতা ভেসে বেড়ায় তার দুটি চোখের তারায়।

খুশি মত কি ওষুধ দেওয়া যায়?

তবে নিয়ম মত দাও। তিন নম্বর পুরিয়া। খাওয়ার আগেই ওষুধটার বিধি।

অহল্যা ওষুধ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়। সে ট্র্যাঙ্ক খোলে। খল নোড়া ধুয়ে আনে। ধীরে ধীরে যত্ন করে মাড়তে থাকে ওষুধ।

এই নারীই সত্যবন্ধুকে বাঁচাতে পারবে। এমনি সেবার ভিতর দিয়েই জীবন্মৃত বাঁচে। ওর শিক্ষা, সামাজিক পরিবেশ তুচ্ছ। ওর যা কিছু, আধুনিক রুচি সম্মত নয়, তাই যেন ডুবে গেছে মানবতার অগাধ সমুদ্রে। ও যেমন করে দেখছে সত্যবন্ধুকে, সেই চোখেই ওকে দেখতে হবে। দিতে হবে কল্যাণময়ী নারীর মর্যাদা। একটু আগে যে সত্যবন্ধু এ বাসাটার ওপর বিরক্ত হয়েছিল, সে ভাবে বহু পুণ্যের ফলে তার এখানে আসা। বহু পুণ্যের ফলে তার এ সেতুযোগ। এখন এ বাসাটা ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

অহল্যা ওষুধ ও জল নিয়ে সত্যবন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

আচ্ছা তোমার বাড়ির জন্য মন কেমন করে না?

চমৎকার প্রশ্ন! অহল্যা নীরবে একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস চাপে।

ওষুধটুকু খেয়ে সত্যবন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করে, তোমার স্বামীর ঐ অবস্থা, তাকে ফেলে কি তুমি এখানে টিঁকে থাকতে পারবে? তোমার মন কি উড়ু-উড়ু করবে না?

না বাবু, না।—অহল্যা থল ও গেলাসটা নিয়ে সরে যায়। এ প্রসঙ্গ থেকে সে এড়িয়ে যাবে ভাবে।

আঁচলে টান পড়ে।—শোনো।

অহল্যার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে।—কি বলছেন?—সে মেজের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবী যেন পাক দিচ্ছে তার চারিদিকে।

সত্যবন্ধু বোঝে যে কাজটা আদৌ ভাল হয় নি। সে আঁচল ছেড়ে দেয়। একটু লজ্জায় পড়ে সত্যবন্ধু। হঠাৎ না বুঝে এ কি করল সে? অহল্যা ভাবলে কি তাকে!

নিজেকে স্থির করে জায়গা মত থল ও গেলাস রেখে আসে অহল্যা। একটু ঘুরে সে বুকের আঁচল সামলায় মাত্রা ছাড়িয়ে। এখন ঘরে থাকবে, না বারান্দায় যাবে? এখানে দাঁড়ালে নিজের আশঙ্কা, বাইরে গেলে বাবুর অপমান—কাকে এখন বাঁচাবে অহল্যা? একদিকে আত্মসম্মান, অন্যদিকে জীবিকা। এ যে বড় বিভ্রান্তিকর সমস্যা। আবার এ তেমন কিছু না-ও হতে পারে, শুধু সাময়িক একটু চঞ্চলতা। অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে। অহল্যা আত্মপ্রত্যয় ঘুরিয়ে আনতে যত্ন করে।

শোনো।

অহল্যা আর স্থির থাকতে পারে না। কি যেন দুর্নিবার আকর্ষণে কাছে এসে পড়ে।

তুমি কি কিছু মনে করলে?

অহল্যা অবলীলাক্রমে জবাব দেয়, না।

তবে যে তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না।

কি বলব বাবু, আপনি কি বোঝেন না কিছু?

তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, নইলে কিছু বুঝতে পারছি নে।

অহল্যা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করে, কি বুঝতে চাইছেন?

তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাবে?

না।

সত্যি বলছ? কিছু গোপন করছ না তো?

অহল্যা মাথা নাড়ায়। এবার আর কথা বলতে পারে না। তার বুকটা দুদিকের ঢেউতে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে থাকে। একদিকে পংগুর আকুতি, অন্যদিকে অসহায়ের নিবেদন। হায় বিধাতা সে যে কেন

জন্মেছিল এ পৃথিবীতে? যে দুঃখ সে দূর করতে পারবে না তার জন্যই যত কান্না! অহল্যার হাত পা কাঁপতে থাকে।

সত্যবন্ধু আবার প্রশ্ন করে, ঠিক বলছ তো—আমাকে আর ছেড়ে যাবে না?

না গো বাবু যাব না—আপনার মত মনিব পাওয়া ভাগ্য।—অহল্যা বারান্দায় এসে বসে। সমস্ত মন যেন তার তোলপাড় হয়ে গেছে। সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সে বসে থাকে আকাশের দিকে চেয়ে। তারায় ভরা রাত্রি। জ্যোৎস্না ভরা পৃথিবী। এমনি এক শুভ রাত্রে তার বিয়ে হয়েছিল—এমনি এক মধুর পরিবেশ। কিন্তু আজ তার কি আছে? সেদিন আর এদিনে যেন আকাশ পাতাল ব্যবধান। তখন ছিল কত উত্তেজনা কত ব্যাকুলতা, আজ শুধু অবসাদ। ফিরে ফিরে তারা ওঠে, চাঁদ হাসে, কিন্তু বিগত লগ্ন বুঝি মানুষের জীবনে আর আসে না। সেদিন কী সুন্দর যে দেখেছিল শিবুকে।

সত্যবন্ধু উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। অনেকক্ষণ বিছানায় কাটিয়েছে, আর ভাল লাগে না। এমন কোনো বই-পত্তর নেই যে তাতে মন বসাব। এবার সুবিধা মত জোগাড় করতে হবে দু চারখানা। নইলে এ দীর্ঘ অবকাশ কাটান যাবে না। হয়তো আজকের মত ভুল হবে পদে পদে। এ তো ভুল নয়, বাঁচতে গিয়ে মৃত্যুকে ডাকা। সে অনুশোচনা ও গ্লানিতে পিষ্ট হয় খানিক। নানা কথা ভাবে নানা সূত্র ধরে।

অহল্যা।

বাবু!

খেতে দেবে না?

অহল্যা লজ্জা বোধ করে। এতক্ষণে তারই উচিত ছিল বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা। অহল্যা উঠে দুধ বার্লি গরম করে নিয়ে আসতে যায়। সব উনানই নিভেছে—এখন উপায়? সে দিশাহারা হয়ে বাড়িময় ছুটাছুটি করে।

কি অহল্যাদি? শিকলি কেটে পাখি পালিয়েছে নাকি?

এখনো তুমি জেগে? যাক—ঠাট্টা নয়, এই দুধবার্লিটুকু—

আমি খাব? তা কিছুতেই পারব না এখন।

তুমি নয় গো—বাবু খাবেন। একটু গরম করে দিতে হবে।

বাবু তো আমার নয় যে এ অসময়ে নাচানাচি করব।

অহল্যা পুল্পির দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে বলে, দুধ-খু হলে চলো, হাতে হাতে তুলে দেব।

ধেৎ, তাই বলেছি নাকি আমি? তা হলে আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। পারব না আমি ওসব গরম করে দিতে।

তবে থাক, আর কিছু বলব না। এখন আমায় রক্ষে করো ভাই।

পুল্পি কতটুকু খবরের কাগজ এনে দুধবার্লি গরম করে দেয়। বলে, তুমি খোকাবাবুকে বড্ড ভালবাস—না?

অহল্যা কেন যেন একটু চপল হয়ে ওঠে।—যদি বলি হুঁ তা. হলে তো ঘুঁটের মত জ্বলবে!

না গো, সে মেয়ে আমি নই।

অহল্যা ভাবে, এ ঠাট্টাও তো ভাল নয়। পুল্পির মত তাকে বাচাল হওয়া সাজে না।

সত্যবন্ধু দুধ বার্লিটুকু খেয়ে শয্যায় উঠে বসে। অহল্যা এক গ্লাশ জল ঢাকা দিয়ে রাখে শিয়রে।—আর কিছু লাগবে?

না।

অহল্যা আলোটা নিবিয়ে দেয়।

তুমি কি শুতে যাচ্ছ?

হুঁ।

খাবে না?

ক্ষিধে নেই।

তা হলে না খাওয়াই ভাল। দিন কাল ভাল নয় মোটেই।

অহল্যা বাইরে যাবে বলে পা বাড়ায়।

একটা কথা আছে অহল্যা।

অহল্যা চমকে দাঁড়ায়। অন্ধকার ঘরে তার গা ছমছম করে।

কুড়ি

ফুলদিকে পৌঁছে দিয়ে মিঃ ডাস বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু বেশি সময় আর একা একা কাটাতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাঙা জানালায় কে যেন রঙের পিচকারী ছুড়েছে। লালে লাল হয়ে গেছে চারদিক। যদি এ রঙ পাকা হয়, এবার তাকে বাজি ধরতে হবে। এতদিন ছুটে তিনি বুঝতে পেরেছেন নিষ্ঠার একটা বরমাল্য আছেই। ফুলদি ইসারায় সমস্ত বলেছেন। উঃ! এমনি করে তিনি যদি সায়লেন্ট যুগ থেকে ফিলিম ইনডাসট্রির পেছনে লেগে থাকতেন! এবার শুধু অহল্যাকে নিয়ে নয়, ফুলদির হাতে হাত মিলিয়ে ডুব দেবেন হৈহৈ ছন্দে। রণেন কি একটা চান্স্ দেবেন না ওঁদের দুজনাকে। সংলাপ না-ই বা থাকল, এ শুধু আশা যাওয়া ফিরে ফিরে চাওয়া। ফুলদি কি রাজী হবেন? হাতে পায় ধরে করাতেই হবে। জোঁকের মত লেগে থাকলে কি না হয়!

একটু সেজে-গুজে শিষ টানতে টানতে মিঃ ডাস বেরিয়ে পড়েন। আজ তাঁর মনে যেন বসন্তের হাওয়া লেগেছে। এমনি ঘন আমেজ আর একদিনও লেগেছিল—সিমসিম যাওয়ার পথে ওয়েটিং রুমে। একান্ত নির্জন রাত্রির অন্ধকারে ফুলদি যে কতখানি উতলা করেছিলেন! ফুলদি জাদুকরী। কখন যে কি করতে পারেন!

আজ গেটকিপার সেলামের ওপর সেলাম ঠুকে পথ করে দেয় মিঃ ডাসকে। আজো তেমনি ভিড়। কত রকম গোঁফের বাহার, কত রকম শাড়ির! ইন্দ্রপাত হতে পারে চোখের কটাক্ষে। বিশ্বামিত্রেরও ধ্যান ভঙ্গ হতে পারে তাজ্জব প্রোডাক্সনের চৌকাঠ মাড়ালে।

শুধু রণেন রায় অটল। কেউকেই তাঁর ভাল লাগছে না। একটি আনকোরা গ্রামীণ নায়িকা চাই।—যার যৌবনের ছন্দই হৈহৈ। বড় আশা দিয়েছিল বন্ধু ডাস সাহেব। কিন্তু তাকে এখনো হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল না। বাড়ি ভাড়া ইলেক্ট্রিকের বিল, পান সিগ্রেট চায়ের খরচা কেবলই বেড়ে যাচ্ছে অথচ একটা দিনও ফ্লোরে নামা গেল না। এভাবে কতদিন চালান যাবে?

রণেন কলিং বেলে ঘা মারেন। যুবক যুবতী এবং অন্যান্য উপস্থিত যারা সচকিত হয়ে ওঠে। দুলে ওঠে বেণী শা'ড় ভ্যানিটি ব্যাগ।

কিন্তু কেউই ভিতরে ঢোকার নির্দেশ পায় না। শুধু মিঃ ডাস ঢুকে পড়েন দরজা ঠেলে। পিছনে গেটকিপার—ওরফে বেয়ারা।

ব'স্ ব'স্—আজকার খবর কি? তিনি কি এসেছেন? এই বেয়ারা, যাও, যত্ন করে নিয়ে এসো আগে।

না সে আসে নি রণেন। তবে একটা জব্বর খবর আছে—একেবারে আন্ এক্সপেক্টেড্ থ্রিল। তুই চমকে যাবি।

তাই নাকি?—রণেন বেয়ারার কানে কানে বলে, আর ক্যাপ্‌স্টেন্ নয়, দু আনা প্যাকেটের সিগ্রেট। এবং চার কাপ চাকে ছ কাপ করে সার্ভ করবে—বুঝলে?

বেয়ারা বলে, আজ্ঞে। একটা কেতলি আর কয়েকটা কাপ লাগবে এ সব প্রসেস্ চালালে।

রণেন তিনটে টাকা ফেলে দেন।—যাও! তারপর ব্রাদার?

দু কাপ চা আসুক নইলে কথা জমবে না।

আবার ঘন ঘন ঘা পড়ে কলিং বেলে। আবার সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। আবার হতাশা। রণেন টাটকা হুকুম করেন। কিন্তু চা আসে মাপা—অর্থাৎ পেয়ালাটা দেড় ইঞ্চি খালি।

মিঃ ডাস বলেন, ইঁদুর লেগেছে তাজ্জব প্রোডাক্‌সনের গোলায়, সাবধান রণেন। খুব হুঁশিয়ার কিন্তু।

রণেন বলেন ওর জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি কল্ পাততে জানি।

দেখিস নিজের হাত পা আবার থাম না হয়।

সে দিকে হুঁশিয়ার আছি, তুই ভাবিস নে। এখন থ্রিলিং নিউসটা ছাড়।

একটি বর্ষিয়সী নায়িকায় কি তোর আপত্তি হবে?'

বুড়ি?

নারে। মেক্‌আপ নিলে কুড়ি বলে ভ্রম জন্মাবে। তারপর তাঁকে দিয়ে মেজ গিন্নীর পাঠও চলবে। চেহারার জৌলুস দেখলে অডিয়াস্স যাবে পাগল হয়ে।

রণেনের একটু লোভ হয়। ঠোঁটে চা লেগেছিল, তিনি তা চেটেচুটে নেন। একটু ভেবে বলেন, এ বইতে হয় না। এর নায়িকা হচ্ছে সুইট সিক্সটিন। সেই আন্দাজেই বইখানা লেখা।

আবার ঢেলে সেজে নেওয়া যাবে। তোর ইচ্ছা হলে—

অথার কি রাজি হবেন?

টাকা কার যে রাজি হবেন না? যদি একান্ত না হন, যে লাখ টাকার কাজ চালাতে পারে, সে দু টাকার একখানা বই নতুন করে লিখিয়েও নিতে পারে।

যদি গল্পটা তেমন ইনটারেষ্টিং না হয়।

হবে রে তুই ভাবিস নে। সে বুদ্ধি আমার মাথায় আছে।—মিঃ ডাস এক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করেন।—গল্পের জন্য সিনেমা ফেল করে না। দেখতে হবে এই পার্‌ভার্‌সনের যুগে অডিয়ান্স কি চায়? সেন্সর সমাজ ধর্মকে ফাঁকি দিয়ে সেক্স-এর ডাইলিউসন দিতে হবে মাত্রা ছাড়িয়ে। তবে না বই হিট্‌ করবে! আমরা কি জানি সেটা বড় কথা নয়, পাবলিক কি চায় সেইটাই হল টার্‌গেট্‌।

রণেন লাফিয়ে ওঠেন।—যা বলেছিস্‌ মাইরি। তোর একখানা ব্রেন বটে!

মিঃ ডাস সন্তুষ্ট হয়ে মিটমিটিয়ে হাসতে থাকেন।—এই ব্রেনটাকে যদি গান (Gun) এর মত তুই কাজে লাগাতে পারিস, সেই জন্যই এ সাজেসন্‌,—আমি তো ভাই ব্যাচেলার। আমাকে দিয়ে তোর তেমন কোনো আশঙ্কা নেই।

রণেন একটু ভ্রূ কোঁচকান। ভাবতে থাকেন গভীর ভাবে। তাঁর মনের তালেতালে পা দুখানাও কাঁপতে থাকে। তিনি টাইটা ঠিক করেন বার দুই। পয়সা কামাই করা সহজ নয়। ম্যানেজার-হওয়া আরো কঠিন। কত লোকের যে মন রাখতে হয়! শুধু চমৎকার গল্প, অসাধারণ ফটোগ্রাফির কৌশলে সাধারণের পার্স ঘায়েল করা যায় না। হয়ত সেন্সরে পাশ হল না তোমার ছবি।

দেখ এ বইখানার লেখিকা হলেন আই, সি, এস-এর বৌ। এখানকার

জন্য সেই সুইট সিক্সটিনটিই চাই। পরেরখানা না হয় তোর পরামর্শ মতই তোলা যাবে। আই এ্যাডমায়ার ইওর সাজেসন। আর—

তুমি যখন হিরো তখন হিরোয়িনটি বদলাতে নারাজ—এই তো?

হঠাৎ ব্রহ্মচারী হয়ে ওঠেন রণেন, না, না তা নয়রে। তবে কিনা—

তুই তো বেটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছিস।

নারে ভয় করছে জাঁদরেল অফিসারের বৌ বলে। কিসে কি বিভ্রাট ঘটায়।

মিঃ ডাস উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তা কতকটা ঠিক। তবু বলব, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সেক্স বড় চিজরে রণেন!

তুই একটা হোপলেস। আমার বুঝি কোনো মরালিটির প্রশ্ন নেই? ঘরে ছেলে মেয়ে বৌ রয়েছে, তাদের ভবিষ্যত ভেবেই তো এ পথে আসা।

এখন নিজেরটা না মারা যায়!

সে বিষয় আমি খুব হুঁসিয়ার। আমাদের বাড়ি ঘর বংশের ঐতিহ্যই আলাদা। কলেজ লাইফ থেকে কত এলো গেল, তোকে আমাকে কি টলাতে পারলে? এখন তো পোড় খেয়ে গেছি। প্রয়োজনে হাসব খেলব নাচব চাই কি নাচাব, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। দুটো পয়সার নেশা ছাড়া এখন আর কোনো নেশা নেই।—রণেন পরম গাম্ভীর্যের ভান করেন।

মিঃ ডাস ভাবেন, এতে খাদ নেই। একটু সময় দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন। রণেনের হাতে সিগ্রেট পোড়ে। ধোঁয়ার বিনুনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। রণেন সিগ্রেট ঝাড়েন। অস্ফুটে বলেন, পয়সা, পয়সা— শুধু টু পাইস করে নেওয়া চাই এ বাজারে। নীতিই হচ্ছে নিজেকে বাঁচান, বুঝলে মিঃ ডাস?

মিঃ ডাস উপলব্ধি করেন, এই বুঝি নিগুঢ় সত্য কথা রণেনের। 'ইহার উপরে নাই।' তাঁর বেশ শ্রদ্ধা হয়। এমনি মানুষই শেষ পর্যন্ত উইন করে। তা হলে নেক্স্ট বইতে আমার নায়িকা চান্স পাচ্ছে?

নিশ্চয়। বিশ্বাস না করিস লিখে দিচ্ছি।

তার দরকার নেই। তোর কথাই যথেষ্ট।

এবার তা হলে আমার নায়িকাটির জন্যে উঠে পড়ে লাগ।

সে আর বলতে! একটা কথা রণেন, সেটি কিন্তু খাঁটি সুইট সিক্সটিন নয়। আগে তোর কাছে বলেছি কিনা মনে নেই—এই বাইশ তেইশ হবে।

তুই ভাবিস নে, মেক-আপে মারা যাবে। তিনি মনের খুশিতে যা ইচ্ছা লিখেছেন—তুলের তুল না পেলে কি আমরা ল্যাবরেটারীতে জন্ম দেব? আমাদের তো পাঁচ ছ বছরের ডিফারেন্স চোখ বুঁজে চলে যাচ্ছে।

মিঃ ডাস একটা দামী ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে উঠে পড়েন।

হাওয়া হয়ে যাবি নে তো?

কেন, কেউ কি তা হয়েছে?

আরে এ হচ্ছে এক্কেবারে ফোর-টুয়েণ্টির লাইন, তোকে আমাকে কারুকে বিশ্বাস নেই।—রণেন ফিরিস্তি দেন এক গাদা।

ডাস বলেন, মাভৈ।

রণেন বলেন, আমি কি সঙ্গে যেতে পারি?

তাতে কর্মে সুবিধা হবে না। তার একজন ভুঁইফোঁড় গার্জেন জুটেছে। আমারই মুস্কিল। কত ফিকির ফন্দি করতে হবে কে জানে!

তবে তুই একাই যা।

ডাস দরজার দিকে এগিয়ে-চলেন। রণেন, ফিরিস কিন্তু। আর ক্যামেরাটা সাবধান। ওটার দাম কিন্তু সাত শ টাকা। এই হালে কিনেছি।

মহাগৌরবে মিঃ ডাস বেরিয়ে যান। এমন একটা ক্যামেরা যে কত দিন ঘাড়ে করেন নি।

একখানা ট্যাক্সি করে বেলা দেড়টা নাগাদ মিঃ ডাস এসে ব্যারাক বাড়ির সুমুখে নামেন। এখন কি ভাবে সর্ট নেবেন সেইটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। কারুকে দেখিয়ে অহল্যার ফটো তোলা যাবে না। অহল্যাকে জানালেও সে রাজি হবে না। ফুলদি টের পেলে তো দাবাগ্নির সম্ভাবনা। একটা ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে বাইরে ঘোরাও ভাল নয়। অচেনা যারা সন্দেহ করবে, পরিচিতেরা হবে আশ্চর্য। ত্রাহি মধুসূদন বলে মিঃ ডাস ভিতরে ঢুকে পড়েন।

ফুলদি!

কেউ জবাব দেন না। দিবা নিদ্রা, না ভান, না মান কিছুই স্থির-করতে পারেন না মিঃ ডাস। দুপুর বেলা। উঠানে কেউ নেই। তিনি রোদ থেকে বারান্দার ছায়ায় উঠে দাঁড়ান। আবার ডাকেন, ফুলদি!

ফুলদির কর্তৃপক্ষ জবাব দেন, কে?

আমি—

এ অসময়ে কেন বাবা?

মিঃ ডাস বুড়োকে ভাল করেই চেনেন। তিনি কি বলবেন সহসা ঠিক করতে পারেন না।—এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম···

তিনি তো ঘরে নেই।

কোথায় গেছেন?

সে কৈফিয়ৎও কি আমি দেব? যদি নেহাৎ শুনতে চাও বলি, কাল রাত্তির থেকেই তিনি নাম লিখিয়েছেন। তোমরাই তো তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ, এখন আবার ন্যাকামি করছ কেন?

বুড়োর ব্ল্যাড্‌প্রেসারটা বোধ হয় খুব বেড়েছে। এখানে এখন না দাঁড়ানই ভাল।

এতদিন যা গোপন ছিল, তাই তো ভাল ছিল—তবু আসি দু দিন বাঁচতাম। এ তোমাদের ফুলদি কি করলেন, তাঁর কি একটু মায়া মমতা নেই?

আমি তো কিছু জানিনে।

স্রেফ মিথ্যা কথা—জিভ খসে পড়বে বাপধন।

মিঃ ডাস নেমে আসেন। উঠানে গনগনে রোদ। কোথায় যাবেন? গত রাত্রে ফুলদির গতিবিধি ছিল রহস্যময়—মিঃ ডাস সকাল বেলাই অনুমান করেছিলেন, কিন্তু সে রহস্যের ওপর আরো প্রলেপ দিয়ে ওঁকে নির্বাক করে রেখেছিলেন ফুলদি। মিঃ ডাস এখন আবার চিন্তায় পড়েন।

কুশল প্রশ্নের অছিলায় মিঃ ডাস সত্যবন্ধুর ঘরে ঢুকে পড়াই স্থির করেন। তিনি ইলা বৌদির বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে আসেন। দু চারটি নতুন চারা পুঁতেছেন ইলা বৌদি। সারে জলে সতেজ হয়েছে। এতখানি রিক্ত উঠানে এই কটি সবুজের চিহ্ন বেশ লাগছে চোখে। নীল গগ্‌লস্‌ জোড়া খুলে চেয়ে দেখেন মিঃ ডাস। তিনি মুগ্ধ নেত্রে এগিয়ে যান।

সত্যবাবু ঘরে আছেন?

মেয়েলী কণ্ঠে জবাব হয়, না।

বিস্রস্ত বসনা অহল্যা উঠে বসে নিজেকে সামলায়। সে মেজেতে শুয়েছিল এতক্ষণ। এ বাড়িতে এসে সে মিঃ ডাসের কথা অনেকের মুখে শুনেছে। পুষ্পির সঙ্গে তো এই গতকালও আলোচনা হয়েছে কত। সবাই বলে ভাল, কিন্তু অহল্যার তা বিশ্বাস হয় না সম্পূর্ণ। আজ খোলা চোখে কাছাকাছি দেখে একেবারে ভুল ভেঙে যায়। ইনি তো আর পাঁচ জনের মতই একজন মানুষ। যত গোলমাল বাঁধিয়ে ছিল নীল চশমা। সেটা এখন নেই। দিব্যি তো

ওর চোখ জোড়া। যতক্ষণ গরুর চোখে ঠুলি না পরাও বেশ শান্ত দৃষ্টি। ঠুলি পরালেই বুনো ভয়। এও যেন তেমনি হয়েছিল। প্রথম দিন ছুটে পালাবার কথাটা মনে পড়ে আজ অহল্যার লজ্জা হয়।

সে কাপড় চোপড় গুছিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন।

সত্যবাবু কোথায়?

খেয়ে দেয়ে একটু গড়াগড়ি না দিয়েই কোথায় যেন বেরিয়েছেন।

তোমাকে কিছু বলে যান নি?

অহল্যার মুখখানা ভারি হয়ে ওঠে।—না।

তবে আর বসে করব কি, এসেছিলাম একটু আলাপ করতে। কেমন আছেন এখানে এসে?

সে কথা তো অহল্যা জানে না। ঝির কাছে তো কিছু ব্যক্ত করে বলেন নি বাবু। অভিমানে অহল্যা কোনো জবাব দিতে পারে না।

ডাস ঘরে উঠে বসেন। সত্যবন্ধু নেই, ফুলদি নেই—একাকিনী ভাবী নায়িকা, এ এক অভাবনীয় যোগাযোগ।

কখন আসবেন?

জানি নে।

একটু অপেক্ষা করে দেখি।

অহল্যা আপত্তি করে পারে না।

মিঃ ডাস আবার বলেন, ফুলদিও বাড়ি নেই। সত্যবাবু না আসুন, ফুলদি এসে পড়তে পারেন।

অহল্যা বিস্মিত হয়ে তাকায়। এবার ডাসের মুখেও একটা চিন্তার ছায়া পড়ে। কোথায় যেন দুজনের নাড়ীতে টান পড়েছে একসঙ্গে। অহল্যা অভিভূত হয় অত্যন্ত। মিঃ ডাস নিজের দুর্বলতা চেপে যান জোর করে।

গত রাত্রিতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা ঠিক বলা চলে না। একটা নিদারুণ কথা বলেছে সত্যবন্ধু। অহল্যার মন থেকে এখনো সে অন্ধকার পরিবেশটা মোছেনি।

শোনো অহল্যা!

অহল্যা নিঃশব্দে কান পেতেছিল কাল রাত্রে।

একটু আগে তোমার কাছে যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছি, তা সত্য নয়। তোমার টাকা পয়সার প্রয়োজন অনেক। আমার সামান্য সামর্থ দিয়ে তোমাকে

দখল করে রাখতে চাইনে। সুবিধা এবং সুযোগ পেলেই তুমি এখান থেকে বিনা নোটিশে চলে যেও। তোমার চাহিদা অনেক, কিন্তু আমার ক্ষমতা সামান্য।

আর কোনো কথা হয়নি। অহল্যা গিয়ে বারান্দায় শুয়েছে। সারাটা রাত তার কেটেছে বিনিদ্র।

পুস্পি এক ফাঁকে এ ঘরে উঁকি মারে। তারপর ঘর-ঘর গিয়ে প্রচার করে আসে সংবাদটা। কার না নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে ইচ্ছা করে। কবে কে যে এক আধখানা ফটো তুলিয়েছে, তা অনেকেরই মনে নেই। উৎপলা রেবা মীরা কালো বৌ ছুটে আসে। কনকদিও বাদ যান না। সময় মত পোস্ট অফিস থেকে টাকা তুলে ফেরেন ফুলদি।

কালো বৌ বলে, শুনছেন দাস সাহেব, আপনার আদর যত্নের বেশির ভাগ ট্যাক্সোই জোগাই আমরা—অতএব আমাদের দাবী আজ আগে। এ আপনাকে মানতেই হবে।

মিঃ ডাস হাসেন।

একে একে সকলের ফটো তোলা হয়, শুধু অহল্যা দূরে সরে থাকে।

একুশ

সন্ধ্যার একটু পরই সত্যবন্ধু বাড়ি এসে ওঠে। হাত পা ধুয়ে সে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় বিছানায়। অহল্যা এনে দেয় চা ও বেলার নির্দিষ্ট ওষুধ। আলোটা তুলে রাখে একটা উঁচু জায়গায়। এবার পাখাটা নিয়ে হাওয়া করতে থাকে ধীরে ধীরে। মিঃ ডাস যে তাকে খুঁজছিলেন, সে কথাটা বলতে ভুলে যায়।

কিছুক্ষণ সত্যবন্ধু চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। এমন আয়াস তার জীবনে যে কস্মিনকাল ঘটেনি? একটু বাদে সে উঠে বসে চা খায়। তারপর ওষুধ।

তুমি যে আজ চুল বাঁধনি?

তখন পর্যন্ত অহল্যার অভিমান যায় নি, সে কি জবাব দেবে?

সময় পাওনি বুঝি? একটু করে নিতে হয়—নইলে অমন চুলগুলো যে নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার একা একা এ সংসারের অষ্টকোটি কাজ শেষ করে নিজের দিকে বুঝি দৃষ্টি দেওয়ার সময় হয় না?

এ সংসার থেকে অনেক ঝামেলার সংসারও অহল্যাকে সামলাতে হয়েছে। তখন কি অহল্যার কোনো সাজ-সজ্জা বাদ গেছে? চুল বাঁধা, আলতা পরা তা ছিল তো নিত্যকার কাজ। মাঝে মাঝে সে কাজলও পরেছে মনের খুশিতে। সময় সময় ফুল কুড়িয়ে গেঁথেছে মালা। কিন্তু এখানে তার সে মনের খুশি কোথায়? ইন্ধন ছাড়া কি আগুন জ্বলে? সে একটা নিশ্বাস গোপন করে।

ছুটো বাণ্ডিস পেয়েছ বারান্দায়?

অহল্যা বলে না তো।

একটু ভাল করে দেখ। আবার কি রাস্তায় ফেলে এলাম মনের ভুলে ?—সত্যবন্ধু বিছানা ছেড়ে নামে।—আজকাল আমার কি যে হয়েছে।

এই যে পেয়েছি। অন্ধকারে নামিয়ে রেখেছিলেন এক কোনে।

নিয়ে এসো।

অহল্যা বাণ্ডিল দুটো এনে সত্যবন্ধুর হাতে দেয়।

এইটাতে পান সাজার যাবতীয় যন্ত্রপাতি আছে। আর এটাতে—আগে বলব না। পুষ্পিকে ডাকো। তুমিও খুলে দেখ না কিন্তু। শোনো কবিরাজ মশাই খাওয়া-দাওয়ার পর একটা করে পান খেতে বলেছেন, তাতে নাকি পরিপাকের ক্রিয়া ভাল হয়। নিষেধ নেই, তুমিও একটি আধটি খেতে পারবে। এবার যাও পুষ্পিকে ডেকে আনো আমার কথা বলে।

ঠিক বেলা দুটোর সময় সত্যবন্ধু হেড অফিসে গিয়ে উঠেছিল। ইচ্ছা ছুটি ফুরালে যাতে এখানে বদলী হওয়া যায়।

নমস্কার। হেড ক্লার্ক সুরেন বাবু ফাইল থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করেন,. কি সংবাদ ? সমস্ত কুশল তো ? কবে জয়েন করছেন ? আপনার বিরহে সিমসিম যে কাঁধছে। এই দেখুন রিপোর্টের বহর। আপনার বদলীতে যিনি ওখানে গেছেন, তিনি হেড অফিস একেবারে তোলপাড় করে ছাড়ছেন—ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং।

এমনি লোকই নিজেরটা গুছিয়ে নিতে পারে। এদের চিৎকারে আপনারা কম্পমান। আর আমরা হাজার কাঁদলেও সাড়া নেই।

বসুন সত্যবাবু ঐ চেয়ারটায়। কেন আপনি কি ছুটি পান নি ?

সে যে ভাবে পেয়েছি, তা আমি জানি আর আমার কলজে জানে। এ ডিপার্টমেণ্টে সোজা আঙুলে কখনো ঘি ওঠে না।

সুরেনবাবু একটু মুখ মুচকে হাসেন। পাশের ক্লার্কটি মন্তব্য করে, যা বলেছেন মশাই। এমন হারামজাদা—হেড ক্লার্কের দিকে চেয়ে সে চুপ করে যায়।

এর মধ্যেই সুরেনবাবু একটা ফাইল নিয়ে গভীর মনযোগে কি যেন পড়ছেন। মস্‌মস্‌ করে পাশ দিয়ে একজোড়া জুতো চলে যায়।

পাশের কেরানীটি বলে, যত সব নাড়া বুনে সব হল কিস্তনে, মন খুলে একটা কথা বলার জো নেই। ও-বেটার তোয়াজ করা ছাড়া কোনো গুণ নেই। ছিল আমাদের ব্যাঙ্কে এখন হয়েছে একজন চুকলিখোর অফিসার।

সুরেন বাবু এবারও কোনো মন্তব্য করেন না। তিনি যেমন জাতি-শত্রুর বাড়াতে চান না, তেমনি চটাতে চান খুঁদে অফিসারটিকে পর্যন্ত। এই পথেই তাঁর নাকি উন্নতি—এই পথেই তাঁর নাকি আরো আশা আছে। গুরুদেব এই পথেই তাঁকে চলতে উপদেশ দিয়েছেন।—মোক্ষধামে যাঁরা গেছেন, এমনি করেই গেছেন বাবা। একেই নিষ্ঠা বলে শাস্ত্রে।

আজকাল কেমন আছেন? মুখখানায় তো বেশ জেল্লা দেখা যাচ্ছে। ছেলে-পুলে কটি?—প্রশ্ন করে সুরেনবাবু মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

পাশের কেরানীটি বলে, হুঁ, বুলেছেন ভাল, এখন পর্যন্ত মেয়ে-মানুষের গন্ধই লাগে নি গায়—ছেলে-পুলে!

আমার অন্তর দৃষ্টি আছে। কোনো মেয়ে-মানুষের ছোঁয়া ছাড়া কেউ সিমসিম থেকে ছুটি নিয়ে এসে এত তাড়াতাড়ি হেড অফিস পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারে না। মুখের গ্লেজ কি এমনি খোলে! কি বলুক না ভায়া সত্যি কিনা?

একটু মিষ্টি হাসি হাসে সত্যবন্ধু। ঐ হাসির সঙ্গে তার মনের রং উছলে পড়ে।

কি ভাই, ব্যাপার কি? বড্ড গুরুতর বলে মনে হচ্ছে যে?—উজ্জ্বল চোখে চেয়ে থাকে পাশের কেরানীটি।

তোমার আর কিছু বলতে হবে না ভায়া—আমরা অনুমানে তোমাদের পেটের ব্যথা বুঝি। যাক আজকাল কিছুতেই দোষ নেই। দোষ দাঁড়াবে কলেরা হলে। একটু বুঝে-সুজে খেও। দিনকাল সুবিধের নয়। তোমরা বসে গল্প কর, এক্ষুণি আমি আসছি।—সুরেনবাবু গোটা দুই ফাইল নিয়ে উঠে পড়েন।—তুমি বলে বললাম দেখে কিছু মনে করো না সত্যবাবু, তোমার চাইতে আমি বয়সে ঢের বড়।

পাশের কেরানীটি বলে, অনেকদিন বাদে ক্যাম্প থেকে এসেছেন—হালে কি সিনেমা দেখেছেন? একখানা ভাল বই ছিল টাইগারে।

এমনি একটা সুযোগই সত্যবন্ধু চাইছিল—এবার জুটে যায়।

একা একা দেখতে ভাল লাগে না, যদি একজন সঙ্গী পেতাম তবে তিনটার শো-তেই ঢুকে পরতাম আজ।

আমার মত সঙ্গী হলে চলবে, না বেণী দোলান চাই?

প্রয়োজনে আপনিই আমার বেণী এবং খোপা। চলুন রুমালের আঁচলটা না হয় হলে ঢোকার মুখে মাথায় জড়িয়ে নেবেন।

সত্যবন্ধু আগে ওঠে। সুরেনবাবু এলে, পাশের কেরানীটি ছুটি করে, দুবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে।—ওয়াক্…।

দুজনে বড় রাস্তার ওপর একত্র হয়ে প্রাণ খুলে হাসে।

যত সব…!—তারপর কেরানীটি জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপার কি সত্যবাবু, এত দিলদরিয়া যে?

ছুটি ফুরাবার পর যে কোনো উপায়ে আমায় এখানে কোথাও পোষ্টিং করে দিতে হবে। এবার আর বাঁচার আশা ছিল না।

সে কথা তো বলার আগে বুঝেছি—কিন্তু আরো একটা কি যেন হয়েছে, যা প্রোমশনের চাইতেও ইমোসনাল। ব্যাপারটা কি?

কিছু নয় ভাই। যত সব বাজে কথা সুরেনবাবুর।

দেখি মুখখানা? আপনার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না সত্যবাবু। বলুন না, লজ্জা কিসের?—কেরাণীটি শক্ত করে সত্যবন্ধুকে ধরে। বলে নানা মহৎ কথা। আসল কথা সে গোপন তথ্যটুকুর স্বাদ পেতে চায়। —এখন আর কেউ পুরান সংস্কার নিয়ে বসে নেই। বিয়ে যদি না করে থাকেন, পরে করবেন। না পোষায় দুদিন বাদে ছেড়ে দেবেন। পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে দিলে আর দোষ কি!

সত্যবন্ধু একটু আঘাত পায়। এমন হালকা প্রবৃত্তি তার কল্পনার বাইরে। সে বলে, আমার হয়েছে দুর্ভোগ। একে ছাড়াও যাবে না, বিয়ে করাও যাবে না।—ধীরে ধীরে চাপে চাপে সে পরিস্থিতিটা খুলে বলে।

সমস্ত শুনে কেরানীটি বলে, আপনি মশাই ভাগ্যবান। এমন একটি হীরার টুকরো কম পুরুষেরই কপালে জোটে। আমরা হলে বর্তে যেতাম। সাধে সিমসিম থেকে পুড়ে এসে জৌলুস খোলে!

শো ভাঙার পর সত্যবন্ধু অনুরোধ করে, কয়েকটা জিনিস কিনব, আপনি একটু সাহায্য করবেন?

চলুন—সানন্দে।

পুষ্পি আসার আগেই ফুলদি এসে ঘরে ঢোকেন।—অহল্যা কোথায়?

সত্যবন্ধু তাড়াতাড়ি বাণ্ডিলটা সরিয়ে রেখে বলে, এই তো পুষ্পিদের ঘরে গেছে বোধ হয়। কেন কি দরকার? ডেকে দেব?

তুমি হচ্ছ কুঁড়ের বাদশা—যতক্ষণে উঠবে, ততক্ষণে আমিই ডেকে আনব। ফুলদি দ্রুত পায়ে চলে যান। উঠানটুকু পেরিয়ে পুষ্পিদের ঘরে গিয়ে ওঠেন।

বাসন ধুচ্ছে পুষ্পি। জল ঢেলে দিচ্ছে অহল্যা। ফুলদিকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ডাকছেন মা? যাচ্ছি। কি করব বাবু বললেন ওকে একটু ডাকতে, তাই এলাম।

তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসো, দরকার আছে।

অহল্যা মগটা নামিয়ে রেখে এক রকম ফুলদির পিছন পিছনই যায়। একেবারে ফুলদিদের বারান্দায় গিয়ে ওঠে।

বসো। আমি আসছি এক্ষুনি।

পর্দা নিয়ে সেই যে মন্তব্য করে ফুলদি সত্যবন্ধুর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আর ঢুকলেন একটু আগে। গত রাতটাও ভাল ঘুম হয়নি ফুলদির। যে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, যা খুশি তা করে, তার ভালমন্দ শুভাশুভে ফুলদির দৃষ্টি কেন? বিশ্রাম এবং পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, তার সুবিধা তিনি করে দিয়েছেন। ছিল সেবা যত্নের দরকার, তার জন্যও উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কর্তব্য বলো দায়িত্ব বলো— সেদিক দিয়ে কোনো ত্রুটি রাখেননি ফুলদি। এমন কিছু নয়, দূর-সম্পর্কের দূর আত্মীয়। তবু তার জন্য তিনি সব কিছু আপন জনের মত করেছেন। এখন যদি কেউ নোড়া দিয়ে নিজের দাঁতের গোড়া আলগা করে তবে তিনি কি হাত চেপে ধরবেন? শিশু হলেও বিবেচনা করা যেত। এ তো সাবালক শিশু। মর্জি মত কথা না হলেই দাঁত বার করে। কাল যে একটু মুখে মুখে জবাব দিয়েছিল সত্যবন্ধু, তা ফুলদির বড্ড বুকে বেজেছে। আহত হয়েছে আত্মসম্মান।

তবু তিনি পোস্ট আফিস থেকে ফেরার পথে দুটো ব্লাউজ, দুটো সায়া এবং দুটো বডিজ কিনে এনেছেন সত্যর ঝির জন্য। দাম পাবেন কিনা জানেন না, তবু আর পাঁচ জনে যাতে নিন্দা না করে সত্যকে, সেই জন্য ফুলদি উদগ্রীব।

এগুলো পরে দেখ তো ঠিক হল কিনা। বুঝলে, এরপর থেকে আর ধিঙ্গিপনা করে খালি গায় সত্যর সামনে ঘুরে বেড়িও না। ও বেহায়াপনা কোনো দিন ভালবাসে না।

রঙিন ব্লাউজ। দুধে লংক্লথের সায়া ও টাইট বডিজ। অহল্যা হাতে যেন স্বর্গ পায়। বারান্দার তারে একখানা কাপড় ছিল সে তা টেনে আড়াল করে দেয়। সায়া বডিজ ব্লাউজ পরে অতি সন্তর্পণে।

ফুলদি চেয়ে চেয়ে দেখেন। কখনো বা উপদেশ দিয়ে দেন, উঁহুঁ ও ভাবে নয়, এমনি করে। কখনো সকৌতুক বকুনি। ফুলদির মন জ্বলে। আবার প্রলেপ পড়ে তৃপ্তির। অহল্যা আহ্লাদে শুধু নাচতে বাকি রাখে। সে যেন কিছু সময়ের জন্য এই রাশ ভারি মহিলাকে ভুলে যায়। অহল্যা পায়ের ধুলো নেয়, ঘনঘন মা-মা বলে।

ফুলদি বুঝতে পারেন, তিনি ধুয়ে, মুছে, প্রলেপে বিন্যাসে যা বাঁচিয়ে রাখতে আজো যত্ন করছেন তা গত প্রায়—আর এ হচ্ছে সদ্য পাত্রে ঢালা, এখনো ফেনা মজেনি। উপচে উপচে পড়তে চায়। তাঁর দুঃখ হয় তলানি বলে। তবে তাঁরটা গেছে একেবারে বিফলে—কেউ উষ্ণ ঠোঁটে নিঃশেষ করেনি। শুকিয়ে গেছে দুঃসহ বৈশাখী দাহে।

অহল্যা ঘরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। তার উসখুসানিতে তা ধরা পড়ে। ফুলদি বলেন, থামো।—তিনি সাধ মিটিয়ে ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নেন আবার। —চুলগুলো পেত্নির মত খোলা রেখেছ কেন?

ফুলদি একখানা চিরুনী এনে খোপা বেঁধে দেন। অহল্যা ভয়েভয়ে বসে থাকে। এই সামান্য একটু বেশ-বাসের পরিবর্তনে তার রূপ যে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অনুমানে সে বুঝতে পারে। তাই সে তটস্থ। সে এখন পালাতে পারলে বাঁচে। ফুলদি আবার ওর দিকে তাকান, তারপর ছেড়ে দেন।—যাও রান্না-বান্না করগে।

অহল্যা একটু এগিয়ে যেতেই ফুলদির মনে হয়—এ আগুন ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধি ঠিক হয়নি। এক্ষুনি দাউ দাউ করে উঠবে।

বারান্দায় পা দিতেই পুষ্পি জিজ্ঞাসা করে, কে বটেন আপনি?

অহল্যা একটু গলাটা ঝাড়ে। কিন্তু জবাব বার হয় না।

আসুন দেখি ঘরে। কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? সত্যদা লাঠি নিয়ে বসে রয়েছেন।

সত্য পুষ্পির কানটা টেনে দেয়।

উঃ আর বলব না, ছেড়ে দিন সত্যদা। ছেড়ে দিন লাগছে।

লজ্জা ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে অহল্যা এসে ঘরে ঢোকে।

পুষ্পি বলে, বাঃরে, কে দিলে, ফুলপিসী? বাকিটা তোমার বাবু এনেছেন। এখন প'রে বাবুর সামনে পোজ করে দাঁড়াও।—এক জোড়া ধোলাই মিলের শাড়ি অহল্যার হাতে দেয় পুষ্পি।—এই হল আট-পৌরে। আর এখানা ব্যাঙ্গালোর—পোষাকি। বাক্সে তুলে রাখবে। কেমন হয়েছে—পছন্দ হল?

এবার আর অহল্যার কিছু বলার থাকে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একবার ভাবে এ সকলি স্বপ্ন। আবার ভাবে, না, না সত্য। সে সমস্তই দেখছে ও শুনছে। কিন্তু এত সুখ ভাল নয়। এমনি উজ্জল মধুর লগ্নই তার জীবনে বারবার আঁধার বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পুষ্পি বিরক্ত হয়ে বলে, কি গো অহল্যাদি পরবে না ঢং করে দাঁড়িয়ে থাকবে? মনের মত হয়নি বুঝি? সত্যদা ব্যাঙ্গালোরে হবে না, বেনারসী চাই।

অহল্যা কৃত্রিম ক্রোধে চোখ পাকায়।

সত্য বলে, তোকে ডেকে ভুল করেছি। এমনিতেই ও লাজুক মানুষ, তুই আরো অতিষ্ঠ করে নিয়েছিস। ওগুলো বুঝি পিসীমা দিয়েছেন, ভালই হল—আমার টাকা বাঁচল।

পুষ্পি বলে, এতগুলো জিনিস পেলে, এবার একটু হাসো অহল্যাদি বাবু খুশি হবেন, তোমার মাইনে বাড়বে আরো।

কোন্‌খানা পরব?

সত্য বলে, তোমার যেখানা খুশি। এখন না হয় মিলের একখানাই পর—কি বলিস পুষ্পি?

না, না—ব্যাঙ্গালোর। আমায় ডাকা হয়েছে কেন, নইলে আমি রাগ করব

ও কাপড় তো কোথায়ও বেড়াতে বেরুলে পরে—এখন ভাঁজ ভাঙলে আবার খরচা করে ধোলাই ইস্তিরি করো।

পুষ্পি গোঁ ধরে। না, না—একবার পরলে কিছু হবে না। দরকার হলে আমি ইস্তিরি করে দেব। ব্যাঙ্গালোর খানাই পরতে হবে।

সত্য মন্তব্য করে, এখন তুমি যা ভাল মনে কর।

অহল্যাকে আর কিছু মনস্থ করতে হয় না। ফুলদি এসে হাজির হন। সমস্ত পরিকল্পনা যায় তাসের ঘরের মত ভেঙে। পুষ্পি কাপড়ের বাণ্ডিলটা দেয় তক্তাপোষের নিচে ফেলে। অহল্যা বারান্দায় এসে হাঁক ছাড়ে।

কি হচ্ছে? রান্না বান্না নেই?

সত্য শুকনা মুখে বলে, দেখছিলাম আপনার জিনিসগুলো চমৎকার হয়েছে।

বাইশ

কিছুদিন ধরে সত্যবন্ধু আর বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়ে না। নিতান্ত প্রয়োজনে একবার বাজারে যায় শুধু। টুকিটাকি কাজ থাকলে তখনই তা সেরে আসে। বিশ্রাম বিশ্রাম—একান্ত আরামে সে চোখ বুঁজে থাকে। যখন তা ইচ্ছা করে না, তখন একখানা বই খুলে নেয় সে। যত্নে পরিচর্যায় ক্রমেই তার শরীরটা সুস্থ হয়ে ওঠে। এ ঘরখানা তার যে কী ভাল লাগে! আর ভাল লাগে এক জনের পায়ের ধ্বনি। নূপুর নেই, তবু সকাল সন্ধ্যা দুপুর কি যেন বাজে তার কানে। সে বোলে কখনো ঘুম আসে, কখনো শিহরণ। এমন করে তার চিরটা কাল কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। এই একটুখানি ঘরে সে এমন একটা বস্তুর আস্বাদ পায়—যার স্বাদ ব্যক্ত করা যায় না, যার স্বাদ বিস্তীর্ণ প্রান্তরেও সে পায়নি।

অহল্যা পুরান কাপড় ছেড়ে নতুন শাড়ি পরেছে মিলের। ফুলদি দেখেও তা দেখেননি। এবার ভাবছেন উপেক্ষা দেখাবেন। তাই তিনি সত্যর ঘরে আসা যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। নইলে হয়ত তাঁর নজরে পড়ত সত্য পান খাওয়া ধরেছে। শুধু ধরেনি, অত্যন্ত বেড়েছে। এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেজে দিচ্ছে অহল্যা। সদ্য সেরে ওঠা পরিপাক যন্ত্রটি আবার বিকল হবে। অল্প অল্প নাকি দোক্তাও চলছে। এ সমস্ত ফাঁকি হাতের কাছে গুছিয়ে দিচ্ছে অহল্যা। আবার সেও মাঝে মধ্যে ঠোঁট রাঙাচ্ছে!

মিঃ ডাস রোজই আসেন। প্রত্যহই ক্যামেরাটা থাকে তাঁর কাঁধে। কিন্তু সুযোগ হয় না। তেমন একখানা পোজ পান না। পেলেও হয়ত তখন আলো থাকে না। কি ভাবে যে তাঁর দিন কাটে! কত আর আজে-বাজে কথা বলা যায়! কত আর গরম গরম চা খাওয়া যায়!

ছেলে মেয়ে বৌরা তাকে ফটোর জন্য অতিষ্ঠ করে তোলে। কালো বৌ বলে, এ ফাঁকির মজা আছে। একদিন ক্যামেরাটা কেড়ে রাখব।

কারখানায় তৈরী হচ্ছে—কদিন সবুর করুন এসে যাবে ফটো। ফ্রেমে বাঁধাতে দিয়েছি।

মোটে মা রাঁধেন না, তপ্ত আর পান্তা!—কালো বৌ সত্যাই ভয়ানক দুঃখিত হয় মিঃ ডাসের এ টাল-বাহানায়।

মিঃ ডাস এক একদিন সত্যর ঘরে ঢুকে অনেকটা সময় চা খেয়ে গল্প গুজব করে কাটিয়ে দেন। ফটোগ্রাফী যে একটা বিশিষ্ট আর্ট সে সম্বন্ধে সত্যর সঙ্গে আলোচনা করেন বেশ গম্ভীর হয়ে।—এ হচ্ছে আলো ছায়ার খেলা। এর পারফেক্‌সনের শেষ নেই। এ জীবনে অনেক ফটো তুলেছি, অনেক রকম ক্যামেরা হ্যাণ্ডেল করেছি, কিন্তু তবু বলতে হবে যে এখনো কিছু শিখিনি। এখনো নুড়ি কুড়াচ্ছি সমুদ্রের তীরে।—তারপর তিনি দেশ-বিদেশের নানা বিখ্যাত ক্যামেরা ম্যানের নাম করেন। বলেন, কার কি বিশেষ অবদান এ লাইনে। আর চেয়ে থাকেন বারান্দার দিকে। ইস্, কতগুলো চমৎকার পোজ যে নষ্ট হল!

যতক্ষণ ভাল লাগে সত্যবন্ধু জবাব দেয়, যখন লাগে না শুধু হুঁ হ্যাঁ বলে শেষ করে। মিঃ ডাস অনর্গল বকে যান। তাঁর মুখে যেন খৈ ফোটে।

অহল্যা চুপ-চাপ বসে রাঁধে। কখনো গরমে ঘামে, কখনো মনের আনন্দে মুচ্‌কি হাসে। আবার কড়াই নামিয়ে চা করে দেয় বাবুর হুকুম হলে। এগিয়েও দিয়ে যায় ডাসের হাতে। আবার খালি হলে তুলে নিয়ে চলে যায় পেয়ালা-পিরিচ। অহল্যা ঘুরে ঘুরে আসে।

একদিন সত্যবন্ধু বলে, আমার একখানা ফটো তুলে দেবেন?

আমিও ভাবছিলাম, কিন্তু কি মনে করবেন, তাই প্রপোজ করিনি।

কি খরচা পড়বে?

কিছু না। কোনো জায়গায় কি নামছেন নাকি ছবিতে—না এ্যাপ্লাই করছেন? নায়ক হওয়ার মতই প্রফাইল আপনার। ফিগারখানাও মানান সই। বসে আছেন, চেষ্টা করার দোষ কি? একটা বইও যদি উতরে যায়, তা হলে আর বলব কি—রাজপথ খুলে গেল। আসুন না আজই একটা সট নেওয়া যাক। আপনি বললে ওরটাও তুলে দিতে পারি। কোনো অসুবিধা নেই—একেবারে আনকোরা লোড করা রয়েছে ফিলিম।

কি অহল্যা, তুলবে নাকি ?

পুষ্পি বলে, সত্যদা দাস সাহেবের কথায় আর বিশ্বাস নেই। উনি এবাড়ির সবাইর ছবি তুলেছেন, কিন্তু একখানা ফটোও কেউ পায়নি। আসলে ওঁর ক্যামেরাটাই ফাঁকি।

এমনি সময় উৎপলা রেবা কালো বৌ এসে পড়ে। এ বাড়িতে একটা কথা পড়লে আর ঢেউ উঠতে সময় লাগে না। সবাই মিলে মিঃ ডাসকে নাজেহাল করে ছাড়ে।

এর জবাব কাল দেব, আজ নয়।—মিঃ ডাস বেরিয়ে যান দ্রুত পায়।

নেগেটিভ ডেভালাপ করাছিল। এতদিন ফটোগুলো ইমপ্রেসন দিয়ে আনার কোনো উৎসাহ বোধ করেন নি মিঃ ডাস। আসলে যাকে নিয়ে প্রয়োজন তারই কোনো এক্সপোজার নেই। রণেনের সঙ্গেও এ কটা দিন ধরে দেখা করতে পারছেন না মিঃ ডাস। ক্যামেরাটা তাঁর কাছে। রণেন যে কি ভাবছে!

মিঃ ডাস নেগেটিভগুলো নিয়ে দোকানে দিয়ে আসেন। বলে আসেন ভাল কাগজে একটু যত্ন করে ছাপতে। দাম যা দাবী করে, তাতেই রাজী হয়ে যান তিনি। বিকালের দিকে তিনি সুন্দর পিচবোর্ডের ফ্রেম কিনে নিয়ে আসেন এক গাদা। ছবিগুলো তাতে পরিয়ে ব্যাগে রাখেন। এবার হাঁটতে থাকেন গড়্‌গড়্‌ করে।

ব্যারাক বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি থামেন। এখন ওখানে ঢোকা উচিত হবে না। ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই একটি ঘরেও। কালো বৌ আসবে হয়ত লম্ফ নিয়ে। পুষ্পি তেলের প্রদীপ। ছবিগুলো তেলে কালিতে নষ্ট হয়ে যাবে। এর কদর বোঝাব মত মানুষ ওখানে নেই। লেখাপড়া জানলে কি হয়, সত্যবন্ধুরও এ বিষয় তেমন রুচি নেই। অন্তত সে পরিচয় এখন পর্যন্ত তার পাওয়া যায়নি।

মিঃ ডাস নিজের বাড়ির দিকে ফেরেন। আলো জেলে ফ্যান খুলে ছবিগুলো নিয়ে বসেন। পাকা ক্যামেরা ম্যানেরও নিজের তোলা এই সাধারণ ছবিগুলো দেখতে ভাল লাগে। নানা বয়সের মেয়ে। নানা রকম ঢং। কারুর বা লাজুক-লাজুক শ্রী। কারুর বা তেজদৃপ্ত ভঙ্গী। ফুলদির মুখে কামনা বিষাদের ছায়া। দেখতে দেখতে তাঁর দেখা ফুরায় না। মুখরা পুষ্পি ও কালো বৌ মাৎ করেছে স্বাভাবিকতায়। এদের মধ্যে কে না নায়িকার যোগ্য ?

অথচ এ ফুলগুলো ফুটেছে জঙ্গলে। এদের চয়ন করে তোড়া বাঁধার উপায় নেই।

ফুলদির ছবিখানা তিনি বুকে করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম ভেঙে দুপুর রাত্রে তিনি লাইট নেভান। অযথাই ইলেকট্রিকের বিল বাড়ছে।

ঘরে এসে চুপি চুপি জ্যোৎস্না পড়ে। বিছানা ভেসে যায়। গড়িয়ে পড়ে কঠিন মেজেতে। মিঃ ডাস এবার স্বপ্ন দেখেন—যেন ফুলের তোড়ার মত অনেকগুলো ব্যারাক বাড়ির মুখ। মাঝখানটিতে ফুলদি। অপূর্ব লাবণ্য। অপার্থিব গন্ধ।

এখনো বাদুড়ের মত ডানা ঝাপটাচ্ছে ফ্যানটা—সর্বনাশ! তিনি উঠে অফ্ করে দেন সুইচটা। বাকি রাতটুকু পাইচারি করে কাটান।

সকাল বেলা তিনি আর চায়ের হাঙ্গামা করেন না। দাড়ি কামিয়ে চটপট সাজটা করে নেন। এমন ফ্রেমে আঁটা ছবিগুলো দেখলে নিশ্চয় সত্যবন্ধুর প্রলোভন হবে। সেই সুযোগে তিনি শিকার করবেন লক্ষ্যটিকে। ভবিষ্যত না বুঝে তিনি আর এতগুলো পয়সা জলে ঢেলে দিচ্ছেন না।

কদম কদম পা বাড়িয়ে তিনি আর ব্যারাক বাড়ি যাবেন না। ওটা ফেলিওর এন্‌টারপ্রাইজ—ওভাবে দিল্লী পৌছান সম্ভব নয়। তিনি একটা রিক্সা ডাকেন সগৌরবে।

সকাল বেলাই পুস্পি ফিরছিল মুদী দোকান থেকে সওদা করে। সে ছুটে মার কাছে গিয়ে ঠোঙাগুলো নামিয়ে রাখে। উঠানে এসে চেঁচায়, কালো বৌদি, রেবাদি তোমরা সাবধান। কলেরার ডাক্তার ইনজেকসন দিতে আসছে।

সবাইর একটু কেমন যেন ভয় হয়। এখন আবার কলেরা লাগল কোথায়?

মিঃ ডাস কর্পোরেশনের ডাক্তারের মত একটা ব্যাগ নিয়ে হাজির হন। সকলে খিলখিল করে হেসে ওঠে। উৎপলার খোপাটা তো খুলে পড়ার জোগাড়।

রেবা বলে, আসুন ডাক্তারবাবু—নমস্কার। পুস্পি একটা ভাঙা তেপায়া টুল এগিয়ে দেয়। হাসি ঠাট্টায় বাড়ির অন্যান্য বৌরাও মুখর হয়ে ওঠে।

কালোবৌর কাঁথা কাপড় কাঁচা আছে।' সে বলে, ওরে বাপরে সাহেব সাপুড়ে যে, আমি পালাই।

কিন্তু মিঃ ডাস তাকে দাঁড়াতে বলেন।—অনুগ্রহ করে অন্তত বিলেতি

সাপের কেরামতিটা দেখে যান। ছেড়ে দিলেই আপনাদের অবাক করে দেবে। একেবারে লেজুড়ে ভর করে দাঁড়াবে।

বড় বড় চোখজোড়া বিস্ফারিত করে কালোবৌ বলে, তাই নাকি?

ফটো হাতে দিতেই সে অবাক হয়ে যায়। হাতের কাপড়-চোপড় ফেলে ছোটে ঘরের দিকে। গিয়েই স্বামীর সঙ্গে এক পসলা ঝগড়া। সে বেচারী কবে কি যেন খোঁটা দিয়েছিল কালোবৌর চেহারা নিয়ে। ক্ষণিকের জন্য কালো বৌ ভাবে, বিধাতার অভিশাপ নইলে সে ঝিয়ারী করবে কেন এ অভাবের সংসারে? এরূপে তার পক্ষে একজন প্রিয়দর্শনা অভিনেত্রী হওয়া অসম্ভব ছিল না! তার বুক ঠেলে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ফটোগুলো হাতে হাতে ঘোরে। হৈ চৈতে জমজম করে ওঠে এই সকাল বেলাই ব্যারাক বাড়িটা। কর্তারাও এসে যোগ দেন কলরবে। সত্যবন্ধুও ঘরে থাকতে পারে না। পুম্পির জ্বালায় হাতের কাজ বন্ধ রাখতে হয় অহল্যাকে।

গত রাতটা উপোসী কেটেছে মিঃ ডাসের। এখন লুচি হালুয়াটাও যা পান, তাতে বস্তা এবং ড্রাম বোঝাই করা চলে।—রক্ষা করুন, মানুষে কি এত খেতে পারে?

আজ সকাল বেলার নরম রোদের ছায়ায় বসে সত্যবন্ধু ফটো তুলিয়ে নেয়। অহল্যা আপত্তি করলেও তা টেঁকে না। পুম্পি তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে জায়গা মত বসিয়ে দেয়। নানা ভঙ্গিতে গোটা তিনেক শট নেন মিঃ ডাস। মুখে বলেন, নড়ে-চড়ে সব বুঝি মাটি করলে!

অহল্যার বুকটা ছ্যাক করে ওঠে।

এত কলরবের মধ্যে ফুলদি শুধু নীরব। তিনি মাত্র এক কাপ চা পাঠিয়ে দিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ভাল লাগে না তাঁর আজকার হাসি ঠাট্টা উচ্চ কণ্ঠ। এমন সকালের রোদেও তাঁর মনটা যেন মেঘাচ্ছন্ন।

মিঃ ডাস পুম্পিকে জিজ্ঞাসা করেন, ফুলদি কোথায়?

কি জানি বাপু বলতে পারিনে।—সে আবার হৈ চৈতে মেতে ওঠে।

একটু ডেকে দাও না।

আপনি যাও না!

উৎপলা বলে, ছিঃ ছিঃ অমনি করে কি কথা বলতে আছে?

ফুলপিসী আজ গঙ্গা স্নান করে পুজোয় বসেছেন। গেলে ঠ্যাঙাবে।

আমি পারব না। তোমরা কেউ যাও। যক্ষের মত বুড়ো আগলে রয়েছে।

কৌতূহলী ডাস ওঠেন। ফুলদির যে এত ভক্তি বিশ্বাস থাকতে পারে তিনি তা স্বীকার করতে চান না। মনে মনে একটা ব্যঙ্গ অনুভব করেন। এ আর কিছু নয়, নাটুকেপনা। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখে অবাক হয়ে যান।

ফুলদি একখানা রাঙা পাড়ের দুধে গরদ পরে মৃগ চর্মে ব'সে। সম্মুখে পঞ্চ প্রদীপ। তার শিখায় উজ্জ্বল হয়েছে দেব মূর্তি। নিকটেই ফুল চন্দন এবং পূজার নানা উপকরণ। সবে গলায় আঁচল দিয়েছেন ফুলদি—আভূমি প্রণত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত। ক্ষণিকের জন্য ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে ওঠে। ক্যামেরায় ক্ষুদ্র একটি শব্দ। মিঃ ডাস সরে আসেন। তিনি চিরকালের জন্য ধরে নিয়ে এসেছেন একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

একটা দোকানে আর্জেণ্ট চার্জ দিয়ে মিঃ ডাস ডেভলাপ ও প্রিণ্ট করিয়ে নেন ছবিগুলো। অহল্যার পোজ তাঁর আশার অতিরিক্ত ন্যাচারাল কিন্তু ইঙ্গিতময় হয়েছে। এ দেখলে রণেন কাত্ হয়ে পড়বেন। ফলে মিঃ ডাস চান্স পাবেন অচিরে। কিন্তু ফুলদির যে আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে। হ'ক—ও ঈশ্বর বিশ্বাস নয়, মনের অবসাদ—ইংরেজিতে যাকে বলে পার্ভারসন্।

ও ঘুচে যাবে দুদিনে, জীবনের স্বাদ পেলেই। এককালে শ্রেয় বোধ ছিল শিলা এবং বিগ্রহকে জড়িয়ে। আজ বাড়ছে জীবন সত্যকে আঁকড়ে ধরে। বিজ্ঞান সব ওলট-পালট করে দিয়েছে। মিঃ ডাস সমস্ত সত্যকে দেখেন ক্যামেরার ফোকাস দিয়ে।

তিনি ট্যাক্সি করে তাজ্জব প্রডাকসনের দুয়ারে নামেন। লিফট ধরে ওঠেন ওপরে। আজ আর দেরী সয় না। রণেনকে একেবারে মৃতসঞ্জীবনী ছোঁয়াবেন। এ কদিনে রণেন নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। একেই বলে আসল বিরহ। কালিদাস মার্কসীয় দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে কখনো মেঘদূত লেখেন নি। এ যুগে তিনি জন্মালে রণেনকে নিয়ে মহাকাব্য লেখা সম্ভব হত!

মিঃ ডাস গিয়ে দেখেন, তাজ্জব প্রোডাকসন একেবারে নীরব। একটি মাছি পর্যন্ত নেই। কোথায় সেই হৈ হৈ ছন্দের প্লাকার্ড পোষ্টার? তার বদলে সাইন বোর্ড টাঙান রয়েছে: বিড়ি মার্চেণ্ট দাদা ভাই শুকমল।

ব্যাপার কি? ভুল হল নাকি? না। ঐ তো লাস্যময়ী কল্পিতা নায়িকার ছবি লুটাচ্ছে মেজেতে। পানের পিক্ থুথুতে একাকার। তাঁর প্রাণটা কেঁদে ওঠে। এ হল কি? রাজ সভার জৌলুস যেন নিবে গেছে আরব্য রজনীর উপাখ্যানের মত।

তিনি নিচে নেমে দারোয়ানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন সব।

দারোয়ান জবাব দেয়, তাজ্জব প্রোডাকসন সব কো তাজ্জব বনা দিয়া। অগর—অর্থাৎ ভাকে পারেনি। কিছু বকশিশ হলে সে পারে রণেনের পাত্তা দিয়ে দিতে।

মিঃ ডাস বলেন, কারুর সর্বনাশ আর কারুর পৌষ মাস! নে বাবা দু'আনা পয়সা নে।

উ হুঁ দু'রুপেয়া চাই।

বলিস কি! তোর কি বুকে মায়া দয়া নেই?

সে বলে যে দুনিয়ার এই হালচাল। ফাঁসীর আসামীকে উকিলের ফিস দিতে হয়, শ্মশানের ডাক্তারও মওকা মত মড়ার কাছে হাত পাতে। ফিস না দিলে সে কিছু বলতে পারবে না। সেলাম।

অনেক টানাটানির পর আট আনাতে রফা হয়।—তুমি বাপধন একেবারে শকুন!

একটা ঠিকানা পেয়ে মিঃ ডাস ক্লান্ত পদে হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু গলিতে ঢোকেন। ছোট্ট একটা ঘরে রণেন বসে। দুপুর বেলাই সুমুখে একটি মোমবাতি জ্বলছে। কিন্তু তাতে অন্ধকার ঘুচছে না সম্পূর্ণ। টেবিলের ওপর কতগুলো ছোট ছোট থলেতে মসলা।

একি ভাই?—মিঃ ডাসের গলা ভারি হয়ে ওঠে।—একি রণেন?

আর কিছু জিজ্ঞেস করিস নে।—ছলোছলো চোখে রণেন বলেন একেবারে ~~ভোর~~ টয়েন্টির লাইন। আশায় আশায় আমার পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু গেছে। যত সব জোচ্চোর বদমাস!—রণেনের মুখ দিয়ে একটা উগ্র গন্ধ আসে। একটু থেমে তিনি আবার বলেন, এবার মসলার দালালী ধরেছি, তুই একটা ক্যাপিট্যালিষ্ট দিতে পারিস যে ইনভেষ্ট করতে পারে লাখ খানেক?

মিঃ ডাস থ' মেরে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, সে আমি পাব কোথায়?

তবে অন্তত ক্যামেরাটা রেখে কিছু দে—এ্যানিথিং, যা তোর খুশি

মাইরী।—রণেন হাত দুখানা জড়িয়ে ধরেন মিঃ ডাসের।—গাঙ্গে আমার ভরাডুবি হয়েছে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মিঃ ভাবে না, এরপর কি করা যায়? অবশ্য অহল্যা ও সত্যবন্ধুর ছবিগুলো পরদিন সকাল বেলাই পাঠিয়ে দেন তিনি।

তেইশ

গোটা দুই মাস কেটে গেছে ব্যারাক বাড়িতে। শুকনা উঠান মাঝে মাঝেই জল ছপ ছপে হয়ে ওঠে। ছেলে মেয়ে নিয়ে বৌঝিদের কষ্ট হয়। একখানা ঘরের মধ্যে যেন কয়েদ খানার আসামী—কান্নাকাটি হৈ চৈ ছুটো-ছুটি সব। সীমানার বাইরে গেলেই জল আর কাদা। অসহ্য এক পরিস্থিতি। কালো বৌ তার ছেলে মেয়েগুলোকে যেমন মারে, তেমনি মীরা বৌ।

সত্যবন্ধু সেবাযত্ন বিশ্রামে কান্তি ফিরে পেয়েছে অপূর্ব। অহল্যার রূপেও যেন মার্জিত ঢল এসেছে। এখন সে কারুকে পরোয়া না করে যখন-তখন পর্দা ফেলে। প্রয়োজন হলে এক তিলও দেরী করে না। আজকাল ওর সংসারে কাজের চাপ খুবই অল্প। ওষুধ পত্রের ঝামেলা নেই। দুটি প্রাণীর রান্না শুধু। বাবু যখন বসে বসে বই পড়েন, ও তখন ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়িয়ে গল্প করে। মুখে পান, আঁচলে চাবি—তোলা ঝিরা যেন চোখ মেলতে পারে না।

মানদা বলে, আমিও বয়েসের কালে একটা অমনি চাকরি পেয়েছিনু। গাড়ি ঘোড়া নোক নস্করের অভাব নেই। তাঁনারা ইচ্ছা করলে ও-মাগীর বাবুকে সমেত কিনতে পারেন। গিয়ে দেখনু একটি মেয়ে মানুষ নেই, অমনি চাকরির কপালে লাথি মেরে চলে এনু? যদি মেয়ে নোকের চরিত্তিরই খোয়া গেল—সে সশব্দে বাসনপত্র নাড়তে থাকে।

ক্ষেন্তি বলে, ও-টা তো বেবুশ্যে। দেখ না ওর চাল-চলন? যেন ঢলে ঢলে গলে গলে পড়তে চায়। যাক সত্যবাবু দোরোখা শাড়ি পেয়েছে বিনি মাইনেতে। এমন বোকা কি পাড়া গাঁয়ে ছাড়া জন্মায়।

এ সব কানা ঘুষা সময় সময় অহল্যা শোনে। এক এক সময় তার ইচ্ছা করে জবাব দিতে। কিন্তু সে ওদের অগ্রাহ্য করেই চলে। আর যা-ই হক, সে অত হীন নয় যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করবে। যেদিন অহল্যা অত্যন্ত বিরক্ত হয়, ভাবে সত্যবন্ধুকে বলে দেবে। সত্যবন্ধু নিশ্চয় এ নিয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত করে ছাড়বে। মিথ্যা দুর্নাম সে কিছুতেই সইবে না। ভাবতে ভাবতে আর বলা হয়ে ওঠে না। কিসের ঝগড়া কিসের তর্ক? যখন অহল্যা সংসার ও সমাজ থেকে ভেঙে এসেছে, তখনই তো তার জাত গেছে। শরীরের শুদ্ধতাই শেষ কথা নয়।

দু' একদিন অহল্যা চাবির রিংটা সত্যবন্ধুর কাছে ঠেলে দেয় বাক্স-বন্ধ করে।

বই থেকে মুখ তুলে সত্য জিজ্ঞাসা করে, এ কি?

কিছু নয়, আপনার জিনিস আপনি রাখুন।

নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

না, কিছু হয়নি। অসুবিধা হয় সর্বদা আঁচলে চাবি টানতে।

সত্যবন্ধু আর অনুরোধ করেনি। তবু কোন্ যেন অসতর্ক মুহূর্তে আবার চাবি উঠেছে আঁচলে। সত্য দেখে হেসেছে, কিছু বলেনি।

অহল্যার চাল চলন যেমন বদলেছে—তেমনি বদলেছে ভাষার ভঙ্গী। সে কথাবার্তায় এখন বেশ আধুনিকা হয়ে উঠেছে। যেন এ বাড়ির কোনো বৌ কি মেয়ে। তার রুচির পরিচয় দুএক সময় সত্যবন্ধুকে আচমকা বিস্মিত করে দেয়।

অনেক জিনিস আনা হল, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের নেই। অথচ তার দাম যে খুব বেশি, তা নয়।

জিনিসটি কি? সম্ভব হলে তা আনতে হবে।

দুটো ফুলদানী।

ফুল কোথায়?—সত্যবন্ধু উঠে বসে।

পুল্পি এসে হাজির হয়। একটু দাঁড়ায় বালতিটা রেখে।—কি আলাপ হচ্ছে সত্যদা?

অহল্যার সখ হয়েছে ফুলদানী কেনার, কিন্তু নিত্য টাট্‌কা ফুল কোথায়?

একটু চোখে চশমাটা দিন তো!

কেন?

দিয়েই দেখুন না ?

বল না কেন ?

সত্য অনিচ্ছায় চশমা জোড়া চোখে দেয়।

পুষ্পি অহল্যার মুখখানা তুলে ধরে।—এমন টাট্‌কা গোলাপ সুমুখে থাকতে দেখতে পান না, আপনাকে আর বলব কি ?

অহল্যা তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নেয়। সত্য লাল হয়ে চশমা জোড়া খুলে রাখে।—তুই বড্ড দুষ্টু মেয়ে।

স্বীকার করছি সে দুর্নাম আমার আছে, কিন্তু কথাটা তো সত্য !

সত্যবন্ধু মনে মনে ভাবে, শুধু সত্য নয়, তারও অতিরিক্ত। গোলাপ সুন্দর, কিন্তু এ ফুল বর্ণনার বাইরে। গোলাপে নেশা লাগে, কিন্তু এ ছুঁলে মানুষ ঢলে পড়ে। অথচ একে নিয়েই সত্যর আজ পাশাপাশি পথ চলা। সিমসিম ছেড়ে সে এখানে বাঁচতে এসেছে। একদিন হয়ত দেখা যাবে সে মরে বেঁচেছে। সত্য বইতে মন বসাতে চেষ্টা করে। বারবার তা ব্যর্থ হয়। বারবারই মনে পড়ে অহল্যার মুখখানা। সে চশমা খুলে রাখে। তবু স্মৃতি তাকে পীড়া দিতে ছাড়ে না। সে একটা জামা গায় দিয়ে উঠে পড়ে।

অসময়ে কোথায় যাচ্ছেন ?

একটু কাজ আছে—ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরব।

কি এমন জরুরী কাজ, বিকালে গেলে হয় না ? নাওয়া খাওয়ার যে সময় হয়ে এলো ! ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

যাক, তবু একটু ঘুরে আসি। ভাল লাগছে না চুপচাপ বসে থাকতে।

তবে কাজ নয়, একটু অনিয়ম করার ইচ্ছা। আমি থাকতে তা পারবেন না।—অহল্যা এসে সুমুখে দাঁড়ায়। সত্যবন্ধু জামাটা খুলে যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখে।

একা একা এক ঘরে আর বন্দী হয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না।

কত কষ্টে একটু সুস্থ হয়েছেন আর ছটফটানি সুরু হয়েছে। এ সংসারে শুধু নিজের কথা ভাবলে হয় না। আরো অনেকে একা, আরো অনেকে বন্দীর মতই জীবন কাটায়। কই, তারা তো আপনার মত ছুটে পালিয়ে যেতে চায় না !

সত্যবন্ধু কিছু বলে না। সময় মত স্নান করে ভাত খায়। টুকিটাকি কাজকর্ম শেষ করে। অহল্যা যায় পুষ্পিদের ঘরে। আকাশে মেঘ জমেছে—

কালো জলো মেঘ। এক্ষুনি হয়ত ঝমঝম করে বৃষ্টি নামবে। বারান্দাটা ফাঁকা। অহল্যার বই নেই। সে একা একা থাকবে কি করে?

ঘণ্টা দুয়েক বাদে সে ভিজতে ভিজতে যখন ফিরে আসে তখন ভাবে, এইবার বাবু না উলটে তাকে নাজেহাল করে ছাড়েন। উপদেশ দেওয়া সোজা, কিন্তু পালন করা বড় কঠিন।

ঘরে এসে অহল্যা অবাক হয়ে যায়। এই জলে বৃষ্টিতে কোথায় গেলেন বাবু? সঙ্গীহীন জীবন ভালো লাগে না। এ অপূর্ণতা সে কি দিয়ে পূর্ণ করবে? মাস মাইনের ঝিকে দিয়ে যা সম্ভব, তাতে তো অহল্যা কার্পণ্য করছে না। এর অতিরিক্ত সে কি দেবে বা করবে?

অহল্যা বিকালের চা জল খাবার তৈরী করে না। সে চুপচাপ বসে থাকে, তারপর শুয়ে। বাবু হয়তো রাগ করেছেন—পেয়েছেন অহল্যার কোনো ত্রুটি। কিন্তু তেমন কিছু যে সে করেছে তা তো মনে পড়ে না। সে একান্ত ভাবেই মন জুগিয়ে চলে। তবু কিছু বাকি থেকে যায়। সে উপুড় হয়ে শিউরে শিউরে অনেক কিছু ভাবে। ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে কাজকর্মে লেগে যায়। ফিটফাট ঘর সে আরো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে। কাপড় কোঁচায়, বিছানা বিছায় দারুণ উৎসাহে। সত্যবন্ধু রাত্রে কি খাবে, কি খাবে না—তা অহল্যার জানা নেই। তবু সে রান্নার আয়োজন করে নিয়ে বসে অনেক কিছু।

কানের কাছে এসে পুষ্প বলে, তোমার বাবু কোথায়?

কেন?

জলে কাদায় আর এক ঘেঁয়ে সংসারী কাজ করতে ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে বসে বসে একটু চা খেতাম, আর গল্প করতাম পা দুলিয়ে।

কে চা করে দিত?

কেন যে রোজ দেয়, এই তুমি।

বাবুটিকেও নেবে, চাও খাওয়াবে—এমন বোকা আমি নই।

কে তোমার বাবুকে নেবে—অমন আলসে, অন্ধ বোবাকে? আমার ঘাড়ে পড়লে একদিনও সইতে পারতাম না। দিতাম ঠেলে ফেলে।

আলু কুটতে কুটতে অহল্যা জবাব দেয়, মাইনের মানুষ হলে আর এ কথা বলতে পারতে না ভাই। ঝি চাকরের যে কত সইতে হয়!

তুমি কি সত্যদার ঝি?

অহল্যা হেসে জিজ্ঞাসা করে, তবে কি?

এবার একেবারে ঝুঁকে পড়ে পুষ্পি জবাব দেয়, বলব রাগ করবে না তো? বৌ—সত্যদার গিন্নী।

ছিঃ! অমন ঠাট্টা করলে আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

আচ্ছা আর বলব না। দোষ হয়েছে মাপ কর অহল্যাদি।

রাঁধতে রাঁধতে অহল্যা পুষ্পির সঙ্গে গল্পগুজব করে আর গেটের দিকে তাকায়। যখনই জল একটু থামে তখনই ভাবে, এইবার বুঝি বাবু এসে পড়বেন। কিন্তু সত্যবন্ধুর দেখা নেই। রাত বাড়ে একটু একটু করে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বাড়ে অহল্যার। কেমন মানুষ যে নিজের শরীর সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা নেই। এমন করে ভিজলে কি আর রক্ষে আছে? আবারও পড়ে থাকতে হবে বিছানায়। অহল্যাকেও শুনতে হবে গঞ্জনা। ফুলদি যতই চুপ করে থাকুন, সত্যবন্ধুর কিছু হলে আর রক্ষা রাখবেন না। অহল্যা কাজকর্ম করে বটে, কিন্তু তার হৃদকম্প হয়—তার বাবু এবার দুকূল মজাবেন।

দুখানা গরম গরম লুচি ভেজে পুষ্পিকে খেতে দেয় অহল্যা। পুষ্পি একটু আপত্তি করে, কিন্তু অহল্যা তা শোনে না।

চা খাবে?

তুমি খেলে আমাকেও দাও। আমার তেমন নেশা নেই।

এর মধ্যেই কেটে গেল?

পুষ্পি কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। যে পথে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, সে পথ সে ধরে না।—ছোটবেলা থেকেই মা বাবা ও অভ্যাস করান নি, তাই নেশাও জমেনি। কাটার কথা তো ওঠেই না।

গরিবের ঘরের মেয়ে পুষ্পি। একটু মুখরা হলেও দুদণ্ড বিশ্রাম পায় না। শুধু কাজ আর কাজ। সে যতটা বড় হয়েছে, যে পরিমাণ তার যৌবন খুলেছে—ততটা তার নেশা লাগার সুযোগ হয়নি। একটা ব্যথা বেজে ওঠে তার গলার সুরে। খুব তলিয়ে না বুঝলেও, অহল্যার তা মর্মে বেঁধে।

আজ পুষ্পি ছোট, কারণ প্রয়োজনে শাড়ি জোগাতে পারে না তার বাপ। আজ পুষ্পি কিছু বোঝে না, কারণ তার নিয়ম মত ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখা হয়নি। কিন্তু বয়সের ধর্ম যাবে কোথায়? তা অকারণে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। এবং বর্ষা মুখর রাত্রে বড়ই করুণ ঠেকে অহল্যার কানে।

তোমার কবে বিয়ে হবে ভাই?

হট্ করে এ কথা যে? তুমি বড্ড ফাজিল। আমার ভালো লাগছে না—উঠে যাব কিন্তু।

না ভাই আর বলব না—তবু তো তোমার একদিন বিয়ে হবে!

হবে না। আজকাল হয় না। সত্যদার কি হয়েছে?

তিনি তো মেয়ে নন।

আজকাল ছেলে মেয়ে এক সমান। ফুলপিসী সেদিন বলছিলেন যে ধীরে ধীরে ওসব উঠে যেতে বসেছে। আমাদের আমলে নাকি একদম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই যাক মন্দ হবে না।

কিন্তু কেমন করে থাকবে?

জানি নে বাপু। ওসব আমার শুনতে ভালো লাগে না। কেন সত্যদা কি থাকে না?

থাকেন তো—কিন্তু…

আমাদের, মনে কিন্তু নেই। তোমার মনটা বড্ড সেকেলে।

একালের মেয়ে বটে পুষ্পি! কিন্তু সেদিন তাকে অনেক ভাবায়। বীজ ছিল, অহল্যা জল ঢেলেছে—এখন তা সূর্যের দিকে বিস্ময়ে বেদনায় তাকাতে উন্মুখ।

কাল আমার জন্ম দিন।

হঠাৎ মনে পড়ল যে? নেমতন্ন করবে নাকি?

সে ক্ষমতা কি আমাদের আছে? তবে তুমি চা খেতে যেও। মা বাড়ি শুদ্ধ বলতে পারবেন না, তোমাদের মত ক জনাকে বেছে বেছে বলতে বলেছেন। যাবে তো অহল্যাদি?

এ আর বলতে—নিশ্চয়।

কিন্তু কথা দিয়ে অহল্যা বিষম বিপাকে পড়ে। খালি হাতে তো যাওয়া সম্ভব নয়। তার হাতও তো একেবারেই শূন্য।

অহল্যা সত্যবন্ধুর জন্য অপেক্ষা করে। সে ফেরে না। ওদিকে কালো বৌ ও মীরা বৌদি কচকচ করছে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কচি-কুচোগুলোর কি দোষ—সারাটা দিন এক চৌহদ্দিতে বন্দী—মাঝে মাঝে তাণ্ডব জুড়ে নেয়। সেইজন্য এখন চলছে নির্বিচারে মার।

মনটা টাটিয়ে ওঠে অহল্যার। পুষ্পি চলে গেছে। অহল্যা কোলে কাঁখে

পিঠে করে তিন চারটিকে নিয়ে আসে। বলে, তোমরা না কাঁদলে খেতে দেব। তারপর ধৈ ধৈ করে এ ঘরে নাচো।

ওরা চোখ মুছে রাজি হয়। অহল্যাও কয়েকখানা লুচি ভেজে দেয় তাড়াতাড়ি। অবশেষে গল্প জুড়ে নেয় রাজপুত্তুর আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার। মা দিদিমার মুখের কথা সে আজো ভোলেনি। ভোলেনি পদ্মর কথা—যে ভেঙে দিয়েছিল ওদের সাধের খেলা ঘর। সেদিনের কচি শিবুকেও মনে পড়ে। মধ্যে মধ্যে গল্প বন্ধ হয়ে যায়।

ওকি চুপ করলে যে অহল্যাদি?

না বলছি, তারপর—অহল্যা আবার উদাস হয়ে যায়। আজ আর কারুর ওপর হিংসা দ্বেষ নেই তার। শুধু মনটা গলে যেতে চায়।

ছেলেমেয়েরা বিরক্ত করে। চুপ করলে কেন, বলো, বলো তারপর—

তারপর আর কিছু বলার শক্তি নেই অহল্যার। সে মুস্কিলে পড়ে। এমন সময় সত্যবন্ধু এসে হাজির হয়। আবার কোলে পিঠে করে ছেলেমেয়েদের চালান করে দিয়ে আসে অহল্যা।

ভিজতে ভিজতেই এলেন বুঝি?

না, তেমন জল কোথায়? কাজ কর্মে বেরুলে এমন একটু আধটু ভিজতে হয়।

জামা কাপড় শীগ্‌গির ছাড়ুন। বীরত্ব করার মত আপনার শরীর নয়। এর জের এখন সামলাতে পারলে হয়।

না পারি, তুমি তো রয়েছ।—সত্যবন্ধু স্নিগ্ধ হাসি হাসে।

আর কঠিন হওয়া যায় না। অহল্যারও শাসনের মুখোস হাসিতে ভেঙে পড়ে। ভেবেছিল কত কি বলবে, কিন্তু বাবু কি বলতে দিলেন! অহল্যার মনটাকে এমনি সত্যবন্ধু আজকাল দিগ্‌ হতে দিগন্তরে টেনে নিয়ে যায়। অহল্যা যদি থাকতে চায় উত্তর মেরুতে, কখন যে সত্যবন্ধু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় দক্ষিণ সমুদ্রে! বড় কঠিন হয়েছে নিজেকে নিজের আয়ত্তে রাখা। বড় দায় হয়েছে এভাবে নিজেকে সামলান।

শুতে গিয়ে সত্যবন্ধু জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার এখানে ক'মাস আছ—হিসেব রাখো? মাইনে পত্তর তো কিছু দাবী করছ না?

অহল্যা চুপ করে থাকে।

মাইনে নেই বুঝি? আপ্‌ খোরাকী হলে আমার আর কোনো ভাবনাই থাকত না।—সত্যবন্ধু অপেক্ষা করে থাকে। তবু অহল্যা মুখ খোলে না।

এই টাকা চল্লিশটা নাও।—সত্যবন্ধু চারখানা দশটাকার করকরে নোট বার করে দেয়।

ও আমি কোথায় নিয়ে যাব?

কেন দেশে পাঠিয়ে দাও। আজ বাক্সে রাখো। চাবি তো তোমার কাছেই আছে।

গাঁয়ের নাম জানি, কিন্তু পোস্টঅফিসের নাম তো জানিনে। চিঠিপত্তরও লেখার দরকার হয়নি কক্ষনো। কি করে টাকা পাঠাব?

একটু ভেবে সত্যবন্ধু বলে, তবে কি একবার দেশে যাবে?

অহল্যার মনটা না, না করে ওঠে। সে হাতের ভেলা ছেড়ে আর মহা-সাগরে ভাসতে রাজি নয়।

চব্বিশ

আজ কয়দিন হয়নি অহল্যা বাড়ি ছেড়ে এসেছে!

শিবুর কি হয়েছে অহল্যা তা জানে না। মা'র অবস্থাও তার অজ্ঞাত। দেশে গেলে হয়ত এমন কিছু শুনতে হবে, যা অসহ্য। তার চেয়ে একটিবার সে খোঁজ নিয়ে দেখবে কালিঘাট। সেখানে নাকি তার শ্বশুরের দেশের অনাথ দাস চিঁড়ে বেচতে আসে পাইকারী। অহল্যা এখন কিছুতেই এ আশ্রয়টা ছেড়ে যাবে না। পারলে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে। এতদিন সে কোনো সাহায্য করতে পারেনি। এখনো কি তার আশায় কেউ বসে রয়েছে? তবু একবার যেয়ে দেখবে কাল। হয়তো পটলের সঙ্গে দেখা হতে পারে। এতদিনে তার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে সুযোগ কি হয়েছে! পাশ ফিরে ঘুমাতে চেষ্টা করে অহল্যা। কিন্তু ছটফট করে কেটে যায় সারাটারাত্রি।

সকালবেলা সত্যবন্ধুকে চা দিয়ে অহল্যা বলে, আজ পুষ্পর জন্মদিন। আমাকে নেমতন্ন করেছে।

কিছু দিতে চাচ্ছ বুঝি? তা দাও, কি তোমার ইচ্ছে?

একখানা শাড়ি দিলে মন্দ হয় না! বেশ দেখতে হবে ওকে। টাকা দশেকের ভিতর কি হবে না? আমার পাওনা থেকে কেটে নেবেন।

সে হিসেব আমাকে শেখাতে হবে না। এতকাল ধরে মড়ার পর্যন্ত মাসহরা কেটে কেটে কি কিছু শিখিনি! এখন প্রশ্ন তুমি যাবে, না আমি যাব দোকানে?

আপনি যদি যান তবেই ভালো হয়। এখন মেঘ বৃষ্টি নেই, সকালবেলাই

কাজটা সেরে আসুন। দু-টাকা বেশি গেলেও একটু ভালো জিনিস আনবেন—আপনি হয়তো বুঝেছেন তবু একবার বললাম। আর ফেরার পথে দুটো ফুলদানী। ফুল জোগান দেবে ওবাড়ির মালী—যে ইলাবৌদিকে নিত্য ফুল দেয়। মাসে গোটা দুয়েক টাকা দিলেই হবে। আমি কথাবার্তা বলেছি।

এ সব ঝামেলা বাড়াচ্ছ কেন। তুমি যখন দেশে চলে যাবে, ফুল শুকিয়ে থাকবে ফুলদানীতে—কেউ অদল বদলও করবে না।

যখন যাওয়া যাবে, তখন দেখা যাবে। আজই তো আমি যাচ্ছিনে। হয়তো কোনো দিনই আমার যাওয়া হবে না। আপনি মিছেমিছিই আজ ভেবে অস্থির হচ্ছেন।

তবে টাকা পয়সা দাও?

অহল্যা বাক্স খুলে মনি ব্যাগটা সত্যর হাতে দেয়। দিয়েই সে আড়ালে চলে যায়। তার বুকটা যেন অস্থির করছে।

জামা জুতো পরে সত্যবন্ধু বেরিয়ে যায়। একটু বাদেই কি যেন ভেবে ঘুরে আসে।

অহল্যা কাজে হাত দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে, ওকি ফিরে এলেন যে?

ভাবছি আর কারুর নয় পুষ্পির জিনিস, ওকে সঙ্গে নিয়ে তোমারই যাওয়া ভালো। আকাশ পরিষ্কার আছে, কোনো অসুবিধা হবে না। তুমি ওকে ডেকে আনো। ওর মা আপত্তি তুললে আমার কথা বলো।

অহল্যার আনন্দ হয়। মন্দ নয়, এই উপলক্ষে একটু বেরিয়ে আসা যাবে। কিন্তু সে পুষ্পিদের ঘরে গিয়ে আমতা আমতা করে। ঠিক যা বলবে তা লজ্জায় গুছিয়ে বলতে পারে না। একজনকে উপহার দেওয়া অতিরিক্ত কিছু নয়। এ সব অনুষ্ঠানে মানুষ হামেশাই দিয়ে থাকে। কিন্তু এক ঘরের ঝি দিচ্ছে এবং দিতে যা চাচ্ছে তা বেশ দামী জিনিস—এ অতিরিক্ত বই কি। আবার তা কি করে প্রকাশ করবে আগে-ভাগে? অহল্যা সব গুলিয়ে ফেলে। ফলে পুষ্পির মা একেবারে না বলে দেয়, তবে মিষ্টি মুখে। অহল্যা আহত হয়ে ঘুরে আসে।

তুমি তো পারলে না, এবার আমি যাই। এ বাবুকে শাসন করা নয়, একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে হয়।

আমি কি কেবল আপনাকে শাসন করি? তা হলে আর কিছু বলব না।

না, না বলবে বই কি! সেই জন্যই তো তোমায় রাখা।—সত্যবন্ধু পূর্ণ উদ্যমে হাসতে থাকে।

ও ঘরে ফুলদির হাতের পুজোর কোশাকুশি কাঁপতে থাকে। বেশ একটু সময় যায় তাঁর আবার পুজায় মন বসাতে।

পুষ্পির মার কাছে গিয়ে সত্যবন্ধু বলে, ওকে একটু ছেড়ে দিতে হবে মাসী মা।

বলো, কি দরকার ?

অহল্যা একখানা শাড়ি কিনবে, ওর সঙ্গে যাবে।

ত যাবে যাক। অহল্যা একটু বুঝিয়ে বললেই হত, আমি কি নিষেধ করতাম! হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলো। একার পক্ষে আজকার ঝামেলা সামলান দায়।

পুষ্পির ফ্রকটা পুরান হলেও বেশ ফিটফাট। অহল্যাকেও একটু ছিমছাম পরিষ্কার হয়ে নিতে বলে। সত্যবন্ধুকে দরজার বাইরে একটা টুলে বসিয়ে রেখে পুষ্পি খিল এঁটে দেয়।—কিছু মনে করবেন না সত্যদা—নমস্কার।

সত্যবন্ধু নির্বিকার চিত্তে বসে থাকে।

শুধু ফিসফাস খিলখিল শব্দ। পাউডার আর স্নোর গন্ধ। অহল্যা বিরক্ত হচ্ছে—পুষ্পি নিশ্চয়ই তাকে জ্বালাচ্ছে। অনেকক্ষণ কেটে যায়। ওদের বার হওয়ার নাম নেই। এবার নির্বিকার মানুষটাও একটু বিরক্ত হয়।

কি তোমাদের হল ? বেরুতেই যদি দুপুর হয়, ফিরতে নিশ্চয় সন্ধ্যা।

হবে কি, অহল্যাদি কাঁদছে—তার গোঁফ জোড়া নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। —দড়াম করে দরজাটা খোলে পুষ্পি।—সে দিন তো অনেক কিছু আনলেন, কিন্তু এক জোড়া স্যাণ্ডেল না হলে বেরুয় কি করে বলুন তো ?

সত্যি ভুল হয়ে গেছে—এখন কি আমার সু-জোড়ায় চলবে ?

পুষ্পি ছুটে কালো বৌর ঘরে যায়। অল্পের মধ্যে তাকে বুঝিয়ে বলে সব। দুঃখ করে সত্যদার বুদ্ধিটা ভোঁতা বলে। ব্যাঙ্গালোরের শাড়ি এনেছেন কিন্তু সাড়ে তিন টাকার স্যাণ্ডেলের কথা মনে নেই।

কালো বৌ তার স্যাণ্ডেল জোড়া খালি কয়লার ড্রামটার ভিতর থেকে বার করে। পুষ্পি এক ফালি নেকরা দিয়ে মেজে ঘষে দেখে একটা দোয়াল ছেঁড়া।

এখন উপায় কি কালো বৌদি ? তুমি একটু উদ্ধার করে দাও।

দাঁড়া দেখছি।—কালো বৌ মীরার ঘরে ঢোকে জলন্ত উনানটা পুম্পির পাহারায় রেখে।—দেখিস সাবধান কিন্তু। এগুলো মানুষ নয়, হনুমান।

একটু বাঁকা হাসি। একটু চুপি চুপি কথা। কিছু সময় বাদে কালোবৌ ধাব করে এনে. ধার দেয় মীরাব স্যাঁণ্ডেল জোড়া।—অহল্যা আর তার বাবুকে বলিস শুধু আসল শুধলে হবে না, সুদ লাগবে ডবল। মীরাবৌ কিন্তু কিস্তিওয়ালার বাবা।

আচ্ছা পাবে। এ সব বিষয় ওঁরা দুজনেই দিল-দরিয়া।

অহল্যা ও পুম্পি যখন বেবিয়ে যাবে, পুম্পি বলে, আর এক মিনিট সত্যদা। আমি আসছি এক্ষুনি। ততক্ষণে যা দেবার তা ঠিক করে রাখুন। অহল্যাদিকে বুঝিয়ে দিন।

সত্যবন্ধু এবার সুযোগ পায়। সে বিস্মিত চোখে চেয়ে থাকে। রঙে শাড়ির ঝলকে এমন ক জনাকে মানায়? সে অহল্যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নেয় একটি বাব। স্বাস্থ্য যে কত বড সম্পদ তা এমন করে নজরে পড়েনি সত্যবন্ধুর। অনেক মেয়েকে সে বকমারী সজ্জায় দেখেছে, কিন্তু আজ তারা ফিকে হয়ে যায় একেবারে। সে বোঝে শুধু শাড়ির জৌলুসেই নারী হওয়া যায় না।

অহল্যা সঙ্কুচিত হয়ে আছে। একটা সলজ্জ ছায়া লুটাচ্ছে পায়েব কাছে তার।

বিস্ময় কেটে গেলে সত্য চেয়ে দেখে কি যেন খালি খালি ঠেকছে। পুম্পি একটা ভ্যানিটি ব্যাগ এনে অহল্যার হাতে ঝুলিয়ে দেয়।—গতবার আমাব এক দূব সম্পর্কেব মাসতুতো ভাই দিয়েছিল, কোনো কাজে লাগেনি। তুমি বৌনি করে দাও ভাই।

এবার একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে অহল্যা। তাকে নিয়ে একি মহাপর্ব জুড়ে দিয়েছে এই মেয়েটা। তার মনে হয় সব ঘরেব চোখগুলো যেন এই একখানা ঘবের দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে। সে অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। সে জীবনে এর চেয়েও অনেক জাঁকজমকে সেজেছে দু একবার, কিন্তু এমনটি তো হয়নি। সে ব্যাগটা সজোরে খুলে পুম্পির দিকে ঠেলে দেয়।

এতক্ষণ চিন্তা করছিল সত্যবন্ধু। সে বলে, ভালোবেসে দিয়েছে, নাও। টাকাপয়সাগুলো ওর মধ্যে পুরে রাখো। সহরে এসেছ, সহরেই যখন থাকবে,

তখন এদের মতই চলতে ফিরতে অভ্যাস কর। কি যে হবে, কি যে হবে না—ভবিষ্যত তো আমাদের হাতের মুঠোয় নেই।

পুম্পির হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে অহল্যা মাথা নুইয়ে পুম্পিকে অনুসরণ করে।

দূর থেকে মন্দ দেখায় না। কিন্তু পটুয়ার মন নিয়ে সত্যবন্ধু ভাবে, এখনো দেবী প্রতিমা সজ্জার কি যেন বাকি আছে।

ওরা বেরিয়ে গেলে এ-ঘরে ও-ঘরে, পার্টিশানের এপাশে ওপাশে যেন ট্রাঙ্ক কলে হাসি ঠাট্টা চলে। চোখ ঠাহরাঠাহরি হয় ঝিদের মধ্যে। সত্যবন্ধু একটু বুঝলেও বইতে মন বসায়। ফুলদি তো রয়েছেন ইষ্ট চিন্তায়। কিন্তু বাড়িটা যেন কাঁপে।

কিছু দূর এগিয়ে পুম্পি বলে, অমন ভূতের মতন চললে হবে না। তুমি তোমার পাড়া গেঁয়ে স্বোয়ামীর সঙ্গে যাচ্ছ না। আমার মত পা চালিয়ে এসো।

অহল্যা চেষ্টা করেও বারবার পিছিয়ে পিছিয়ে পড়ে। যতটুকু সময় লাগা উচিত তার দুনো সময় কেটে যায় বড় রাস্তায় আসতে। এখনো অনেকটা বাকি ট্রাম লাইন। তা বলে মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়—জোর সাত মিনিট। এটুকু পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতেই পুম্পি অভ্যস্ত। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগটার দিকে চেয়ে ধূ ধূ মনে হয়। আষাঢ়ের ছায়া ছায়া রোদেও চোখ জ্বালা করে।

আর স্যাণ্ডেল ঠ্যাঙ্গাতে ভালো লাগে না—একটা রিক্সা করু না অহল্যাদি!

কত লাগবে?

জানিনে ঠিক—এই তিন চার আনা।

বাবু যদি হিসেব চান?

চাইবেন না। আর একান্ত চাইলে আমি আছি।

খুচরা কোথায় পাব?

খুলে দেখো, বাবু শুধু নোট দেননি। ওর ভিতর রেজগি আছে।

চারদিকে তাকিয়ে একটা রিক্সা ডেকে দু জনে উঠে বসে। হেলায় দোলায় পুম্পি হেসে খুন।

একি, পথে ঘাটে লোকে বলবে কি?

এটা তোমার শ্বশুর বাড়ি নয়। কলকাতা সহরে—তোমার আমার দিকে কেউ চোখ পাকিয়ে বসে নেই। কুনো হয়ে চললেই সে ভয়। এখানে একটু বেপরোয়া হয়েই চলতে হয়।

গন্তব্যে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই কথাটা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তা যাচাই করে নেয় অহল্যা।

কন্‌ডাক্টর হাঁকে, কালিঘাট! কালিঘাট!

অহল্যার বুকটা একেবারে তোলপাড় করে ওঠে।

এই জেনানা, রোক্‌কে ভাই—হুঁশিয়ার!

অহল্যা নেমেই দেখে এর চারপাশ তার পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, একটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতি রয়েছে যেন তাকে জড়িয়ে। প্রথমই মনে পড়ে পটলের মুখখানা। অবশেষে লতু সুকুমারী খুশি অন্ধখঞ্জও কেউ বাদ যায় না। নিজের মলিন চেহারাখানাও স্পষ্ট ফুটে ওঠে। আজ আর সেদিন অনেক অনেক ব্যবধান, তবু একটা গাঢ় গভীর ছায়া ফেলে তার বুকে। নিজেকে একটু অপরাধী বলে মনে হয়। কারুর সঙ্গে দেখা হলে সে কি জবাব দিহি করবে? সকলেরই তো স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তার প্রয়োজন—প্রয়োজন প্রায়-বিবস্ত্র মানুষের বস্ত্রের। অহল্যা একা পেল কি অধিকারে? না, সে কারুর সঙ্গেই দেখা করবে না। অহল্যা মাথা নুঁইয়ে চলে।

পুষ্পি বলে, আবার তোমায় ভূতে ধরল নাকি? গাড়ি চাপা পড়বে।

অহল্যা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এক সঙ্গে অন্ধ খঞ্জ আতুরের পাল তাকে এসে যেন ঘিরে ধরে। মনে পড়ে সেই শান বাঁধান আস্তানাটার কথা। পটলের পথ চেয়ে সে এক অসহায় রাত কেটেছে! জীবনে বার বার ঠিকানা বদল!

তুমি নির্ঘাত মোটর চাপা পড়বে! আঃ! ওঝাটাকে সঙ্গে আনা ভালো ছিল।

স্বপ্ন ভেঙে যেন অহল্যা জোর জোর পা চালাতে থাকে।

পুষ্পি হেসে মন্তব্য করে, যেমন ভূত-প্রেত আছে, তেমনি ওঝাও আছে—এ আর বিশ্বাস না করে উপায় নেই। নাম করা মাত্র সব ঠিক। বলো এখন কোন দোকানে যাবে?

তুমিই ঠিক কর।

ভালো ঝামেলায় ফেললে যা হক।

একখানা দোকানে উঠে ওরা শাড়ি চায়। বেশ ভিড় জমেছে। কর্মচারীরা ব্যস্ত।

কেমন শাড়ি? বসুন আপনারা। ও ভাবে ব্যাগটা কাউন্টারে রাখবেন না।

অহল্যা সাবধান করে হাতের সঙ্গে জড়ায় ভ্যানিটি ব্যাগটা। মাঝারি গোছের একখানা শাড়ি দিন।

এক থাক শাড়ি আসে। খোল তেমন কিছু নয়, উজ্জ্বল শুধু পাড়।—এর চেয়ে একটু ভালো চাই।

চ নম্বর বাণ্ডিলটা দিন তো—ধনেখালির।

আবার এক বাণ্ডিল শাড়ি আসে। এবার খোল ও পাড় দু-ই পছন্দ হয় অহল্যার। সে বলে, কোনখানা নেবে ভাই?

বাঃ রে আমি কি বলব? তোমার যেখানা খুশি।

তবে সঙ্গে আনলাম কেন? এ শাড়িখানা তোমায় আমি দেব।

তাই নাকি? তবে তাঁতে হবে না, বেনারসী চাই।

ভগবান করুন তা যেন বিয়ের সময় দিতে পারি।

ওরা শুধু একখানা শাড়ি নয়, ব্লাউজও কেনে একটা পছন্দ সই। পুষ্পির মনটা ভরে ওঠে। আর দেরী করতে ভালো লাগে না।—এখন তাড়াতাড়ি চলো অহল্যাদি।

কিন্তু সুদ না নিয়ে কি বাড়ি ঢোকা যাবে?

পুষ্পি বলে, বুঝলাম না।

স্যাণ্ডেলের সুদ গো—সেই যে রিক্সায় বসে বললে। ভাবছি কয়েকটা পুতুল কিনে নেব ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে। মা'র বাড়ির ঐদিকেই যেতে হবে। এদিকটায় তেমন মনোহারী দোকান নেই। এসো, কতটুকুই বা দেরি হবে!

তবে চলো। তোমার কিন্তু অহল্যাদি সবই বেশি। আজ পুতুল না নিলে কি হত?

আবার কবে আসব কালিঘাট, আজই নেওয়া ভালো।

রান্নাবান্না কখন হবে? বেলার দিকে চেয়ে দেখেছ? সত্যদা কি বলবেন? আমায় মাকে তো তুমি চেনই।

তবু যেতে হবে পুষ্প। পুতুল কটা নিতেই হবে।

এ অদ্ভুত অনমনীয় ভাব পুষ্পর ভালো লাগে না। বাপ্ রে কি দরদ। সে অনিচ্ছায় অহল্যার সঙ্গে চলে। বাড়ি ফিরে তার কৈফিয়ৎ দিতে প্রাণ যাবে।

অমন করে হাঁটছ যে, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি? এসো না কিছু কিনে নিই।

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। পুষ্প আর কোনো আপত্তি তোলে না। ওকে নিয়ে অহল্যা একটা ময়রার দোকানে ঢুকে পড়ে।—বসো। কি খাবে?

তোমার যা খুশি।

পরার বেলায় যা খাটে, খাওয়ার বেলা তা খাটে না। তুমিই বল।

না—আমি তা বলব না। তুমিও তো খাবে।

চেয়ার, টেবিল, লাইট, ফ্যান দেখে অহল্যার আবার মনে পড়ে পটলের কথা। বর্ষার আকাশের মত তার বুকটা থমথমে হয়ে ওঠে। শাড়ির দোকান থেকে নেমেই তার মনটা আবার বাঁক ঘুরে উজানে ছুটেছে। পটলের সঙ্গে সে দেখা না করে কিছুতেই বাড়ি ফিরতে পারে না। এবার সে ইলিশ মাছের মত ছুটতে চায়। এমন একটা ভালো দোকানে বসেও সে বিস্মৃত হতে পারে না সেই ভাঙা রেঁস্তোরাটার কথা। পটল তার হাতে খড়ি দিয়েছিল। সেদিন যে কি ক্ষিধে পেয়েছিল দুজনার।

দুখানা হিংয়ের কচুরী আর একটা বড় রসগোল্লা দাও, এই বয়—শীগ্‌গির।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাবারগুলো পরিবেশন করে যায় বয়।

নাও, খাও।—অহল্যা বলে, তাড়াতাড়ি করো না। একটু দেরী তো হবেই আজ।

তুমিও এসো।

আমি খাব না। ভাবছি মা'র বাড়ি পর্যন্ত যখন যাব, তখন দুখানা ডালা দিয়ে আসব। নিত্য তো আসা সম্ভব নয়।

আজ তোমার রান্নার কি করবে?

যেয়ে ভাতে ভাত চড়িয়ে দেব, জ্বলন্ত উনান—কতক্ষণ আর লাগবে! তোমার সত্যদা জানেন মেয়েরা কেনা-কাটায় বেরুলে একটু ধৈর্য ধরেই থাকতে হয়।

পুষ্পি মুখ মচকে হাসে একটু। বলে, যা বলেছ! দাদাটি যেন ধৈর্যের পাহাড়!

ও কথার আর কোনো জবাব না দিয়ে অহল্যা বলে, আজ ফেরার মুখে মনে করে ভাই দুটো ফুলদানী নিয়ে যাব। সব বিষয়ে একটু আলস্য, নইলে ফুলের গন্ধ ভালোই বাসেন তোমার দাদাটি।

সে কি তুমি আমাকে শেখাবে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে কালকের ঘটনাটা?

অহল্যা ঝলক দিয়ে ওঠে। কিছুই ভোলা যায় না। পুষ্পির দুষ্টুমির ধারই আলাদা। ও অনায়াসে মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে।

পঁচিশ

মা'র বাড়ি ঢুকে অহল্যা চারদিকে তাকায়। ছিন্ন বাস উসখো-খুসকো চুল অল্প বয়সী মেয়ে দেখলেই তার বুকটা ঢিব ঢিব করে ওঠে। এক মানুষের স্রোতের ভিতর সে যাকে খোঁজে তাকে পায় না। তবু অহল্যা সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

একজন অল্প বয়সী পাণ্ডা এসে বলে, আপনারা কি দর্শন করবেন?

অহল্যা বলে হ্যাঁ—ডালা দেব। তুমি কি ভিতরে যাবে পুষ্প?

পুষ্প বলে, রক্ষে কর। ও চাপ আমি সইতে পারব না। আমি বরঞ্চ এই নাট মন্দিরের পাশে দাঁড়াই। তুমি একটু শীগগির এসো।

পাণ্ডাঠাকুরটি বাঁকা চোখে পুষ্পর দিকে চেয়ে আশ্বাস দেয়, আমি থাকতে আপনার ভয় কি? চলুন না! আজ কার মহা যোগে মা'র বাড়ি এসে মাকে কি দর্শন না করে যাওয়া ভালো? একটা মঙ্গলামঙ্গল আছে তো!

তবু পুষ্প রাজি হয় না।

কিছু খুচরা বার করে নিয়ে পুষ্পর জিম্বায় ভ্যানিটি ব্যাগ ও স্যাণ্ডাল রেখে অহল্যা চলে যায়। পুষ্প নিবদ্ধ পলতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। একা একা তার ভালো লাগে না। কত ভালো মন্দ লোক যে আছে এখানে! পাণ্ডাটির চাহনি চলন তাকে বড় অপ্রসন্ন করেছে।

ভিতরে ঢুকে অহল্যা মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ করে স্বামীর মায়ের এবং সত্যবন্ধুর মঙ্গল কামনা করে। তারপর পুষ্পির এবং পটলের। মীবা বৌও কালোবৌর কথাও সে ভোলে না। সে বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কত আকাঙ্ক্ষা যে তার মনে দোলা দিয়ে যায়!

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন না—অন্য যাত্রীদের অসুবিধা হচ্ছে।

অহল্যা গদগদ চিত্তে বেরিয়ে আসে। সে তুষ্ট করে দেয় পাণ্ডাটিকে। এবার তার মনে হয় একটি বার ঘুরে দেখলে হয় চারপাশের রাস্তা। পটলকে পেলে অনাথ দাসেরও একটা খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। নইলে কালিঘাট বাজারে ঠিকানা বার করা তার পক্ষে এক রকম অসম্ভব। দেরী হয়েছে যখন, আজই একটা হেস্ত-নেস্ত করে যাওয়া ভালো।

বেশ খানিকটা খুঁজেও সে পটল কেন কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে পারে না।

অহল্যা মুখ চুন করে পুষ্পর কাছে ফেরে।

ভালো বেসাতি করতে এনেছ, আজ আর বাড়ি ওঠা যাবে না। এখন তাড়াতাড়ি চলো। অহল্যাদি কি যে হবে!

সেদিন ফুলদানী ও পুতুল কেনা হয় না। ওরা প্রাণপণে হেঁটে বাস ধরে।

বেলা প্রায় একটা। বাসখানা প্রায় খালি। প্যাসেঞ্জারের আশায় গতি মন্থর। এ-ও পুষ্পির এখন অসহ্য। নিজের হাতে ঠেলতে পারলেও যেন রাজী। বারবার সে চোখ দিয়ে পথ মাপে। এতক্ষণে মাত্র রাসবিহারী এ্যাভিনিউ ছাড়াল। একখানা ট্রাম পাশ দিয়ে চলে যায়। একটু দেরী করে ওটায় যদি উঠত! আগে কি করে বুঝবে? সে বাস-ওয়ালাদের ওপর রাগে ফুলতে থাকে।

অহল্যা কেন যেন কতকটা নির্ভয়। সে কেন যেন কোনো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে না।

আমি কোনো রকমে বেঁচে গেলেও, তোমার রক্ষা নেই।

মেরে ফেলবে? ফেলুক—আমার কোনো আপত্তি নেই।

অহল্যার গলার স্বরে রাগটা পড়ে যায় পুষ্পির। একটু চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় গিয়েছিলে অহল্যাদি, এত দেরী হল যে?

অহল্যা নীরব হয়েই বাইরে দিকে চেয়ে থাকে। একটু আগে রুষ্ট হওয়ার জন্য পুষ্পির বুকটা টাটায়। কি যেন একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে। তার প্রাণটা ছটফট করতে থাকে কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মত এখন আর পরিবেশ নয়।

বাড়ির কাছে এসে ওদের যেন আর পা চলে না। ভিতরে ঢুকে পুষ্প অহল্যাকে অসহায় রেখে এক ছুট। তার মা গর্জে ওঠার মুখেই সে বলে, চুপ!

হকচকিয়ে গিয়ে তার মা প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে রে? এত দেরী হল যে

ফিরতে? অহল্যার বুঝি খোঁজ নেই? আমরা আগেই জানতাম, ফুলদির জন্যই কিছু বলিনি। দুধ দিয়ে সাপ পোষা যায় না। এখন বেচারি সত্যর কি হবে?

এতক্ষণ বুঝি তোমরা এই নিয়ে ঘোঁট পাকিয়েছ? যাও, গিয়ে দেখে এসো অহল্যাদি বোধ হয় এত সময় ভাত চড়িয়েছে।

তা হলে এত দেরী হল যে?

দেরী হলেই মানুষ আর নিখোঁজ হয় না। কি যে তোমাদের ছোট মন! একখানা ভাল জিনিস কিনতে হলে একটু ঘুরে ফিরে দর যাচাই করে কিনতে হয়! নিজের মেয়েকে তো পাল-পার্বণেও একখানা ভাল শাড়ি কিনে দাওনি। অথচ অহল্যাদি পরের ঝিয়ারী করে আজ আমাকে তা দিচ্ছে।

বলিস কি তোর জন্য শাড়ি এনেছে অহল্যা! মানদা কুন্দঝি যতই বলুক, আমি জানতাম অহল্যা খাঁটি মেয়ে।

মায়ের এই আকস্মিক পরিবর্তনে কেন যেন তেমন খুশি হতে পারে না পুষ্প। স্রোতের গতির সঙ্গে যে ভাসে তার আর যা-ই হোক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু থাকে না। সে সন্তানের কাছেও তেমন শ্রদ্ধা পায় না। এই কটা মাস পুষ্পি অহল্যাব সঙ্গে মিশে, দুঃখ বেদনা অন্তরদ্বন্দ্বের সমভাগিনী হয়ে জগতটাকে যেন ভিন্ন চোখে দেখতে শিখেছে। সময় সময় নিজেকেও মনে হয় বঞ্চিত। পুষ্পি আর সে পুষ্পি নেই। অনেকখানি সজাগ হয়েছে।

অহল্যা স্যাণ্ডাল খুলে পা ধুয়ে বারান্দায় ওঠে। একেবারে অনাসৃষ্টি কাণ্ড! জ্বলন্ত উনানটা নেবান। মনে হয় গায়ের জ্বালায় কে যেন জল ঢেলে দিয়েছে। ভাতের হাড়িটা ছিটকে পড়ে রয়েছে ওপাশে। ফেনে ভাতে একশা।

সে তাড়াতাড়ি শাড়ি বদলে রাগের মাস্থল দিতে বসে। এ বাবুর কীর্তি, না ফুলদির নৈপুণ্য সে সঠিক কিছু বুঝতে পারে না। তার দেরী দেখে নিশ্চয়ই কেউ যোগ্যতা দেখাতে এসেছিলেন! যাক মন্দ হয়নি। একটু ছড়ান-বড়ান হলেও ভাতে ভাতের কাজটা সাঙ্গ হয়ে রয়েছে। এত বেলায় এ উপকারী বান্ধবকে তার ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা করে। কারণ আর কারুর তেমন ক্ষিধে না পেলেও অহল্যার পেটে স্যুঁচ ফোটাচ্ছে।

কে?

আমি অহল্যা।

এসেছ—যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।—সত্যবন্ধু বলে, একটু নুন জল দাও তো। নুন একটু বেশি করেই দিও।

কেন ?

মনে হচ্ছে হাতটা পুড়ে গেছে।

অহল্যার ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচে যায়। তার জন্যই এত বড় একটা কেলেঙ্কারী! সে তুন জলের ব্যবস্থা না করে তেলের শিশিটা নিয়ে এগিয়ে আসে। ধন্য মানুষ! কখন হাত পুড়েছে, এখনো বসে আছে অহল্যার আশায়। সে গিয়ে ভালো করে কতকটা তেল বুলিয়ে দেয় অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

আমি যদি না ফিরতাম ?

তখন ভেবে চিন্তে একটা কিছু করা যেত। হাতের ফোস্কায় আর মারা যেতাম না। শাড়ি এনেছ ? কেমন হয়েছে ? দেখি প্যাকেটটা ?

পরে দেখবেন। দেখার ঢের সময় আছে। এখন হাতটার আগে একটা ব্যবস্থা করুন। নিশ্চয় খুব জ্বালা করছে ? আনাড়ী মানুষ কেন গেলেন উনানের কাছে ?

ভাবলাম ভাতে ভাতটা রেঁধে রাখলে তোমার সুবিধা হবে।

এখন দেখলেন তো ফল হল উলটো।

দেখলাম, শিখলাম, বুঝলাম তার চেয়েও বেশি। এখন তুমি শাড়িখানা আনো তো ? মনে রেখো আর কোথায়ও গেলে ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। তুমি এ বাড়ির তোলা মানুষ নও।

অহল্যা সব জানে। সেও সেই মন নিয়েই এখানে এ-কটা মাস কাটিয়েছে। কিন্তু আজ অনিবার্য কারণেই হয়ে গেছে বিলম্ব। সময় মত সে সমস্তই সবিনয়ে জানাবে।

সংসারের বাকি কাজগুলো গুছিয়ে অহল্যা স্নান সেরে আসে সংক্ষেপে। সংক্ষেপেই চুলগুলো আঁচড়ে নেয়। শাড়ির অর্ধেক আঁচলটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে ভাত নিয়ে আসে।

কোথায় বসে খাবেন ?

ছোট্ট টেবিলটা টেনে দাও। ঐটা—ফটো দুখানা নামিয়ে রাখো।

কিন্তু টেবিলটার দিকে চেয়ে দুজনেই লজ্জিত হয়। এ কাণ্ড করলে কে ? সত্য, না অহল্যা ? ফটো দুখানা পাশাপাশি সাজান। উপস্থিত থাকলে মিঃ ডাস নিশ্চয়ই একটা মন্তব্য করতেন। কারণ তাঁর হাতেরই তোলা এ ছবি। ইংরেজী বিশেষণ প্রয়োগে তো তিনি পারঙ্গম !

অহল্যা আলাদা আলাদা জায়গায় ফটো দুখানাকে সরিয়ে রাখে। তবু যেন

এ ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। থাক—অহল্যা এত শীগ্‌গির আর কোথায় সরাবে? ভাত জল পরিবেশ করতে করতে সে ভাবে, এতক্ষণ তো সে ঘরে ছিল না। এ কাজটা করলে কে? এত আলস্য যে বাবুর, তিনি কি উঠে টেবিলটা গুছিয়েছেন? না, অহল্যারই অসতর্কতার এ পরিণাম? সে মনে মনে লজ্জা পায় দারুণ?

কি করে খাবেন? কেউই তো খায়িয়ে দেওয়ার নেই? পুষ্পকে কি ডাকব?

তেমন কিছু হয়নি। একটা চামচ দাও, নিজেই পারব?

অহল্যা বলে, এই নিন। সেই ভাল—হাঁটি হাঁটি পা পা···

সত্যবন্ধু স্মিত মুখে অহল্যার দিকে তাকায়। অহল্যার সমস্ত হৃদয় যেন পূর্ণ হয়ে যায় নিমেষে।

খাওয়া শেষ হলে সত্যবন্ধুর হাতে একটি পান দিয়ে অহল্যা দাঁড়িয়ে থাকে। —দেখুন তো শাড়িখানা।

জমিন এবং রং দু-ই চমৎকার হয়েছে। একটা ব্লাউজও কিনেছ বুঝি? সায়া আনলে না?

আমার বাড়তি একটা রয়েছে। একেবারে নতুন, তোলা। একটু ছোট মাপ, ওর ঠিক হবে।

বেশ, বেশ। তা হলে আর ত্রুটি নেই। কখন যাচ্ছ?

যখন ডাকবে। বোধ হয় সন্ধ্যে বেলা।

এখন খেতে যাও।

যাচ্ছি, বলেও দাঁড়িয়ে থাকে অহল্যা।

কিছু বলবে নাকি?

একটু মা-কালীবাড়ির আশীর্বাদ এনেছিলাম। এতক্ষণ ভুল হয়ে গিয়েছিল দিতে। এখন কি দেব?

তোমার ইচ্ছা হলে প্রসাদ এবং নির্মাল্য আমার মাথায় ছুঁইয়ে দাও। এখন আর মুখে দেব না প্রসাদ। পানটা ফেলতে ইচ্ছা করছে না।

আপনি কি দেব দেবীতে বিশ্বাস করেন না? না করলে থাক। শুধু মাথায় ঠেকিয়ে কি হবে?—অহল্যা ক্ষুব্ধ অন্তরে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর যে প্রসংগে সে যাবে ভেবেছিল, তা চাপা পড়ে যায়।

সত্যবন্ধু বলে, তোমার প্রশ্ন বড় শক্ত। এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন। আমি কিছুতে বিশ্বাস করি কি না করি—তোমার শুভ বুদ্ধিতে অবিশ্বাস করার

কিছু হেতু নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে আশীর্বাদ ও প্রসাদ আমায় দিতে পার। এরপর তোমার বলার কিছু নেই।

অহল্যা যা করার তা একান্ত অন্তকরণে করে চলে যায়। কিন্তু বাকি থেকে যায় আজকার বিলম্বের কাহিনীটা বলতে। এটা ঠিক ভুল নয়। কেমন যেন তাল কেটে গেছে একটা পয়ারের।

সেদিন সন্ধ্যার পর অহল্যার অজ্ঞাতে আবার সাইক্লোন ওঠে। এবং কয়েকটা দিন বেশ জোর চলে। পুষ্পির শাড়িখানার রঙে জমিনে সেকি যে সে জ্বালা!

অনেকদিন ফুলদি এ ঘরে পা দেন নি। সত্যবন্ধুর তা লক্ষ্য এড়ায় নি। পর্দা নিয়ে সেই যে তুচ্ছ একটা মন কষাকষি করে তিনি চলে গেলেন, আর তাঁর এমুখো আসা হয়নি। সত্যও বেশ বিরক্ত হয়েছিল, সেই জন্যই ইচ্ছা থাকলেও সে সংযত হয়ে রয়েছে। সাধাসাধি করে সে আর নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করেনি। যেখানে ঠোকাঠুকি অনিবার্য তাকে প্রশ্রয় না দেওয়াই মঙ্গল।

সে শুনেছে যে ফুলপিসী এখন নাকি পূজা-আচ্ছায় মগ্ন। হঠাৎ এ পরিবর্তন বাইরের থেকে সুন্দর দেখালেও সত্যবন্ধুর কেন যেন মনে হয় ভিতরে জ্বলছে এক সর্বধ্বংসী দাবানল। কে হাত দিতে যায় ইচ্ছা করে? তাই ফুলদির কথা চাপা পড়ে গেছে এ ঘরে।

কিন্তু বেড়েছে অহল্যার কাহিনী। লজ্জা সংকোচের চৌকাঠ পেরিয়ে যেন লতিয়ে এসেছে বুকের কাছে। বাধা নেই, তাই যেন বেড়ে চলেছে প্রচুর প্রাণ রসে।

শাড়িখানা পরে পুষ্পি যখনই কোথাও বেড়াতে যায়, এসে দাঁড়ায় সত্যবন্ধুর জানালার পাশটিতে। ঘন ঘন চোখের পালক ফেলে আর হাসে ফিকফিকিয়ে।

আজকাল মিঃ ডাসকে দেখছিনে যে?—সত্য প্রশ্ন করে।

কি জানি খেয়ালী মানুষ হয়ত এ বাড়ির কথা ভুলেই গেলেন। আছেন যত বাজে তিল-হিলের গল্প নিয়ে।

একটা খবর দিতে পার আসতে?

কেন?

তোমার একখানা ফটো তুলে 'রূপ শিখায়' ছাপিয়ে দিতে বলতাম। এখন তোমার পুরো পোড়াবার ক্ষমতা হয়েছে।

অহল্যাদির চাইতেও? হাতে যে এখনো দাগ রয়েছে। বলতে লজ্জা করে না।

পুষ্পি চলে যায়। কিন্তু অগাধ চিন্তায় ফেলে যায় সত্যবন্ধুকে। সত্যি কি অহল্যাই তাকে পুড়িয়েছে—না অসাবধান হওয়ার জন্য সে-ই জ্বলেছে। কার দোষ? কে অপরাধী ঠিক কিছু স্থির করতে না পারলেও হাতখানা তো জখম হয়েছে! ইন্ধন, না আগুন দায়ী সে বিচার করে লাভ নেই। বুদ্ধিমানের সরে থাকাই ভালো। কিন্তু এ তো টাকা আনা পাই নয়। বুদ্ধির বৃত্ত এর নাগালে এলে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। হিসাব যায় ধুয়ে মুছে। তখন যেন শুধু জ্বলতেই ভালো লাগে। পতঙ্গ মনের একি অদ্ভুত আকর্ষণ! সত্যবন্ধু চুপ করে থাকে।

অহল্যা কাজ করে না তো যেন সত্যবন্ধুর সারা দেহ মনে ঝনক ঝনক ঘুঙুর বাজায়। কখনো মৃদু তালে, কখনো ঝড়ের কম্পনে। ওর বাসন-মাজা, ঘুরে ফিরে ঘরে আসা, চুল বাঁধা সবই যেন ছন্দময় নূপুরের বোল। ওর লাস্যে হাস্যে এক এক সময় উতরোল করে ছাড়ে।

সত্যবন্ধু কঠিন হয়ে বই মুখে দিয়ে থাকে। এভাবে কতদিন যে সে নিস্পৃহ থাকতে পারবে জানে না। তবু নতুন নতুন বই কেনে। অবশেষে একটা লাইব্রেরীর মেম্বার হয়।

কিছু দিন বাদে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হয়। মুখ চেনা রসিক লোক।

সমস্ত শুনে ডাক্তার বলেন, রোজ মাথা ধরলে চিন্তার কথা বই কি। কিছু মনে করবেন না, টেপার লোকও বোধ হয় এখনো ঘরে আসেনি? আমার মনে হচ্ছে পাওয়ার বদল হয়েছে। বসুন পরীক্ষা করে দেখছি।

সত্যবন্ধু গোবেচারীর মত একট চেয়ারে বসে পড়ে।

কয়েকখানা লেন্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি গোছাতে গোছাতে ডাক্তার বলেন, খুব নাটক নভেল পড়েন বুঝি—এই প্রেমের ফিক্‌সন্? কিছু দিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। আপনি যেমন ছুটি চান, তেমনি চায় আপনার চোখ। না পেলেই ক্ষেপে যাবে। বলুন খুব ন্যাচারেল কিনা? এই তো সায়েন্স। এইটুকু শিখেছি বলে, আমি ডক্টর আপনি পেসেন্ট। নইলে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই।

দেখতে দেখতে চেম্বার ভর্তি হয়ে যায়। ডাক্তারের মুখে আরো হাসি খোলে। মিনিট পনর বাদে সত্যবন্ধু নতুন চশমার বায়না দিয়ে বাসার দিকে ফেরে। পথে দোকান থেকে কি কি যেন কিনে নিয়ে যায়।

এসো অহল্যা, দেখ তোমার জন্য কি সব এনেছি।

অহল্যা ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে ফুলদানী দুটো ধরে।—কি যে মনের মত রঙ্! এ আপনি পেলেন কোথায়? সেদিন আমি না কিনে ভালোই করেছি। এমন জিনিস আমি আনতেই পারতাম না।

সত্যবন্ধু ভাবে, অহল্যার এ মিথ্যা আশঙ্কা—পয়সা হলে সবাই সব কিনতে পারে। কিন্তু আজকার ওর এ অভিনন্দন হাটে বন্দরে খরিদ করা যায় না। সত্যবন্ধুর মনটা কানায় কানায় ভরে ওঠে।

এই প্যাকেটটা খোলো।

ওতে কি?

খুলেই দেখো।

কতগুলি ইস্কুল পাঠ্য বই ও শাড়ি একখানা হাল ফ্যাসানের—ওয়াটার কলার।

যদি বইগুলো পড়তে পার, তবেই শাড়িখানা পাবে—আজ নয়। কি দুঃখ হল?

না।

নিচু ক্লাশের সহজ বই। কিশোর বয়সে সে এমন পাঠ পাঠশালায় নিয়েছে। একখানা খুলে অহল্যা গড়গড় করে পড়ে যায়। বাকিগুলো সে সারারাত ধরে শেষ করে। সকাল বেলা সত্যবন্ধু নিজেই উপযাচক হয়ে শাড়িখানা অহল্যার হাতে তুলে দেয়।—এমন পারলে গাড়ি বাড়ি গয়নাও তুমি পাবে।

সত্যবন্ধু ভাবে, এত যার অধ্যবসায়, তার পক্ষে একদিন অরুন্ধতীর মত কলেজে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। সত্যবন্ধু জানালা গলিয়ে সুদূর এক ফালি আকাশে চোখ ডুবিয়ে রাখে। অনেক দিন বাদে মনটা যেন উদাস হয়ে যায়। এদিকে অরুন্ধতী অহল্যার দেহে মনে যৌবনে মিশে যেতে থাকে।

ছাব্বিশ

বর্ষা শেষ। শরৎ এসেছে। ভারী জ'লো মেঘ লঘু হয়ে গেছে পেঁজাতুলোর মত। মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক দিচ্ছে। ভিজা উঠানটা খটখটে হয়েছে। একটা শিউলি গাছের তলায় ঝরে পড়েছে প্রচুর ফুল। ছেলেমেয়েরা কুড়াচ্ছে কলরব করে।

বারান্দায় বসে সত্যবন্ধু দেখছে বিমুগ্ধ চোখে।

মালী ফুল দিয়ে গেছে। অহল্যা ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তবু টাটকা শিউলিগুলো দেখতে ভালো লাগে। পেলে বুঝি আরো ভালো হয়। অহল্যা সত্যর হাতে এনে দেয় এক মুঠো।

একি ?

আপনি যা চাইছেন।

চেয়ে আর লাভ নেই, ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। এখন আবার জয়েন করতে হবে। কোথায় দেবে এই ভাবনা।

শরীর সুস্থ হয়েছে। কাজে জয়েন করায় দোষ নেই। আপনি তো বলেছিলেন চেষ্টা-চরিত্তির করে এখানেই থাকবেন—কলকাতা কোথাও।

তুমি দেখি ইংরেজি শিখেছ বেশ !

কতবার এ কথাটা শুনলাম তবু শিখব না ? শুনতে শুনতে কিনা-শেখা যায় !

আরো একটা কারণ ছিল এ শিক্ষার।—

যে কদিন চশমা ছিল না, সত্যবন্ধু মুখে মুখে অহল্যাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে।

ইতিহাস কাকে বলে জানো ?

ইতিহাস ! না তো।

সে এক দুঃস্বপ্নের কাহিনী।

অহল্যা ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করে, তবে বলে কাজ নেই।

কিন্তু নিজেকে জানতে হলে ইতিহাসকেও জানতে হবে। দুঃস্বপ্নের ভয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। অহল্যা বুঝতে না পারলেও সত্যবন্ধু বলে যায় রবীন্দ্রনাথের কথার সারাংশ উদ্ধৃত করে, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস পড়ি, তা নিশীথ কালের একটা দুঃস্বপ্নের কাহিনী মাত্র। বাপে ছেলেয় ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি হানাহানি। মোগল পাঠান পর্তুগীজ ইংরেজ সকলে মিলে এই দুঃস্বপ্নকে ক্রমে ক্রমে জটিল করে তুলেছে। যা বললাম তুমি হয়ত এসব কিছুই ধরতে পারনি। সোজা কথায় তোমার ইতিহাস হচ্ছে তোমার বাপ মা ঘর সংসারের বিগত কাহিনী। তেমনি একটা কাহিনী আছে ভারতবর্ষের। সে কাহিনী হওয়া উচিত ছিল সাধারণ মানুষের কৃষ্টি সভ্যতার উত্থান পতন নিয়ে। কিন্তু লেখা হয়েছে অন্ধকারের, দুঃস্বপ্নের, ঝড়ের।

অহল্যা শিউরে ওঠে। সে ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত জানে না, কিছুই বুঝতে পারেনি সত্যবন্ধুর কথায়—কিন্তু মনে পড়ে প্রলয়ংকর ঝড়ের তাণ্ডব। যেন ঝাপটা এসে লাগে হুহু হাওয়ার, কানে বাজে কল্লোল। এই যদি ইতিহাস হয়, তবে সে শুনতে চায় না।

বাবু অন্য কথা বলুন।

তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না নিশ্চয়। আমারই ভুল হয়েছে, প্রথমই তোমার কাছে রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনা। উত্তেজনা গ্লানিতে বলে ফেলে দিয়েছি। ইতিহাস শেখার আগে, তুমি খানিকটা ভূগোল শিখে নাও। ছোটবেলা কি ভূগোল পড়েছ ?

না বাবু। আমার বিদ্যা খুব সামান্যই।

সত্যবন্ধু হেসে ওঠে—কিন্তু এ সব তো গোড়া থেকেই শিখতে হবে।

অহল্যা সত্যবন্ধুর দিকে সব্রীড় কটাক্ষে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, এরপর ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাশে ভর্তি হতে হবে নাকি ? ভালো জ্বালা হল দেখি ?

তুমি যদি জ্বালা মনে কর, তবে পড়াশুনা থাক। তোমায় কোনো ইস্কুলে পাঠাবার ইচ্ছা নেই আমার। ভাবছিলাম নিজেই পড়াব।

অহল্যার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন, আবার এ দুর্ভোগ কেন? শিশুকাল থেকে যা প্রাণ ঢেলে শিখেছে, তা কি কোনো কাজে লাগল?

অহল্যাকে চুপ করে থাকতে দেখে, সত্যবন্ধু জিজ্ঞাসা করে, তোমার বুঝি ইচ্ছা নেই?

অহল্যা জবাব দেয় উদাস কণ্ঠে, কেন থাকবে না? আমাদের মত মেয়েরা যে পড়ে, চাকুরি পর্যন্ত করে তা কি দেখতে ভালো লাগে না? কিন্তু কি লাভ হবে?

তোমার কিবা বয়েস, এর মধ্যেই লাভ লোকসান খতিয়ে শেষ করো না। লোকসানের ঢেউ দেখেছ, এখনো লাভের পাহাড় দেখনি—অথচ সবই আছে। জীবনটা কেবল অন্ধকারই নয়। কেন, এ কথা দেখি তুমি আমাকে বুঝিয়েছ—আজ ভুলে যাচ্ছ কি করে?

অহল্যা খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলে, তা হলে পর্ডব কাল থেকে।

এঘর ওঘর থেকে ভূগোল এসেছে, পুষ্পি দিয়েছে মানচিত্র। কয়েকটা দিনেই পড়াশুনা অনেকটা এগিয়েছে। শিশুপাঠ্য ভূগোল ও ইতিহাস হয়েছে মুখস্থ। জীবনে নতুন স্বাদ পেয়েছে অহল্যা। তাই মীরা বৌর এবং কালো-বৌর ছেলে মেয়ে নিয়ে তেমন আদর সোহাগ করতে সময় পায় না।

কিন্তু এর ফুল হয়েছে বিষময়। মীরা ও কালো বৌ প্রত্যক্ষে কিছু না বললেও পরোক্ষে ইন্ধন জোগায়। ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে তুষের আগুন জ্বলে বাড়িময়।

সত্যবন্ধু ও অহল্যা তা লক্ষ্য করে না। ডুবে থাকে ইতিহাস ভূগোলে—মাঝে মাঝে ঝলক দেয় নতুন রঙে রাঙা ভবিষ্যত।

বলব বলব করে পটলের কথাও আর বলা হয়নি। সে কথাও তলিয়ে গেছে রঙিন দিনের আস্বাদে। কত দেশ দেশান্তরের কথা যে অহল্যা মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে! জীবন যে এতটুকু নয় সে তা ভালো করে জেনেছে।

সত্যবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সে একা একা ঘুরে এসেছে পৌরাণিক যুগ থেকে বিংশ শতকের যন্ত্র যুগে। উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সে পরিক্রমা করছে ভূগোলের মাধ্যমে। দেখেছে তাজের অপূর্ব কারু শিল্প, শুনেছে বন্যা প্রতিরোধে দুর্দান্ত কংক্রিটের বাঁধের কথা। এ সকল এখনো তার কাছে স্বপ্ন কিন্তু তার পরিণত মস্তিষ্ক কিছু অস্বীকারও করতে পারে না মিথ্যা বলে।

ক্ষণে ক্ষণে মনুষ্যত্বের সংজ্ঞাও তার কাছে বদলে বদলে যেতে চায়।

শাড়ি সায়া সেমিজে যারা ঘরে বসে দিন গুজরান করে, তাদের জীবনই শুধু সার্থক নয়। তেমনি বদলাতে চায় সতীত্বের সংজ্ঞা। ভাবতে ভাবতে অহল্যা এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়ে।

সত্যবন্ধু এসে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তাকে।

সে বিস্ময় আনন্দ ও অসহ্য পুলকে নিত্য নতুন পাঠ নিয়ে চলে।

সময় সময় পুষ্পি এসে কাছে দাঁড়ায়। বলে, শেষকালে আমাকেও কি তুমি শত্তুর করে নেবে? এত পড়লে বল্‌বে না! হিংসা হলে কি চেপে রাখা যায়!

অহল্যা একটু হেসে বলে, এর জন্য ঐ মানুষটি দায়ী। আমাকে কিছু বলো না ভাই।

সত্যবন্ধু ওদের কথায় জবাব না দিয়ে বলে, আজ আমায় একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, এই ঠিক ন'টায়—আজ জয়েনিং ডেট্।

অহল্যা খাতা পত্তর বই রেখে ওঠে —তবে রাঁধতে যাই।

না, না ওটুকু শেষ করে যাও। কটা আর লাইন?

পুষ্পি বলে, এসো আমি পড়িয়ে দি।—সে অহল্যার হাত ধরে টেনে বসায়। —পড়ো, আই মানে আমি।

অহল্যা নিঃসন্দেহে পুষ্পকে অনুসরণ করে।

লভ্ মানে ভালবাসি। বলো—

এবার অহল্যা সন্দেহে সন্দেহে আওড়ায়—লভ মানে ভালোবাসি।

আই লভ্ মাই মাস্টার—আমি আমার বাবুকে—কি চুপ করে রইলে যে? উঠে যাচ্ছ নাকি? বড একগুঁয়ে ছাত্রী তো। তোমার বেতের কাজ।

অহল্যা নাক মুখ লাল করে উঠে যায়। গিয়ে দাঁড়ায় ফুলদানীটার ফুলের গোছার কাছে।—আমি কি তোমার দুষ্টুমি বুঝি নে?

সত্যবন্ধুর অনেক কিছু বলার থাকলেও, সে নীরবে আড় চোখে চেয়ে থাকে তাজা থোকা থোকা ফুলগুলোর দিকে। কারণ ফুলগুলো তার বড় প্রিয়।

ওষুধ পত্রের ঝামেলা নেই। খাওয়ার ওপর বাধা নিষেধ নেই। চট-পট সব সাঙ্গ হয়ে যায়। সত্যবন্ধু পান মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করে। ঠিক সাড়ে ন'টায় উঠে রওনা দেয়। সে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে, একটিবার ফিরে তাকায়—কিন্তু তখন অহল্যা আড়ালে। পাঁচটার আগ পর্যন্ত এখন খালি এতক্ষণ সে থাকবে কি নিয়ে? যেন পুতুল নিয়ে এতদিন খেলা করেছে

অহল্যা। সেবা যত্ন পরিচর্যা করেছে মন ঢেলে। স্নানাহার করিয়েছে মায়ের মত। এখন সুস্থ হয়ে সে যেন অহল্যার নাগালের বাইরে চলে গেল।

এ পুতুল কখন যে তার অজ্ঞাতে প্রিয় ও পরম হয়ে উঠেছে সে তা জানে না। এর জন্য ফুল, এর জন্য সাজ-গোছ প্রসাধন, এর জন্য যেন তার নতুন করবী বাঁধা। আর যেন অহল্যার কোন কাজ নেই, দায়িত্ব নেই কিছু। সে যেন হালকা হয়ে গেছে। মাত্র একটা দুপুর কয়েকটা ঘণ্টা—তারপরই এঘরখানা আবার মুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু এই দারুণ দুপুরটায় জ্বলে পুড়ে অহল্যা কি বাঁচবে?

মরলে কেমন হয়?

একেবারে মৃত্যু তো সে চায় না। মরে জীয়ন্ত থাকতে চায়। দেখতে চায় তার জন্য সব চেয়ে কার আকর্ষণ বেশি। মৃত্যু নয়—মরণের ভান, জীবনের লুকোচুরি খেলা।

অহল্যার স্নান খাওয়া এঁটো বাসন মাজা পড়ে থাকে। সে বসে বসে বিভোর হয়ে শুধু ভাবে। এত আগ্রহের লেখা পড়ার কথাও সে বিস্মৃত হয়ে যায়। কে যেন তার বর্তমান ভবিষ্যতে দীর্ঘ ছায়া ফেলে বসে থাকে। এ যেন তার জীবনে গ্রহণের পূর্ণ গ্রাস।

অহল্যা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভেঙে উঠে দেখে বেলা তিনটা। সর্বনাশ! সে তাড়াতাড়ি উঠে ঘর দুয়ার মুক্ত করে থালা বাসন মেজে স্নান সেরে আসে।

সত্যবন্ধু আফিসে গিয়ে দেখে যে হেডক্লার্ক ছুটিতে। তার প্রিয় কেরানীটি বড় বাবুর চেয়ারে বসে। চার দিকে নথি পত্তর ছোট বড় ফাইল। দু'জন জুনিয়ার ক্লার্কও একজন বেয়ারা সুমুখে দাঁড়িয়ে। আফিসের প্রথম পর্ব—তেমন কাজ না থাকলেও সকলের মেজাজ যেন তিরিক্ষি। বোল চাল গরম গরম।

সত্য ভাবে যে এ ভিড়ে তাকে হারিয়ে ফেলবে প্রিয় কেরানীটি। সিনেমা দেখার আনুগত্য কি আজো থাকতে পারে? সময় মতো দেখা গেল এ কেরানীটি তেমন লেজকাটা নয়।

বসুন সত্যবাবু দশটা মিনিট। ফাইলগুলো একটু বিদায় করে নিই! আজ বুঝি হাজির হওয়ার তারিখ? আমি ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়েছিলাম। সেদিন বইখানা সত্যি ভালো ছিল। তার সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আজো আছে।

এদিক ওদিক ঘুরে সত্যবন্ধু মিনিট দশেক কাটিয়ে দেয়। চেয়ে দেখে দক্ষিণ প্রান্তের মেয়ে কেরানী দুটি ফাইল আবডাল দিয়ে গল্পে মজে আছে।

তাদের সুমুখের টেবিলে দুটি তরুণ যুবক। সবে বহাল হয়েছে। এখনো জানে না যে তাদের ওপরয়ালা এ সব তাদের সার্ভিস বুকে টুকে রাখছে।

আসুন সত্যবাবু—জয়েনিং রিপোর্ট দিন—। আপনার জন্য এমন একটা জায়গা চয়েস করে রেখেছি যে টু-পাইস আছে। এর জন্য আমাকে অনেক ছকা পাঞ্জা করতে হয়েছে। আজকার ছ টার শোতে কিন্তু অমনি একখানা বই দেখান চাই। আমার ভাঙা কপাল—খাটুনি এবং দায়িত্বই বেড়েছে। ওদিকে কিন্তু টুঁ-টু—মাইনেতে কোনো লিফট নেই।

সত্যবন্ধু বলে, সিনেমা দেখবেন, আপত্তি নেই। কিন্তু আজ আমি জয়েন করতে চাইনে। আরো কয়েকটা দিন রেষ্ট চাই। কি করব বলুন, ডাক্তারের এ্যাড্‌ভাইস্।

তেরছা চোখে চেয়ে কেরানীটি বলে, সেই লেডি ডাক্তারটির বুঝি? তা বেশ, বেশ। দুদিন যা হাতে পেয়েছেন আরাম করে নিন। এ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। আমাদের তো নসিব মে কিছু নেহি আয়ে গা। তবে জায়গাটা চমৎকার ছিল—এমনটি আর ভূ-ভারতে হয় না। দেখুন কি করবেন?

যা ভেবেছি ছুটিই নেব। আমার একটু জরুরী কাজও আছে। আপনার টিকিটখানা কেটে এনে পৌছে দিয়ে যাচ্ছি।

ক্ষমা করবেন, আমি একা কিছুতেই যাব না।

তবে আমি ব্যাঙ্ক থেকে একটু ঘুরে সময় মত টিকিট নিয়ে ফিরব। ঘণ্টা-খানেক আগে কি আপনি কেটে পড়তে পারবেন?

নিশ্চয়। বাথ রুমটা এখনো অকেজো হয় নি।

রাত সাড়ে নটায় সত্যবন্ধু বাসায় ফেরে। আর কোনো দিন তার এত দেরী হয়নি। সন্ধ্যার পর থেকে অহল্যা কেবল ঘর-বার করেছে। একে একে বাড়ি ফিরেছে সবাই। অহল্যার ক্রমে চিন্তা বেড়েছে। আজ তার চুল বাঁধা পর্যন্ত হয়নি। কতবার যে গরম জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তারও আজ চা খাওয়ার স্পৃহা জন্মেনি। কাজ কর্ম যা করার তা সে করেছে, কিন্তু সবই উন্মনা উচাটন ভাব নিয়ে। আজ সে ঠিক করে, এলে একটা কৈফিয়ৎ চাইবে। সব চাওয়া-পাওয়া তার তলিয়ে যায় সত্যবন্ধু ঘরে ঢুকলে।

সত্যবন্ধু খেতে বসে বলে, আমার আর কিছু লাগবে না। তাড়াতাড়ি তুমি খেয়ে ওঠো।

অহল্যা ভাবে কেন এ আদেশ ? খাওয়া-দাওয়ার পর আর কি তার গুরু দায়িত্ব আছে ? চিন্তা করে সে কিছু পায় না। কিন্তু সারা শরীর তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে পেট ভরে খেতে পারে না।

আবার ছুটি মিলাম।

একটি পান সেজে অহল্যা সত্যবন্ধুকে দেয়। আর একটি নিজের মুখে পুরে জিজ্ঞাসা করে, কেন ?

এমনি।—আলোটা উজ্জ্বল করে দিয়ে সত্যবন্ধু বলে, আর একটু কাছে এসো তো। লজ্জার কি—এসো না!

অহল্যা একেবারে শয্যার পাশে এগিয়ে যায়।

পর্দাটা ফেলে দিয়েছ তো।

হুঁ।—অহল্যার ভিতরটা থর থর করতে থাকে।

সত্যবন্ধু বলে, একটু চোখ বুজে থাকো।—সে উঠে আলোটা আর একবার বাড়িয়ে দেয়। দুটি সুদৃশ্য ভেলভেটের কেস খোলে। একটাতে এক ছড়া সোনার হার, অপরটাতে দুটো মিনা করা টব। সে অহল্যার গলায় পরিয়ে দিতে যায় সোনার হার ছড়া।

অহল্যা মুখে কিছু বলে না—তবে খানিকটা সরে যায়।

ওকি অমন করছ যে ? দোক্তা খেয়েছ নাকি ? জল দেব ? যার যা সইবে না, তা কি খাওয়া উচিত ?

ও সোনার জিনিস আমার সইবে না। ও পরলে এ বাড়িতে কিছুতেই টিঁকতে পারব না। একে আঁচলে চাবি বাঁধি বলে ঘর বাড়ি ভেঙে যায়, তার ওপর যদি পরি সোনার হার আর টব!

এতো আমার পয়সা নয়, তোমারই গায়ের রক্ত জল করা পয়সা। টাকা নিলে না, সোনায় আটকে রাখলাম। এতে আবার কি দোষ হল ?

তবু অহল্যা দূরে সরে থাকে।

সত্যবন্ধু দু'হাত ধরে তাকে কাছে টেনে আনে। বুঝলে অহল্যা, আমি তোমাকে পয়সা দিয়ে রেখেছি। তুমি আমার মনের মত ছিমছাম-হয়ে চলতে বাধ্য। কারুর কথায় ভয় পেলে এখানে থাকা চলবে না। সত্যবন্ধুর গলায় আজ যেন প্রভুত্বের ধ্বনি রণরণিয়ে ওঠে।

অহল্যা বিবশ হয়ে থাকে। হার এবং টব পরা শেষ হলে সে উঠে আয়নায় যাকে দেখে সে যেন অহল্যা নয়।

সাতাশ

অনেক ভেবে মিঃ ডাস একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। রণেন যা পারেন নি, তাঁকে পারতে হবে। হৈ হৈ প্রডাকসনের যা কিছু তা কিনে নিতে হবে দুঃসাহসে ভর করে। কিন্তু টাকা কোথায়? এমন কিছু লাগবে না। দু বোতল হুইস্কি, আর নগদ তিন টাকা ছ আনা। এই পেলেই এখন রণেন কাৎ। তারপর অবশ্য অজস্র টাকার প্রয়োজন। কত কি যে অদল বদল করতে হবে! হয়ত অহল্যার জন্যই সত্যবন্ধু হেঁকে বসবে দশ হাজার। এমনিতে সত্যবাবু ভালো মানুষ কিন্তু মওকা পেলে সে কি ছাড়বে? তেমন যদি অসুবিধা হয় অহল্যাকে ছেড়ে ফুলদিকে নিয়েই মিঃ ডাস ঝুলে পড়বেন। প্রথম বইটায় নিজে ঝুঁকি নেওয়া ভালো নয়। দ্বিতীয়টায় দেখা যাবে। ফুলদিকে একটা সাইকোলজিক্যাল প্রস্তুতির সময়ও দেওয়া উচিত। হাজার হলেও গৃহস্থ ঘরের বৌ তো! আচ্ছা অহল্যা নায়িকা, তিনি নায়ক—কেমন হয়? চমৎকার। মিঃ ডাসের নাচতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ভোতা পাবলিক কি তা নেবে? একমাত্র ফুলদির সঙ্গেই তাঁকে মানায়। অতএব লোভ সামলান ভালো। বইটার নামের পোষ্টার পড়লেই যে বাজারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড হয়ে যাবে। মিঃ ডাস মহা ফাঁপড়ে পড়েন। যাক, রণেনের কাছ থেকে সব কিছু হাত করে তখন না হয় চিন্তা করা যাবে। যে পথেই তিনি যান অহল্যাকে উদ্ধার করার মহান দায়িত্ব তাঁকে স্মরণ রাখতেই হবে।

পৈত্রিক ভদ্রাসনখানা হারিয়ে রণেন কাঁদছেন। অথচ সেই ভদ্রাসন বেচতেই মিঃ ডাস হয়েছেন উদ্যোগী। রণেনের সমস্যা ছিল আশার, তাঁরটা হচ্ছে নেশার। রণেন ভবিষ্যত খুইয়ে নেশা ধরেছেন, আর মিঃ ডাস বর্তমান

খুইয়ে অস্থির। দু জনের সমস্যা বিপরীতমুখি। তাই রণেন যেখানে ঠেকেছেন, মিঃ ডাস সেখানে জিতবেন। রেসে বাজি ধরলে তাঁকে একটি ঘোড়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত, এখানে মিছিল!

মিঃ ডাস তিন চার জন দালালের সঙ্গে কথা বলেন।

আমার বাড়িটা কম পক্ষে দু বিঘার ওপর। তিন হাজার করে কাঠা হলে এক লাখ কুড়ি হাজার। সে ছাড়া যা আসবাবপত্র এবং দালান কোঠাগুলো রয়েছে তার ভ্যালুয়েসনও কম নয়। কিন্তু তা চাইনে, শুধু জমিটার দাম চাই।

একজন পাকা দালাল বলে, কিছু মনে করবেন না, মিঃ ডাস সাহেব তেমন খদ্দের হলে আপনার ও ভূতের বাড়ি ভাঙার খরচা তো দাবী করে বসবে। সে ছাড়া গয়লাকে কে হটাবে?

তবে কি আমার বাড়ি বিক্রি হবে না?

হবে। কিন্তু অনেক গলতি আছে। তেমন দাম উঠবে না।

লাখ টাকাও হবে না? আমি তেমন দরাদরি করতে ভালোবাসি নে। এক বাপ দাদার চিহ্ন বলে যা মায়া। নইলে পঞ্চাশ হাজারেও পরোয়া করতাম না।

এইবার একটা কাজরে বাত্ বলেছেন—পঞ্চাশ হাজার। খদ্দের আনব?

বল কি, পঞ্চাশ হাজার! কে বললে একথা? তোমাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না। তুমি রাতকে দিন করতে চাও।—মিঃ ডাস রাগে গড়গড় করে উঠে পড়েন।

দ্বিতীয় দালালটিও প্রায় ঐরূপ। টাকার অঙ্ক মোটেই বাড়াতে চায় না। তবে তার মুখ অত্যন্ত মিষ্টি। মিঃ ডাস এখান থেকেও ক্ষুণ্ণ হয়ে ফেরেন। বেচবেন না তিনি জলের দরে পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি। এতো ভদ্রাসন নয়, কলকাতার বুকে একটা রাজত্ব। কালে কালে এ জায়গাটা বালিগঞ্জকে টেক্কা দেবে।

আবার যখন হৈ হৈ ছন্দের কথা মনে হয়, তখন হিসাব যায় পালটে। বুকটা ওঠে টাটিয়ে। বালিগঞ্জ তো তুচ্ছ, এমন ডালহৌসি স্কোয়ারও কি টেঁকে হলিউডের কাছে? তিনিও তো একদিন এই কলকাতা সহরে একটা ছোট-খাটো হলিউড গড়ে তুলতে পারেন। আজকার পঞ্চাশ হাজার, কাল লাখটাকা

হওয়া আশ্চর্য নয়। মিঃ ডাস আরো দু এক জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এবং খদ্দের আসতে থাকে নানা রকম—বাঙালি, গুজরাটি, ভাটিয়া, মাড়ওয়াড়ি একেবারে খাস বিলেতি ফার্ম পর্যন্ত।

মিঃ ডাস একেবারে নাওয়া-খাওয়ার সময় পান না। কিন্তু কাজ কি সহজে এগুতে চায়। সুমুখের গয়লা ও তার সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে কত আইনের যে ফ্যাকরা বার হয়। কত তর্ক, কত রকম মন্তব্য। বেশ কিছু তাঁর টাকা পয়সা ব্যয় হয় এদের সঙ্গে কথাবার্তার তাল রাখতে। সে জন্য মাঝে মাঝে এক একটি আসবাব ছাড়তে হয় গোপনে।

শুধু গয়লা নিশ্চিন্ত। সে খৈনি টেপে, আর রাম নাম করে। এখন আর সে যখন-তখন সেলাম দেয় না ডাস সাহেবকে তাঁর অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে। সে একটা দাঁও মারার আশায় বসে রয়েছে। ঝড়ের সময়ই আম কুড়ান সূক্ষ্ম বুদ্ধির কাজ। মিঃ ডাস যখনই গয়লাকে দেখেন, তখনই কটমটিয়ে তাকান। তাতে গয়লা এখন আর ভ্রূক্ষেপও করে না।

অবশেষে একদিন মিঃ ডাসই গয়লাকে ডেকে পাঠান। গয়লা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

অনেকদিন তুমি আমার আশ্রয়ে আছ। শেষকালে আর নেমক হারামি করো না। কিছু টাকা আক্কেল সেলামী দিচ্ছি, উঠে যাও।

হুজুর মেহেরবান।

ওসব বুজরুকি রেখে সোজা বলো কত টাকা চাই? তুমি উঠে গেলে আমার জমির দাম হবে ঢের।

নাফারু (লাভের) অর্ধেক দিন তবে।

মিঃ ডাসের জুতোর বাড়ি মারতে ইচ্ছা করে। কিন্তু রাগ চেপে তিনি বলেন, ওসব বাজে কথা রেখে হাজারখানেক দিচ্ছি—তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হও। আজ পর্যন্ত যা দিয়েছ তা তুমিও জানো, আমিও জানি। কিন্তু তুমি আসল জিনিসের দাম নিয়েছ যথেষ্ট। এখন একটু ধর্মের দিকে তাকাও।

ছিঃ ছিঃ কি বলছেন হুজুর! আমার মুখের দিকে চেয়ে তো চার পাঁচটি ভাগীদার ভাই রয়েছে। তাদের তো কুঝঝি দিতে হবে।

তাদের তো তুমি কলা ঠেকাবে। যাক আর পাঁচ শ' বাড়িয়ে দেব।

তবু দাঁতে জিভ কাটে গয়লা।

দু হাজার।

এইবার গয়লা একটু নরম হয়। মিঃ ডাস বলেন, কাল এসো পাকাপাকি কথা হবে। ভাগীদারদের সঙ্গে নিয়ে এসো।

গয়লা মাথা চুলকায়।

আচ্ছা থাক তবে, তুমি একাই এসো।

এবার গয়লা হেসে বলে, হুজুর মেহেরবাণ—বড়া দিলদার।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে অহল্যা ভালো করে আঁচলখানা গলায় জড়িয়ে দেয়। যেন ঠাণ্ডা লেগে টনসিল ফুলেছে। কিন্তু কান দুটো তো আর ঢাকবার উপায় নেই। সে বিছানাপত্র গুছিয়ে বালতি হাতে কলতলার দিকে রওনা হয়। এইটাই হচ্ছে এ বাড়ির কমনরুম। অহল্যা ভিড় এড়িয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু বাদে সবই রাষ্ট্র হয়ে যাবে, তবু যতক্ষণ চাপা রাখা যায়।

এক পুষ্পি ছাড়া এ বাড়ির প্রায় সবাই অহল্যাকে অনেকটা বয়কট করে চলছে। তবে কনকদি প্রভৃতি দু একটা খোঁচা-মারা কথা বলেন। সেই কনকদিই একটা কেটলি নিয়ে এসে পড়েন এই পাঁচ ইঞ্চি বাড়ির কমন রুমে।

—দেখি দেখি করে আবার কানের গয়না গড়ালে? যাক ভালো চাকরিটি জুটিয়ে দিয়েছিলাম আমি। ওরে উৎপলা শুধু টব নয়—সোনার হার।—কনকদি আঁচলটা জোর করে খুলে ফেলেন।—তোরা বৃথাই এতকাল সরকারী চাকরি করছিস!

বাড়ি সমেত প্রায় সব স্ত্রীলোক কলতলার দিকে ছুটে আসে। টীকা-টিপ্পনী চলে নানা রকম। এক ঘরে করার সামান্য বিধি নিষেধও কেউ মানে না। বাড়ির পুরুষদেরও কান ভারি হয়ে ওঠে।

তবে শান্তিমিত্র বলেন, যা তা একটা কিছু বলা উচিত নয় পিছনে বসে।

ইলা বৌদি বলে, সুমুখে বললে তো ঝগড়া হয়ে যাবে। আইনের দিক দিয়ে তো তারা গঙ্গাজল। অহল্যা বলে টাকা পয়সা এমনি না রেখে সোনায় ধরে রাখলাম।

ন্যায্য কথা। বেশ জবাব দিয়েছে। আপনারা জলে পুড়ে মরছেন কেন?

শ্রীবিদাসবাবু বলেন, আমিও তো সেই কথা বলি।

তাঁর স্ত্রী কনকদি এসে টিটকারি দেন, তা বলবে না কেন? চাঁদ মুখ দেখেছ যে!

মোট কথা পুরুষ এবং নারীরা শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে দাঁড়িয়ে যান। তবু বাড়ির আসল কর্তা যাঁরা তাঁরা হেরে যান টাগ-অফ ওয়ারে। কারণ তারা সরে জমিনে থাকেন আর কত সময়!

এসব শুনে পুন্পি বলে, তুমি আর মন খারাপ করো না অহল্যাদি। আমি আছি, আমার সঙ্গে বসে গল্প গুজব করবে, বাকি সময় থাকবে সংসার নিয়ে। সত্যদাকে বলে একখানা জলচৌকি কিনে দেব। তাতে বসে হার ঝুলিয়ে রাঁধবে। দেখি কে কি করতে পারে?

ওঘরে ফুলদি এবং এঘরে সত্যবন্ধু শুধু এসব কথা থেকে নিজেদের এড়িয়ে রাখেন। একজন পুজোয় আর একজন বইতে মগ্ন। তবু যেন অস্বাভাবিক ঠেকে।

সারাদিন অহল্যার মুখে তেমন হাসি নেই। কাজকর্ম করে যেন গতানুগতিক ভাবে। সত্যবন্ধুর এসব ভালো লাগে না! কিছু বলতেও ইচ্ছা করে না এসব নোংরামির বিরুদ্ধে। দেওয়া-নেওয়ার যারা বাস্তবিক সরিক নয়, মিছামিছিই তারা থাক হয়ে যাচ্ছে।

মেঘ থাকুক—বর্ষা ঝরুক, তবু বাদলার যেমন একটা রূপ আছে, সেই রূপেরই প্রকাশ যেন সত্যবন্ধু দেখতে পায় অহল্যার মুখখানাতে। সোনার জিনিসগুলো যেন মেঘের পট-ভূমিতে থির-বিজুরী। সত্যবন্ধুর মগ্ন মন মাঝে মাঝে ঝিলমিলিয়ে ওঠে। এরূপ সকলের আয়ত্তে আসে না। সত্যবন্ধু যখন হাতের নাগাল পেয়েছে, তখন ইচ্ছা মত ভোগ করে নেবে। ভোগ করে নেবে সঙ্গে সান্নিধ্যে আরো একান্ত করে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ সত্যবন্ধু বলে, অহল্যা এদিকে এসো, আজ রাত্রে আর রান্না-বান্না হবে না।

অহল্যা কাছে আসে। ডান হাত দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ঝরে পড়া ফুল খুঁটে তুলে নেয়।—আপনিও কি রাগ করলেন যে একথা বলছেন?

না। তুমি তাড়াতাড়ি ভালো শাড়িখানা প'রে নাও। ভাবছি তোমাকে নিয়ে একটু সিনেমায় যাব, নইলে তোমার গুমট কাটবে না।

সোনার জিনিসের ওপর ব্যাঙ্গালোর, তার ওপর বাবুর সঙ্গে সিনেমা—আজ নিশ্চয় মহাপ্রলয় হবে। অহল্যা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওকি অমন করে রইলে যে? কাল রাত্রের কথা কি এর মধ্যে ভুলে গেলে? কাপড় পরার আগে একটু মুখ হাতে সাবান বুলিয়ে নিও। আর

এই প্যাকেটটা কাল খোলা হয়নি। এতে স্যাণ্ডেল আলতা নেইল-পলিশ রয়েছে। তোমার খুশি না হলে নেইল-পলিশ না-ই বা লাগালে।

অহল্যা আর কলতলা যায় না। কেউকে ডেকে যে একটা পরামর্শ বা জিজ্ঞাসা করবে তেমন বয়স্ক একটি বান্ধবীও আজ তার এ বাড়িতে নেই। অহল্যা গিয়ে ভারাক্রান্ত মনে বারান্দার পর্দা ফেলে দিনের আলো না নিবতে। এ ক্ষেত্রে পুস্পিকেও ডেকে কাজ হবে না, সে চুপচাপ সাবান মাখতে বসে। হাত মুখ ধুয়ে সে কাপড় পরে। আলতার গাঢ় পোছ দেয় পায়ের চারদিক ঘুরিয়ে। অবশেষে চুল বাঁধে। স্যাণ্ডেল পরে শক্ত করে। পর্দাটা তুলে দিয়ে ঘরে ঢুকে বলে, চলুন।

সত্যবন্ধু বলে, একবার সুমুখের দিকে চোখ তোল। আমিও তৈরী।

বড় আয়নাটায় আপাদমস্তক প্রতিবিম্ব পড়েছে অহল্যার। একি ব্যারাক বাড়ির ঝি, না এক বিশ্বশ্রী মেয়ে?

ওকি অহল্যা তোমার চোখে জল নাকি?

ইতিমধ্যে অহল্যাও নিজেকে দেখেছে। বলে, না, না চলুন।

ট্যাক্সিতে বসে চলতে চলতে ভালোই লাগে। ভালোই লাগে এ স্বাচ্ছন্দ্য, এ সান্নিধ্য। এমনটি সে বুঝি আর জীবনে পায়নি। হয়ত আর আশাও নেই। সে সত্যবন্ধুর মহত্ত্বে উদারতায় দরদে গলে গিয়ে ঘন হয়ে বসে। সত্যবন্ধুও জীবনে এমন নারী দেহের উত্তাপ পায়নি—রক্তে বর্ণে মাংসে ডৌলে সমৃদ্ধ। কোথায় ট্যাক্সি থামাতে হবে নির্দেশ দিতে ভুলে যায় সে।

ট্যাক্সি নির্দিষ্ট সিনেমা পেরিয়ে জন সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে চলে।

অহল্যা!

বাবু!

আর আমায় বাবু বলে ডেকো না। ও শুনতে ভালো লাগে না। ও নাম লজ্জার, সমাজের গ্লানির।

তবে কি বলে ডাকব?

কিচ্ছু বলো না। তোমায় ভুলে যেতে হবে যে তুমি আমার মাইনের মানুষ। যে সেবা দায় ঠেকে নেয়, তার চেয়ে যে করে সে কখনো খাটো নয়। কিন্তু আমরা তা তলিয়ে দেখি নে।

ড্রাইভারটি পাঞ্জাবী। প্রায় এলগিন রোড অবধি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে যে কোথায় যেতে হবে? তখনো কিন্তু গাড়ি চলছে।

সত্যবন্ধু বলে, ভবানীপুর।—সে একটা সিনেমা হলের নাম করে।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে ব্রেক কষে। সে ঘুরিয়ে ফেলে গাড়িখানা ভিড় কাটিয়ে। দু একজন পথিক রুষ্ট হয়। একখানা বাস হাহা করে ওঠে। ধীরে ধীরে গাড়িখানা জায়গা মত এসে থামে। একখানা ভাল হিন্দি বই হচ্ছে। সিনেমা জগতে এখানা নাকি পুরস্কার পেয়েছে 'বৈজয়ন্তী'। হলের সুমুখে মানুষ তো না যেন মৌমাছি। বিজ্ঞাপনে যে সব কার্টুন টাঙান হয়েছে তাতে সাপ থেকে আরশুলা পর্যন্ত সব আছে। বাকি শুধু একটা সিম্পাঞ্জি।

বাইরের ছবিগুলো দেখে সত্যবন্ধুর পিত্ত জ্বলে যায়। তবু সে বুঝতে পারে না কেন এ বইর এত নাম? আর একটু এগিয়ে দেখে 'হাউস ফুল'। সে মনমরা হয়ে যায়। দেরী করে আমার দরুন সে বুঝি ঠকল! এত যার দর্শক, নিশ্চয় সে একখানা হিট্ বই। একটু দাঁড়িয়ে সে কি যেন ভাবে। তারপর ন-টার শোর টিকিট কিনে আনে।

চলো অহল্যা আর একটু ঘুরে আসি। ছ-টার শোর টিকিট পাওয়া গেল না। নিকটে কোনো ভাল বাঙলা বই নেই, তাই নটার টিকিট কাটতে হল।

ভিড় ঠেলে ফুটপাথে এসে ওঠে সত্যবন্ধু। অহল্যাও পাশে এসে দাঁড়ায়। মাথায় কাপড় নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই—অবিবাহিতা বান্ধবীর মত দেখায় তাকে। সত্যবন্ধু হাত ধরে। অহল্যার হাতখানা ঘুমন্ত পাখির মত আত্মসমর্পণ করে থাকে। যেমন উষ্ণ, তেমনি নরম! পথের জনতা কে কি ভাবে যে ওদের নিচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই দুজনারই। এমন রাত্রি, আলো, ছায়া হয়ত দুজনেই আরো কত দেখেছে কিন্তু ঠিক এ রকমটি আর যে কখনো লেগেছে, তা ওদের মনে হয় না। কথা না বলে ওদের কেবল হাটতে ইচ্ছা করে। সত্যবন্ধু ভাবে এতদিন বাদে সে অহল্যাকে একটুখানি ন্যায্য মূল্য দিতে পেরেছে। অহল্যা ভাবে এবার সে সত্যি যেন কি পেতে বসেছে। চক্ষু লজ্জা করলে এসব পাওয়ার উপায় নেই। তাকে আর একটু শক্ত হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

এসো একটা রেঁস্তোরায় ঢুকে কিছু কিনে খাওয়া যাক। অনেকদিন চপ কাটলেট খাইনি হেঁটে হেঁটে বেশ ক্ষিধে পেয়েছে।

সত্যবন্ধু ভেবেছিল অহল্যা আপত্তি তুলবে। কিন্তু সে বলে, চলুন আমারও ক্ষিধে পেয়েছে। বিকেলে তো চাটুকুও জোটেনি।

সে কার দোষ?

ভেবে দেখুন কার!

যতক্ষণ চোখের জল ফেললে, ততক্ষণে তো পাঁচ কাপ চা খাওয়া হয়ে যেত।

যেত না ভদ্রলোক। ওর মধ্যেই সাজতে-গুজতে হয়েছে। যে বকুনি আপনার। দেখতে ঠাণ্ডা, কিন্তু হাত দিলে আর রেহাই নেই। ফোস্কা পড়বেই।

আমি কি আগুন?

কি জানি!—অহল্যা হেসে ফেলে।

কিন্তু তোমাদেরই তো আগুন বলে। নিজেকে নিজে ঠিক বুঝতে পারছ না।

অহল্যা আবার বলে, কি জানি।

তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লকলক করছে।

এবার অহল্যা কোনো উত্তর দেয় না।

এই শাড়িখানা কিনেছি অবধি আমার একটা সখ ছিল—তুমি কি তা জানতে?

অহল্যা অস্ফুটে বলে, জানতাম।

তবে আপত্তি করছিলে কেন?

এমনি।

ওরা একটা কেবিনে ঢুকে পাশাপাশি বসে। সত্যবন্ধু নিজের মর্জি মত হুকুম করে। প্লেটে প্লেটে খাবার আসে। চকচকে ঝকঝকে কাঁটা চামচ ছুরি।

সত্যবন্ধু বলে, খাও অহল্যা।

অহল্যা খেতে পারে না। এ তার আড়ষ্টতা নয়। আবার পটলকে মনে পড়েছে। যদিও এ কেবিনটার সঙ্গে সেদিনেরটার আকাশ পাতাল ব্যবধান, যদিও আজকার অহল্যাকে সেদিনের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, তবু সে দেখে সমস্ত খাদ্যের ওপর যেন একখানা বুভুক্ষিত মুখ ছায়া ফেলেছে। আজ আর সে মুখে হাসি নেই।

ওকি তোমার আবার হল কি? মাঝে মাঝেই দেখি চন্দ্রগ্রাস।

অহল্যা কোনো জবাব না দিয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে।

সত্যবন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করে—এমনি অনেকবার। সমস্ত মনোরম পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। কাঁটা চামচ ফেলে সেও হাত গুটিয়ে বসে।

এবার অহল্যা পটলের কথা খুলে বলে। বলে সেদিনের বিলম্বের কারণটা বিশ্লেষণ করে। সত্যবন্ধু স্থির হয়ে সব শোনে। ফুটপাথের আবর্জনা নোংরার ভিতর এ যেন সোনার খণ্ডাংশ।

ও ছিল বলেই মান ইজ্জৎ বাঁচল—ও ছিল বলেই ব্যারাক বাড়ি। কিন্তু সেদিন তেমন খোঁজ করতে পারিনি। একটিবার তো আমার দেখা করা উচিত ছিল।

এখন তবে চল।

আপনি যাবেন!—অহল্যা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

অনেক খোঁজের পর পটলদের দলের সুকুমারীর সঙ্গেই শুধু দেখা হয়। আর সব নাকি ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে পটল নাকি গেছে হাসপাতালে। এখনো ফেরে নি।

সত্যবন্ধু, মনে মনে ভাবে, আর ফিরবে কি! এ সব চিঠি হয়ত কবে জমা হয়ে গেছে ডেড্-লেটার আফিসে।

সুকুমারী বলে, পটল তোকে দেওয়ার জন্য একটা টাকা রেখে গেছিল আমার ঠেয়ে। সে নাকি কিসের দেনা ছেল। কিন্তু আমি ভেঙ্গে খেয়েছি।

বেশ করেছিস। আমি আর শুনতে চাইনে। আরো দুটো টাকা দিয়ে যাচ্ছি। ও কখনো ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

সেদিন সিনেমার টিকিট দুখানা নষ্ট হয়ে যায়। অহল্যাকে সুস্থ করে বাসায় ফিরতে রাত প্রায় বারটা বাজে।

আটাশ

পরদিন আবার সেই এক ঘেয়ে সংসার। সেই এক ঘেঁয়ে রান্না খাওয়া। অহল্যা যেন কোনো উৎসাহ পায় না। সে বেলা করে ওঠে। ধীরে ধীরে কাজ কর্ম শেষ করে। সত্যবন্ধুরও ঘুম ভাঙতে দেরী হয়। মনের এবং শরীরের জড়তা কাটতে অনেক সময় লাগে। দিনের আলোতেও যেন ভেন্ড-লেটারের ছায়া মিলায় না।

সত্যবন্ধু জোর করেই অহল্যাকে কাছে ডাকে। জোর করেই দু একটা হালকা কথা বলে। কিন্তু কিছুতেই যেন আসর জমে না। অহল্যার কাজের ভিতরও যেন আর ঘুঙুরের বোল শোনা যায় না।

এ অবসাদ বড় ক্লান্তিদায়ক। একে দূর না করতে পারলে বাঁচার উপায় নেই। গোটা দশেকের সময় সে একটা সার্ট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘণ্টা দু-ই বাদে সে ঘরে ফিরে আসে।

চুপি সারে, পুস্পি ঘরে ঢোকে।—কোথায় গিয়েছিলেন সত্যদা?

টিকিট কাটতে। তোমার অহল্যাদিকে নিয়ে সিনেমায় যাচ্ছি। কাল গিয়েছিলাম, কিন্তু টিকিট কেটেও দেখা হয় নি।

-কেন?

তা তোমার দিদিটিকে জিজ্ঞেস কর। তুমি যাবে?

কি বই?

দর্শন।

হাই ক্লাশ। গত বছর আমি দেখেছি। কিন্তু বড্ড প্যাথেটিক। নতুন বই এলে যাব। তখন আমার পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে। কিন্তু কাল টিকিট কেটেও কেন দেখা হল না?

তা তোমার দিদিটিই ভালো জানেন।

আচ্ছা তার কাছেই না হয় জিজ্ঞাসা করা যাবে। একটা কথা সত্যদা, যে জন্য এসেছি—এমনি কটা দিন আপনারা রোজ সিনেমা থিয়েটার দেখে ফিরবেন বেশ একটু রাত করে। দেখি এঁদের মুরদ কত—আপনাদের কি করতে পারে? কদ্দিন আর জলুবে, তারপর তো ছাই হয়ে যাবে। আমি ভাঙা কুলায় করে ফেলে তবে নিশ্চিন্তি।

সত্যবন্ধুরও ভিতরে ভিতরে একটা জেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাই অহল্যাকেও সময় মত রওনা দিতে হয় সত্যবন্ধুর আদেশে।

দোকান পসার আলো ছায়া দেখতে দেখতে অহল্যার মনটাও হালকা হয়ে যায়। আজ আর সে হিন্দি বই নয়—মধ্য সহরে নামকরা বাঙলা বই। পুষ্পির মন্তব্যে সত্যবন্ধুর আরো ঔৎসুক্য বেড়েছে। করুণ বই জমবে ভালো। অহল্যাও বুঝতে পারবে অতি সহজে।

হলের ভিতর ঢুকেই অহল্যার যেন মনে হয় ইন্দ্রপুরী। এমন দৃশ্য পট সমারোহ তার কাছে অচিন্ত্যনীয়। সে সম্মোহিত হয়ে সত্যবন্ধুর পাশে বসে একখানা হাত আবেগে ধরে থাকে। কিছু জিজ্ঞাসা করার মত ভাষা সে হারিয়ে ফেলে। সে কি হঠাৎ স্বর্গ লোকে এসে পড়েছে? দৃশ্য বর্ণ গমকে সে একান্ত অভিভূত।

শো আরম্ভ হওয়ার পর সত্যবন্ধু মাঝে মাঝে ঈষৎ হাতে চাপ দেয়।—বুঝতে পারছ তো?

অহল্যা আস্তে আস্তে জবাব দেয়, হুঁ।

দেখতে দেখতে আড়াই ঘণ্টা কেটে যায়।

ওরা বেরিয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দেয় না। হাঁটে ওয়েলিংটন স্কোয়ার হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত। তারপর গড়ের মাঠের গাছের ছায়ায় আলোকে আঁধারে।

কেমন লাগল অহল্যা?

বুঝিয়ে বলা যায় না। এত ভালোবাসাও জগতে আছে!

বিধবার প্রেম তো অবৈধ। কি বলো, তবু ভালো লাগল তোমার? কোনো সংস্কারে বাধল না?

না।

বিধবা না হয়ে সধবা, কি কুমারী হলে কি হতো? তাতেও কি তোমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগত না?

ও অবস্থায় তাতেও দোষ হত না। আমরা অবস্থার দাস।

একটা বড় কথা বলেছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

যখন ট্যাক্সি এসে গেটের কাছে থামে অহল্যা দেখে যে তার মুগ্ধ দেহ সত্যবন্ধুর দেহে এলান। মিলের ঘড়িতে রাত বারটার শব্দ হয়। সে সচকিত হয়ে সরে বসে। একটু বাদে সত্যবন্ধুর পিছন, পিছন সে এসে নেমে দাঁড়ায় রাস্তায়।

আজ গেটটা ভিতর থেকে বন্ধ। এ বারোয়ারী বাড়ির জীবনে রেকর্ড।

এখন কি করা যায়? পাঁচিল টপকানো কি সম্ভব হবে? সত্যবন্ধু একটু যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন ফ্যাসাদে সে কখনো পড়েনি। সে তো অন্যায় কিছু করেনি। মানুষের মর্যাদা বোধের দাবী সে খানিকটা মেনে নিয়েছে। ঠকাবার সুযোগ পেয়েও সে অহল্যাকে ঠকায়নি। সাজসজ্জা সে তো তার পারিশ্রমিকের বিনিময়েই করছে। সত্যবন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখা, বেড়ান যদি অপরাধ হয়—সে-অপরাধ সে মানতে রাজী নয়। যে পরিচারিকা হয়েও সেবা যত্নে মমতায় সে গণ্ডী পেরিয়ে গেছে, তাকে কি দোষ বান্ধবীর তুল্যমূল্য দেওয়ায়? সব সময়ই সামাজিক বিধিবদ্ধ অনুশাসন মেনে নেওয়া বড় কথা নয়। সমাজ সমষ্টির, হৃদয় ব্যক্তির। ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঠেকিয়ে কেবলই সমাজকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। কালেকালে তাকে ছাড়তে হবে এ বাড়িটা।

আর কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন?—

তাই তো—কি করি—

থতমত না খেয়ে কড়া নাড়ুন জোরসে, কেউ না কেউ খুলে দেবে। সবাই আর ভুল বুঝে বসে নেই।

খানিক বাদে ঋষিদাসবাবু এসে গেট খুলে দেন।—কোথায় গিয়েছিলেন?

সিনেমায়।

ছটার শোর টিকিট পাননি বুঝি?

না, পেয়েছিলাম। কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেল ঘুরে ফিরে খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে আসতে। আবার এখানে এসে কে ঝামেলা করে!

সব এক ঘেঁয়েমি পরচর্চার ভিতর আপনিই শুধু ব্যতিক্রম। দেখে সত্যিই ভরসা পাচ্ছি। এ আমার মনের কথা—ঠাট্টা করছিনে। নইলে এত রাত্রে উঠে দরজা খুলে দিতাম না। আর দেখুন যে গেটটা জন্মে বন্ধ হয় না, সেটা

আজ বন্ধ। এদের সঙ্গে কি আপনার আমার বাস করা চলে? তারপর কি বই দেখলে অহল্যা?

অহল্যা হেসে বলে, দর্শন!

কেমন লাগল?

খুবই ভালো।

তা লাগবে না! অমন ক'খানা বই আছে ছবির বাজারে?

অহল্যা ও সত্যবন্ধু ভিতরে চলে আসে। ঋষিদাসবাবু প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকান। জীবনের কোনো পালা-বদলকে তিনি ছোটখাটো নিকৃষ্ট করে দেখেন না, যদি পরস্পর পরস্পরের দায়িত্ব নিয়ে চলে।

একটা কথা অহল্যা, সন্ধ্যের পর তোমাকে কে যেন খুঁজতে এসেছিল?

আমাকে, না বাবুকে?

না—তোমাকেই।

কে?—অহল্যার মনটা ধক্ করে ওঠে। পটল?

সত্যবন্ধুরও পটলের কথাই মনে হয়। কিন্তু সে তো একেবারে জমা হয়ে গেছে এমন অফিসে যেখান থেকে ফেরৎ আসে না কেউ।

আমি মানুষটিকে দেখিনি। স্ত্রীলোক না পুরুষ তাও জানি নে। আলোচনা শুনেছি, তাই বললাম। সকাল বেলা খোঁজ নিয়ে দেখো।

এত রাত্রে সে-ছাড়া আর গতি নেই। একটু চিন্তিত মনে দুজনে এগিয়ে চলে।

আলোটা জ্বালাতেই সত্যবন্ধু বলে, ও নিয়ে ভেব না—কাল বোঝা যাবে।

হ্যাঁ তাই ঠিক।—তবু অহল্যার ভিতরটা খুটখুট করে।

এখন কি করতে চাও?

কাপড়-চোপড় বদলাব।

তারপর?

ঘুম।

একটু বসো।

সুমুখের জানালাটা খোলা। কিন্তু শিক পরান লোহার। তবু একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছে, যেখানে রয়েছে পূর্ণ চাঁদ। আজ ঝলসান রুটি-ময়, তবু যেন জাগাতে চাচ্ছে কি এক অব্যক্ত ক্ষুধা! দিন বুঝে আবার পূর্ণ রূপ নিয়ে এসেছে। দুজনাকেই বিবশ করে ফেলে।

কিছুক্ষণ বাদে—অহল্যা বলে, উঠি এখন। অনেক রাত হয়েছে। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

মিছে কথা। এমন রাত্রে কারুর ঘুম পায়না।

হ্যাঁ পেয়েছে। চোখ ভেঙে যাচ্ছে আমার। আজ নয়, আর একদিন।—অহল্যা তার লতান হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

তবু সত্যবন্ধু প্রশ্ন করে, সত্যি যাচ্ছ?

হুঁ।

তোমার দুঃখ করে না?

অহল্যা ভিজা গলায় দৃঢ়স্বরে জবাব দেয়, না।

চাঁদ পশ্চিম আকাশে কখন যেন ঢুলে পড়ে। পেটা ঘড়িতে প্রহরের শেষ ঘণ্টা নিঃশেষে বাজিয়ে যায়। একে একে তারাগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে দোয়েল শ্যামার শিসে। শুধু অস্ত যায় না ভোরের তারাটি! তাও এক সময় ডুবে যায় সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

বেলা বাজে সাতটা। তখনও ঘুম ভাঙে না সত্যবন্ধু এবং অহল্যার।

পুষ্পি পর্দা ঠেলে অহল্যাকে তোলে।—আর কত ঘুমাবে? একটি লোক তোমায় ডাকতে এসেছিল। রাগে কাই হয়ে ফিরে গেছে কাল তোমাকে না পেয়ে। ফের অ'জও এসেছিল—এখনো তুমি ঘুমে শুনে সেকি গড়গড়ানি! কত বললাম ডেকে দেই, সে শুনলে না—বললে আর আমি আসব না। এই পুঁটলিটা তাকে দিও।

পটল নয়। শিবুর কথাও আজ ভাবতে সাহস হয় না অহল্যার। তবু সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, লোকটি দেখতে কেমন?

বেশ শক্ত-পোক্ত—এই তোমার মত জোয়ান।

অহল্যা একটু বিরক্ত হয়ে উঠে বসে।—কেন তুমি আমায় ডেকে দিলে না? নাম জিজ্ঞাসা করেছ?

করিনি আবার? সে একদম বললে না। কেবল ফোঁস ফোঁস।

ভিতর থেকে সত্যবন্ধু বলে, হয়তো অনেক খুঁজেছে, তাই এ রাগ। দেখতে কেমন? রং, বয়েস?

বয়েস,—কি জানি বাপু বলতে পারব না। তবে রংটা কোকিলের মত। রাগটা পাড়াগেঁয়ে।

সত্যবন্ধু বলে, এখন যদি পার, তবে অনুমান করে নাও অহল্যা।

যে-ই আসুক, অহল্যার কল্পনার বাইরে। তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে। তখন আর ময়লা পুঁটলিটা সে না খুলে ঠেলে রাখে তক্তাপোশের নিচে।

পুষ্পি বলে, ওটা খুলবে না ?

পরে খুলব—বড্ড বেলা হয়ে গেছে। উনানে আঁচ দিতে হবে। চা জল খাবার তারপর রান্না-বান্না সে আমি ভাবতে পারছি নে।

সে হচ্ছে না। ওতে নিশ্চয় নলেনগুড়ের সন্দেশ আছে। এত যার রাগ সে নিশ্চয় মিষ্টি নিয়ে এসেছে।

সত্যবন্ধু মন্তব্য করে, নুনও তো হতে পারে!

কিছুতেই তা নয় সত্যদা। এত যার রাগ সে নিশ্চয় ভালোবাসে। যে ভালোবাসে সে কিছুতেই নুন নিয়ে আসতে পারে না। আপনি যা তা বললে বিশ্বাস করব কেন ? তুমি খোলো দেখি ওটা।

অহল্যা আবার পোঁটলাটার দিকে চেয়ে সংকোচে বলে, এখন মাপ কর ভাই। এখন পারব না ও-টা নিয়ে বসতে। এইটুকু তোমায় আশ্বাস দিতে পারি ওটায় আর যাই থাক নলেনগুড়ের সন্দেশ নেই।

তবু পুষ্পি ছাড়বে না। অহল্যাকে এসে বাঁচান ফুলদি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির দিকে চেয়ে মরে যায় অহল্যা। পরনে লাল পেড়ে তসর, গড়নে দীর্ঘ দীপ্ত চেহারা। অনেকদিন বাদে মুখোমুখি ফুলদির এ পূজারিনী মূর্তি দেখে সত্য-বন্ধুও যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। অহল্যার যা কিছু সাজ-সজ্জা এ বাড়ির পক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান, রূপ তো যেন সুপুষ্ট একটি গন্ধরাজের তোড়া—তবু মনে হয় সবই যেন বাসি, অশুচি। সে একখানা আসন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে সাহস পায় না।

তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি বসব না। শুধু একটা কথা বলতে এসেছি সত্য তোমার কাছে।

সত্যবন্ধু সশ্রদ্ধভাবে কাছে এসে দাঁড়ায়।

একথার সূত্রপাত আজ নয়, কিন্তু ইদানীং এ বাড়িতে একেবারে কাল-বোশেখীর ঝড়ের মত চলছে। আরো একটা ঘটনা ঘটেছে এই কিছু সময় আগে। মিঃ ডাস এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর চেহারা এবং ড্রেস দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়—যেন সদ্য বিলেত ঘুরে এসেছেন। তাঁর বুটটা থেকে টুপিটা পর্যন্ত জলজলে স্মার্টনেস্। বয়সের ইণ্ডিকেটারও যেন অনেকখানি ঘুরে গেছে।

ফুলদি এ ঘরের দিকেই রওনা দিয়েছিলেন। মিঃ দাস বাধা দিলেন, একটু দাঁড়ান কথা আছে।

ফুলদি একটু চটুল হাসি হেসে বলেন, আপনিই বরং একটু বসুন। যা বলবেন তা আমার জানা আছে।

আপনি অবাক করলেন ফুলদি। একদিন হয়ত মানুষ মেরে খুনের দায় জেলে যাবেন।

আপনিও কম অবাক করেননি। একটা সামান্য মেয়ে মানুষের অসতর্ক কথায় পৈত্রিক জায়গা-জমি খুইয়েছেন। টাকা নইলে কি এমন জেল্লা খোলে?

বলেন কি ফুলদি?

একটু বসুন আরো শুনবেন—সবে তো শুরু।

মিঃ ডাস হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফুলদি এসে ওঠেন সত্যবন্ধুর ঘরে। চটুল চোখে মুখে তাঁর বর্ষীয়সীর গাম্ভীর্য। তিনি অতি সহজে পালা-বদল করেন।

কথাটা আর কিছু নয়—এখন তো ভগবানের কৃপায় তুমি সুস্থ হয়েছ, এবার অহল্যাকে ছেড়ে বাড়ি শুদ্ধ আমাদের সুস্থ কর। ঘৃণায় লজ্জায় আর কান পাতা যায় না।

অহল্যা যে কি ভাবে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, তা আব বলা যায় না। দণ্ড পলগুলো তার চারদিকে যেন ঘুরতে থাকে।

সত্যবন্ধু এত সময় নিজেকে সামলে নিয়েছিল, বলে তা পারা যায় না পিসীমা। তাহলে ঈশ্বরের কাছে আমি ঠেকব। হয়ত ওকে আমার এ জীবনে ছাড়া সম্ভব হবে না।

গলার গমক কমিয়ে ফুলদি জিজ্ঞাসা করেন, একি সত্যি?

নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সত্য জবাব দেয়, হ্যাঁ পিসীমা।

একটু ভেবে চিন্তে জবাব দাও। আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি।

অনেক ভেবেছি পিসীমা। এই একটানা ছুটি নিয়ে আর কিছু করি। না পেতাম সে ভালো ছিল, এখন আর ওকে ছাড়ার প্রশ্ন ওঠে না। প্রয়োজনে ও এখন নখে মাংসে জড়িয়ে গেছে। এর বেশি আর কিছু বলা যায় না।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে এ বাড়িটা ছাড়ো।

ভেবেছিলাম ছাড়ব—এখন জেদে দাঁড়িয়েছে, অপমান মাথা পেতে নিতে পারব না। সত্যের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতেই হবে। নইলে যে আপনাদের দেওয়া নামটা আমার মূল্যহীন হয়ে যাবে।

এবারে ফুলদি বেশ একটু চিন্তা করেন। তাঁর মুখের ভাব বদলায়। তিনি ম্লান হেসে শ্লথকণ্ঠে বলেন, তবে আমিই যুদ্ধে হেরে গেলাম। কিন্তু যাওয়ার সময় একটা কথা বলে যাচ্ছি, শত্রুপক্ষের কথা বলে তোমরা কেউ হেলা করো না। কারণ ঠিক তো আমি তোমাদের শত্রু নই। জীবনে যা অভ্রান্ত বলে জেনেছ তা এমনি বলিষ্ঠ হাতে আঁকড়ে থাকবে। নইলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। অনেকের গেছে, তাই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

ফুলদি দ্রুত পদে মিঃ ডাসের কাছে এসে বলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নেবেন। নৈনিতাল নইলে মিসৌরী যাব হাওয়া বদলাতে।

সেখানে যে এখন দারুণ শীত পড়বে।

অনেক উত্তাপ সয়েছি। শীতই এখন আমার পক্ষে ভালো। শরীরটা ভিতরে ভিতরে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে নানা ঝঞ্ঝাটে। যা কিছু আর্জি তা পথে বসেই মঞ্জুর করে দেব। আজ তবে আসুন। এর মধ্যে আমি বুড়োর সব বন্দোবস্ত করে রাখছি। ওঁর তো অত শীত সহ্য হবে না।

মিঃ ডাস একটু ইতস্তত করে চলে যান। ফুলদি গিয়ে শয্যা গ্রহণ করেন। ভাবেন, এখনো চব্বিশ ঘণ্টার একটা শেষ নোটিশ রয়েছে। কিন্তু কেউ কি তার গুরুত্ব বুঝবে?

বাড়ির অনেকেই অনেক কিছু আশা করে উঠানে দাঁড়িয়েছিল ফুলদির এ ছন্দ পতনে তারা মর্মাহত হয়ে ঘরে ফেরে। এবং ঘরে ফিরে পুরুষদের টিটকারী শোনে।

উনত্রিশ

সময় মত চা জল খাবার তৈরী হয়ে যায়। সত্যবন্ধু মুখ ধুয়ে আসে। চায়ের কাপটা তুলতে গিয়ে দেখে যে তার হাতি কাঁপছে। এখনো তার উত্তেজনা কমেনি। অহল্যাও অনেক কাজ-কাম সেরেছে। কিন্তু তার মুখের রক্তাভা একেবারে মিলায়নি। তারা জয়ী পক্ষ। ফুলদিই সে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। তবু কেন জানি তারা তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা পাচ্ছে না। সত্যবন্ধু অনেক হাঁতড়ে দেখে তার মর্মে একটা ক্ষত হয়েছে। তেমনি হয়ত রক্ত ঝরছে অহল্যারও মনে। ফুলদির শেষের আঘাতটা বড়ই মর্মস্পর্শী। এ আঘাত শুধু তার এবং অহল্যার বিরুদ্ধে নয়—সমস্ত মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে। ফুলদিকে আজ আর সত্যবন্ধু পিসীমা বলে ভাবে না। ধরে একটি বঞ্চিতা বিক্ষুব্ধা নারীর প্রতিমূর্তি বলে। তাই রক্ত ঝরে ক্ষত মুখে। শত মুখে যেন প্রশ্ন আসে। সহস্র হৃদয়ের সত্যবন্ধু আজ যেন হাহাকার শুনতে পায়। জগতে ফুলদি শুধু একটি নয়।

আজ তেমন কোনো কাজ নেই বাইরে। তবু ব্যাংকে যাওয়ার অজুহাত করে জামা গায়ে দেয়। চুল আঁচড়ায় কোনো রকমে। একটু ঘুরে এলে হয়ত মনের এ ভার কাটবে।

অন্যদিন হলে হয়ত নিষেধ করতো অহল্যা। আজ কেবল বলে, একটু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আপনি এলে তবে খাওয়া-দাওয়া।

সত্যবন্ধু ট্রামে উঠে ভিড়ের মধ্যেও একটা সিট খালি পায়। তার পাশ দিয়েই উঠে যায় একটি তরুণী। সে জানালাটার পাশ ঘিঁসে বসে। বাইরে কত কি দেখার জিনিস। তা তার মস্তিষ্কে ফটো ফেলে না। চোখ দুটো

শুধু চশমার ভিতর দিয়ে মেলা থাকে। ভিতরে চলে তার ব্যবচ্ছেদ। ফুলদির জীবনের যতটুকু সে জানে শল্য চিকিৎসকের মত চিরে চিরে দেখে। জ্বলে জ্বলে কোমল প্রাণপদ্ম যেন ঝলসে গেছে। এ জ্বলুনির এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিশেধক নেই। মানুষের এটা আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু কবে, কত কালে? বিজ্ঞানে, না মননে? শক্তিতে, না বিকাশে? ত্যাগে, না ভোগে?

ভাবতে ভাবতে সত্যবন্ধু নির্দিষ্ট ষ্টপেজ ছাড়িয়ে আসে। যখন তার হুঁশ হয় তখন আবার তাকে ট্রাম ধরে ফিরতে হয় পিছন দিকে। এমনি ভুল তার পরশুও হয়েছিল। কিন্তু দুদিনের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা।

সে ব্যাংকে থেকে অকারণেই শ দুই টাকা তোলে। নগদ আর বেশি রইল না। এ চাকরি করে সে আর কত জমাতে পেরেছে! তবু আজ খেয়ালটাকে প্রশ্রয় দেয়? কাজ নেই, তাই অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু বাড়িয়ে নেয়।

এবার একটা হকার্স কর্ণারে ঢুকে এক ধার থেকে সব জিনিসের দর করতে থাকে। শাড়ি ব্লাউজ গামছা মাইপোষ পর্যন্ত। কারুর সঙ্গেই সে দর স্থির করে না। কোনো জিনিসই সে একান্ত করে দেখে না।

কে যেন বলে, ফালতু কাপ্তেন। শুধু সুড়সুড়ি দিতে এসেছে।

কথাটা সত্যবন্ধুর কানে যায়। কাজটা ভাল হচ্ছে না। এবার সে মন্তব্য-কারীর দোকানে ফিরে আসে এবং খান দুই শাড়ি কেনে। মানানসই দুটো ব্লাউজ।

পাশের দোকানীরা আঙুল কামড়ায়? একজনের দোকান থেকে তো আর খদ্দের ভাগিয়ে আনা যায় না। বেলা প্রায় বারটা। দু এক জনে দোকান পাট বন্ধের আয়োজন করে।

সত্যবন্ধু আবার একটা পাক দেয় কাঁচের চুড়ি, চুলের ফিতা, স্নো পাউডার আলতার শিশির ভিতর দিয়ে। এটা ও-টা সবটারই সে দর জিজ্ঞাসা করে। বেলা বারটা বেজে গেছে, তবু মনোহারী দোকান তিনটি উন্মুক্ত থাকে। সত্যবন্ধু হাসে। দোকানদার তিনটি নিরুপায় হয়ে দাঁত বার করে তাকে যেন সমর্থন করে।

সত্য বলে, এসব কি জিনিস, একেবারে ফাঁকি বাজি।

তা ঠিক স্যার—তাই দামও তেমনি। খদ্দেরও আসে তেমনি।

সত্যর গায়ে কথার হুল ফুটলেও সে অনেকগুলি মাল খরিদ করে। ক'টাকাই বা দাম! পুষ্পিকে জব্দ করার জন্য শেষ মুহূর্তে একটা বড় জল, পুতুল তুলে নেয় একটু বেশি দর দিয়ে।

বেলা এগারটা পর্যন্ত অহল্যার সময় কাটে কাজের চাপে। তারপর সে সমস্ত কিছু গুছিয়ে বসে থাকে—জল গামছা তেলের শিশি সোপকেশটি পর্যন্ত। এসে উঠলে আর মুহূর্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। এখন অহল্যা নাম জানে না, এমন একটি বস্তুও এ ঘরে নেই। মিট-সেফ, ফটোর এ্যালবাম্ ব্র্যাকেট এমনি নতুন জিনিস এসেছে কত! কিন্তু প্রথম দিনটি মাত্র বাক্সের কটাই ঘটিয়েছিল কি বিভ্রাট! চাকরি থাকে কি যায়! আজ আর সে সমস্যা নেই। তবু ফুলদির কথা ভুলতে পারেনি অহল্যা। তিনি যেন ওকে মায়ের মত ডানা দিয়ে আচ্ছন্ন করে বাঁচিয়ে ছিলেন সেদিন। কিন্তু মাঝখানে কি যেন হল তাঁর। যাক, ও কথা আর ভেবে লাভ নেই। এখন অহল্যার এখানের স্বত্ব কায়েমী। সে মিঃ ডাসের তোলা ফটো দুখানার দিকে সগৌরবে তাকায়। আবার প্রায় মুখোমুখি হয়ে রয়েছে অসাবধানতায়। সে একটু লজ্জা বোধ করে। এগিয়ে গিয়ে সরিয়ে রাখে। অপলক চোখে চেয়ে থাকে সত্যবন্ধুর দিকে। এমন করে সে আজ পর্যন্ত রক্ত মাংসের মানুষটির দিকে তাকায়নি। এর কি না সুন্দর! বিধাতা এত রূপও মানুষকে দেয়? একেবারে ভরে গেছে প্লাবনে।

পেটা ঘড়িতে বারটা বাজে।

এখনো আসেন না কেন?

এই সংযোগে পুঁটলিটা খুলে দেখলে হয়! কবার অহল্যার মনে হয়েছে কিন্তু কে কোথা দিয়ে এসে পড়ে, তাই সাহসে কুলায়নি। এখন দুপুরের মরসুম —বাড়ির বৌরা যে যার ছেলেপুলে নিয়ে নিজের ঘরে ব্যস্ত। অহল্যা দুয়ার ভেজায়। কতটুকুই বা সময় লাগবে।

কিছুই নেই পুঁটলিটার ভিতরে। কেবল একখানা কাঠের কাঁকই, ছোট্ট একখানা আয়না দু আনা দামের, আর একখানা মা-কালীর পট, কিছু নির্মাল্য। এদিয়ে কি কারুকে সনাক্ত করা অহল্যার পক্ষে সম্ভব?

কিন্তু তার মন কুলায় প্রত্যাশী বিহঙ্গিনীর মত ডানা মেলে। সে উড়ে চলে স্নো পাউডার ক্রীম এ্যালবামের দেশ ছেড়ে যেখানে ধুলোয় কাদায় মাটির স্নেহ সজলতায় প্রবীন প্রাচীন গাছ জন্মেছে, যে গাছকে আশ্রয় করে রয়েছে

বর্ধিষ্ণু লতা—ফুলে ফলে ফুলে সমৃদ্ধ। নদী রয়েছে প্রাণদা জল সম্পদে পূর্ণ। কোকিল বাবুই হরিয়াল অবিরাম গান গেয়ে চলে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া আসে, বুনো হাঁস ওড়ে শীতের আমেজে। পলকে যেন শত ক্রোশ উত্তরণ করে অহল্যা। ঝলকে মনে পড়ে নিজের বাড়িটি। সেই বাড়িতে এমনি একটি পট ছিল। কোন্ মেলা থেকে চার আনা দিয়ে যেন এনেছিল শিবু। কত কল্যাণ কামনা করে যে সিঁদুরের কৌটা দিয়ে ছিল অহল্যা! আজ সব অন্ধকারে। চিনতে কষ্ট হয়। এখানে অনেক আলতা শাড়ি স্নাগুলা রয়েছে, কিন্তু তার যেন সত্যিকারের কিছু নয়। সে পুঁটলিটা সযত্নে বেঁধে সরিয়ে রাখে দূরে। আশীর্বাদ ও নির্মাল্যর সঙ্গে সিঁদুব নেই। থাকলে সে হয়ত একটু সিঁথিতে দিত! আজ তার মনটা পোড়ে একটি বেগুন ফুলের জন্যও।

অহল্যা! অহল্যা! এগিয়ে এসো, ধরো।—সত্যবন্ধু একগাদা জিনিস পত্তর রিক্সা-থেকে টেনে এনে ধুপ-ধাপ করে বারান্দায় ফেলে দেয়।

এ সবগুলো আবার কেন এনেছেন? আপনার কি টাকায় গা কামড়ায়?

এত কষ্ট করে আনলাম, তুমি বকছ—বেশ! কিছু ধরার কি খোলায় দরকার নেই। বিকেলে না হয় ফিরিয়ে দিয়ে আসব কিছু গাঁট গচ্চা দিয়ে।

সে কথা বলছি নে। এখন অযথা এসব পয়সা নষ্ট! আমার তো কোনো জিনিসের অভাব নেই। শাড়ি ব্লাউজ স্নো আলতা কি না রয়েছে!

শুধু তোমার জন্যই আনিনি। পুষ্পির জন্যও এনেছি। কিছু আমার প্রয়োজনীয়ও আছে। অনেক পয়সা জীবন ভ'র কামাই করেছি, তা নষ্টও হয়ে গেছে। কিন্তু মনের মত কিছু করার অবকাশ পাইনি। আজ এসেছে। তুমি কি বাধা হতে চাও অহল্যা?

গভীর সহানুভূতিতে অহল্যা বলে, না। আপনার যা খুশি তা করুন, ওতেই আমি সুখী।

তাড়াতাড়ি স্নানাহারের পর্ব শেষ করে সত্যবন্ধু। অহল্যাও দেরি করে না। আজ সত্যবন্ধুই অগ্রণী হয়ে পুষ্প এবং তার মাকে ডেকে আনে। বসতে দেয় যত্ন করে।

মাসীমা পুষ্পর জন্মদিনে আমি কিছু দিতে পারিনি—অহল্যা টেকা দিয়েছে। আজ আমি ওর জন্য শাড়ি ব্লাউজ এনেছি। বলতে হবে কারটা ভালো? আর আপনাদের এখানে চায়ের নিমন্ত্রন।

আজ আবার এসব কেন? সেদিন যা দিয়েছে, তাই তো যথেষ্ট। অহল্যা

দেওয়াও যা, তুমি দেওয়াও তাই। ভাঁজ খুলে পর না পুষ্পি, তারপর পায়ের ধুলো নে তোর সত্যদার।—পুষ্পর মা গদগদ হয়ে অহল্যা ও সত্যবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলে, তোমরা দুটিতে শতায়ু হও। জানোই তো বাবা আমি এ বাড়ির কোনো কথা-কথিতে নেই।

পুষ্পি লজ্জায় একেবারে রাঙা হয়ে ওঠে।

তোমরা বসে কথাবার্তা বলো। শাড়ি পরলে পুষ্পই বলতে পারবে কোন্‌খানা বেশি ভালো। আমি ঘরে গিয়ে ঘুট-ঘাট করি। এ বেলা তো আবার পুষ্পও রইল না। চা হলে ডেকো।

পুষ্পি এবং তার ভাইকে নিয়ে মাত্র তো চারটি মানুষ। তার আবার এত কাজ কি মাসীমা?—সত্যবন্ধু অনুরোধ করে, বসুন চা খেয়ে যাবেন।

তুমি একা, তোমার পিছনে ধরতে গেলে সারাক্ষণ দুটি লোক লেগে আছে। সে হিসেবে আমাদের কটির দরকার? কিন্তু একটিও কি আছে? তা হলে আমায় বসতে বলো কোন্‌ হিসেবে?

পুষ্পর মা কথায় কাতর নন। নেহাৎ চক্ষের লজ্জায় আজ সামলে নেন জিভ। তিনি চলে গেলে সত্যবন্ধু বলে, কি গো রাজকন্যা শাড়িখানা পরো।

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে পুষ্পি জবাব দেয়, চা আসুক আগে।

হলফ করে বলছি তোমায় ফাঁকি দেওয়া হবে না। আগে শুনতে চাই কার শাড়িখানা ভালো।—সত্যবন্ধু অহল্যার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায়।

অহল্যা ভাবে, সে কি সত্যবন্ধুর প্রতিযোগিনী হওয়ার যোগ্য? সে মন্তব্য করে, আপনার পছন্দই সেরা।

পুষ্পি বলে, অহল্যাদি তুমি থামো। আজ আমার কথাই শেষ কথা। সত্যদা, জিতিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঘুষ লাগবে। সাড়ে ন' হাজার টাকা।

দেব। ও নিয়ে-দিয়ে আমাদের হাত পাকা।

দিন তবে?

সেজে-গুজে এসো। কিন্তু নগদ দিতে পারব না এখন। দেব জিনিস পত্রে।

আমার পেলেই হল।

একটু বাদেই পুষ্প শাড়ি ব্লাউজ পরে আসে। দিব্যি ফিটফাট স্মার্ট মেয়ে।

বসো।—সত্যবন্ধু একখানা ফর্সা তোয়ালের মোড়ক অহল্যাকে ইঙ্গিতে পুষ্পর হাতে তুলে দিতে বলে।

ঘুষটা পরম আগ্রহে পুষ্প গ্রহণ করে দুহাত পেতে। হঠাৎ একটা কান্নার সুরে বেজে ওঠে, যেন সদ্য একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

পুষ্পি বেগে ছুটে পালায়। অহল্যা হেসে ওঠে সবিস্ময়ে। সত্যবন্ধু একখানা বই মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বিকালবেলা পুষ্পিকে ডেকে চা খাওয়াতে সত্যবন্ধুকে অনেক মাসুল দিতে হয়। অনেক ঠাট্টা তামাসার ভিতর দিয়ে সময়ের চাকাটা কখন যেন গড়িয়ে সন্ধ্যা বেলায় পৌঁছায়। ছেলে মেয়েরা কল-কোলাহলে বাড়ির উঠানটা মাতিয়ে তোলে। কত রকম ইংরেজি বাঙলা খেলার নাম যে তাদের মুখে মুখে শোনা যায়! পাঁচিলের বাইরে ব্যাডমিণ্টনের মাঠটায় বড় বড় বাল্বগুলো জ্বলে ওঠে। এবার খেলা আরম্ভ হবে। বৈশাখী সঙ্ঘে এর মধ্যেই টেবিল টেনিস টুর্ণামেণ্ট শুরু হয়ে গেছে। সত্যবন্ধু ঘর ছেড়ে বাইরে এসে একটু পায়চারি করে। এই অবসরে অহল্যা সব গুছিয়ে নেবে। ঘরের ভিতর তো এতক্ষণ দক্ষ যজ্ঞ হয়েছে।

একটি বলিষ্ঠ গঠন যুবক সত্যবন্ধুর সুমুখে এসে দাঁড়ায়। মুখখানা তার রোদে পোড়া। হাত পা বেশ শক্ত। তেমন জামা কাপড়ের বালাই নেই। কাঁধের লাঠিতে একটা বোঁচকা—বোধহয় বিছানা। সে সসংকোচে জিজ্ঞাসা করে, বলতে পারেন বাবু এখানে কি অহল্যা বলে কেউ কাজ করে।

সত্যবন্ধুর মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

তোমার নাম?

শিবু সর্দার।

অহল্যা তোমার কি হয়?

তামাটে মুখখানায় একটা সলজ্জ জেল্লা খেলে যায়।—সে আমার···

এসো, এসো বাড়ির ভিতর।—সত্যবন্ধু আগে আগে চলে। রাস্তার সমস্ত ইলেকট্রিকের আলোগুলো তার মাথার ভিতর যেন ঘুরপাক খেতে থাকে। উঠানটাও যেন টলমল করে ওঠে।

সে কোনো প্রকারে ঘরে উঠে বলে, বেরিয়ে দেখ অহল্যা কে এসেছে! সকাল বেলা যে রাগ করে গিয়েছিল, বিকাল বেলা সে বুঝি আর থাকতে পারেনি—তোমার খোঁজে আবার এসেছে। এখন বুঝে-সুঝে আদর যত্ন কর।

অহল্যা বেরিয়ে এক চমকা আগন্তুককে দেখে। ঝটিতি ঘরে ঢোকে

আবার। গলার ও কানের অলংকার খুলে সত্যবন্ধুর হাতে দিয়ে সে ঘুরে আসে বারান্দায়। সে তার অজ্ঞাতে মাথার কাপড়টাও টেনে দেয় ভালো করে।

* * *

রাত্রে বারান্দায় কথা হয়। সত্যবন্ধু ঘরের ভিতর বসে সাগ্রহে শোনে। আলোটা কমান। বাড়িটা নীরব। ওপাশের পর্দাটা যথারীতি ঝুলান।

বৈদ্যনাথ কবরেজ চারটা লোক দিয়ে আমায় মড়ার মত বাঁশে ঝুলিয়ে নে গেল। বললে, তুই কাঁদিস নে, তোকে আমি ভালো করে দেব। একটা নপুংসক খাসি এনে তাকে গর্তে পুঁতে মেরে তেল জ্বাল দিলে—মহামাসতেল। তাই মালিস করে দিব্যি আরোগ্য।

অহল্যা কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকে।

মানত করেছিলাম। সুস্থ হয়েই বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। কবরেজ হেসে বললে, যাও। একদিনে দশ ক্রোশ এগুলাম। শিমুলদিঘীর মন্দির আর দুদিনের পথ। ভাবলাম এ ভাবে হাঁটলে কোন্ না দেড় দিনেই মেরে দেব। কিন্তু বাধা এলো। আর মানত রাখতে যাওয়া হলনি।

এবার অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, কি বাধা? মানত করে না যাওয়াটা কি ভালো হল?

শোন—বলছি। ভালোমন্দ বুঝিনে, কিন্তু একটা কাজ হল জব্বর। হাজার হাজার গাঁয়ের চাষী মজুর মেয়ে মর্দ এক কাঁট্টা হয়ে শ্রম দিচ্ছে—বিনি মজুরীতে বাঁধ বাঁধছে নিজেদের গাঁয়ের। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, এ সব কি? তারা জবাব দি'ল, বন্যা রোখার মন্তর? আমার গায় কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি হলফ করে বলতি পারি, তুই এক্কেবারে ভিরমি খেয়ে যেতিস, যদি দেখতিস এতগুলো মুনিষ্যির সেকি হট্টগোল আর ফুর্তি!

সত্যবন্ধু উগ্র কৌতুহলে যেন শ্বাস বন্ধ করে থাকে। অহল্যা প্রশ্ন করে, তারপর?

শিবের কথা ভুলে বাড়ি ফিরে এলাম। ভাবলাম মানুষই তো শিব। তারা বাঁচলেই তো বড় মানত ধম্ম। ছুটোছুটি করে ভাঙা-চোরা মন-মরা মানুষগুলোকে এক কাঁট্টা করলাম। বাঁধলাম পাঁচ কোশ ভেরী নদীর পাড় ধরে। হাজা মজা খালটাও কাটলাম সবাই মিলে। ও সেকি মেহনৎ!

শিবু একটু বিরাম দেয়। সত্যবন্ধু ভাবে, থামলে কেন?

এবার নাকি ফসলের আশা আছে প্রচুর। কিন্তু গোরু নেই। অন্তত একটা জোটালে, ওর মত যার আর একটা আছে, তার সঙ্গে ভাগে-যোগে চাষ করতে পারে কিছু ভুঁই।

অনেকক্ষণ কথা বন্ধ থাকে। অনেকটা রাত নিঃশব্দে কেটে যায়। সত্যবন্ধু ঘুমাতে পারে না।

অবশেষে অহল্যা জিজ্ঞাসা করে, এখানে এলে কি করে?

অনাথ দাসের পেট ধরে অনেক নাস্তানাবুদ হয়ে।

অহল্যা লজ্জা পায়।—তুমি এখন ঘুমাও। শরীরের ওপর অনেক চোট গেছে।— সে সবে গিয়ে প্রশস্ত জায়গা করে দেয়।

শিবুর যেন এ সব মনঃপূত হয় না। সে উসখুস করে। এদিকে সত্যবন্ধুর কানে একটি চুলের ঘষার শব্দও যেন কাঁসির শব্দর মত এসে প্রবেশ করছে।

তুই কি কিছু দিতে পারিস?

আমি। আমি কোথায় পাব টাকা?

বড় কুণ্ঠিত হয়ে শিবু জিজ্ঞাসা করে, এতদিন তবে কি করলি?

চুপ করে থাকে অহল্যা। এতদিন ধরে যা করেছে, তা তো সোনা গয়নায় আটকা। এবং তা রয়েছে অন্যের জিম্মায়। ভরসা দেওয়ার মতো তার কোনো সম্বলই নেই।

যদি কিছু হাতে থাকে, তবে তুইও চ্। মা লক্ষ্মী এবার মেহনতের ফসল দেবেনই। একটু এগিয়ে জুগিয়ে দিবি—তুইও চ্ বাড়ি। আমি নতুন ঘর বেঁধেছি।

এবার কি জবাব দেয় অহল্যা, সত্যবন্ধু আকুল হয়ে থাকে।

সবই তো বুঝলাম। কিন্তু নতুন চাকরি, গেলে কি এ দুয়ার আর খোলা থাকবে?

আর কোনো জবাব শোনা যায় না। অনুরোধ করতেও যেন সাহসে কুলায় না শিবুর।

সত্যবন্ধু বাতিটা নিবিয়ে শুয়ে পড়ে।

সকাল বেলা সে-ই ওঠে আগে। অহল্যাকে ডেকে বলে, জোগাড় কর, তৈরী হয়ে নাও—বাড়ি যাবে অহল্যা।

সেকি, আপনার চলবে কি করে?

একটু ম্লান হাসি হাসে সত্যবন্ধু—তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। এদিকে এসো। তোমার স্বামীকেও ডাকো।

অহল্যা এবং শিবু দুজনেই সত্যবন্ধুর সুমুখে এসে দাঁড়ায়।

এই তোমার পরিবারের গয়না। এ তার মেহনতেরই দাম। আর এই হচ্ছে বাকি মাইনে, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল।—সত্যবন্ধু হার ও কানের টব এবং দশখানা করকরে নোট অহল্যার হাতে দেয়।—দেশে পৌঁছে চিঠি পত্তর দিও।

আবার আমি আসব—আপনি ভাববেন না।

আমি আশীর্বাদ করি তার যেন কখনো দরকার হয় না।

অহল্যা বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে।

সত্যবন্ধু হো হো করে হেসে ওঠে।

বাড়িময় সংবাদটা তখনই ছড়িয়ে যায়। সমস্ত আলাপ আলোচনা সন্দেহের মূলে পড়ে কুড়াল। বাড়িশুদ্ধ লোক ভেঙে আসে সত্যবন্ধুর ঘরের দিকে।

পুষ্পি এসে একেবারে গলা জড়িয়ে ধরে। সত্যি তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ নাকি অহল্যাদি ?

অহল্যা কোনো জবাব দিতে পারে না। বার বার তার নাক মুখ লাল হয়ে ওঠে।

পুষ্পি বলে, কত ঝগড়া তর্ক দোষ ত্রুটি করেছি, কিছু মনে রেখো না ভাই।

এ দৃশ্য নারীপুরুষ সকলেরই বুকে বাজে। আজ এক রকম দৈনন্দিন রান্না বাড়ার কাজ বন্ধ হয়ে যায় ব্যাবাক বাড়ির।

এমন সময় মিঃ ডাসও এসে উপস্থিত হন। তাঁর মনে জটিল সমস্যা। নৈনিতাল চলে গেলে তাঁর হৈ হৈ ছন্দের পরিণাম কি হবে ? তিনি এবং ফুলদি সেখানে, সত্যবন্ধু এবং অহল্যা এখানে ! ভদ্রাসন চলে গেছে পরের হাতে।

তিনি এসে দেখেন, অহল্যার যে সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না এতদিন, সেই সিঁথিতে সিঁদুর পরাচ্ছে সবাই মিলে। গয়না গাঁটি দিয়ে ফুলদি সাজাচ্ছেন অপরূপ করে। হাতের অলংকার নেই, তিনি নিজের দুগাছা খুলে দিলেন। এ যেন দেবী বিসর্জন।

মিঃ ডাস সব ভুলে অভিভূত হয়ে বলেন, আই উইস্ ইউ গুড লাক্ !

ঘণ্টাখানেক বাদে সত্যবন্ধুকে হেড অফিসে দেখা যায়।

আমি জয়েন করব।

এখন তো ভালো জায়গা খালি নেই। এতদিন কি করলেন?

চরম খারাপেও আমার আর আপত্তি নেই।

সত্য বলছেন?

হ্যাঁ—সত্যি?

রাত্রে সত্যবন্ধুকে সিগসিমের ট্রেনে দেখা যায়। বাইরের দিকে সে মুখ ঘুরিয়ে বসে। চোখ বুজে আসলে সে অরুন্ধতীর সঙ্গে সঙ্গে অহল্যাকে দেখে—চোখ মেললে বিশ্বব্যাপ্ত অন্ধকার।